তফসীরে নূরুল কোরআন

উনবিংশ পারা

১৯

মওলানা মোঃ আমিনুল ইসলাম (র.)

উনবিংশ খন্ড

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

তফসীরে নূরুল কোরআন

উনিশতম খন্ড

১৯

উনিশ পারা

প্রখ্যাত ইসলামী চিন্তাবিদ, প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, মাসিক আল-বালাগ, তফসীরকার রেডিও বাংলাদেশ, প্রাক্তন সদস্য ইসলামিক ফাউন্ডেশন বোর্ড অফ গভর্ণরস, সদস্য বাংলাদেশ মাদ্রাসা বোর্ড, মরহুম ইমাম ও খতীব, লালবাগ শাহী মসজিদ এবং বহু দ্বীনি গ্রন্থ প্রণেতা

হযরত মওলানা মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম (রহ.)

আল-বালাগ পাবলিকেশন্স

ঢাকা

চতুর্থ প্রকাশ	ঃ	জমাদিউল আউয়াল-১৪৩৯ জানুয়ারি-২০১৮ চৈত্র-১৪২৩
প্রকাশক	ঃ	মোহাম্মদ মঈনুল ইসলাম
সর্বস্বত্ব	ঃ	প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
মুদ্রণে	ঃ	নিউ এস. আর. প্রিন্টিং প্রেস ফরাশগঞ্জ, ঢাকা-১১০০
হাদিয়া	ঃ	৩০০.০০

প্রাপ্তিস্থান

আল-বালাগ কার্যালয়
১২/১৭, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড,
মোহাম্মদপুর, ব্লক-এ, ঢাকা-১২০৭

আন-নূর পাবলিকেশন্স
৫২, বাংলাবাজার, ঢাকা
মোবাইল ঃ ০১৭১৩০১৪৮৮৯

গাউসিয়া পাবলিকেশন্স
১১, ইসলামী টাওয়ার, বাংলাবাজার, ঢাকা

এমদাদিয়া লাইব্রেরী
চকবাজার, ঢাকা

Tafseer-e Nurul Quran (19): By Hazrat Moulana Mohammed Aminul Islam (R). Published by Al-Balag Publications. 12/17, Sir Sayed Ahmed Road. Mohammedpur, Block-A, Dhaka-1207, Mobile : 01713014889
Price : 300.00

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

ভূমিকা

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে অগণিত শোকর, যে তিনি দয়া করে তফসীরে নূরুল কোরআনের উনবিংশ খন্ড প্রকাশ করার তৌফিক দান করেছেন। আলহামদুলিল্লাহ্! সুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্! যদি সারা জীবন সর্বক্ষণ এ নেয়ামতের শোকর আদায় করতে থাকি তবুও শোকর গোজারীর হক্ব আদায় হবেনা; বরং শোকর গোজারীর অক্ষমতার বেদনাই অনুভূত হতে থাকবে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের শক্তি-সামর্থ্য সীমিত, আর করুণাময়ের অনন্ত অসীম করুণা-ধারা সর্বক্ষণ হয় প্রবাহিত, তাই আমাদের অক্ষমতা প্রমাণিত এবং চির সত্য। তাই শোকর গোজারীর অক্ষমতার জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আমরা ক্ষমা প্রার্থী।

অগণিত দরূদ ও সালাম প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, যাঁর শুভ-দৃষ্টির বরকতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন তফসীরে নূরুল কোরআনের রচনা ও প্রকাশনার তৌফিক দান করেছেন, যিনি আল্লাহ পাকের সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, যাঁর প্রতি পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে, যিনি রহমতুল্লিল আলামীন, যাঁর সৌজন্যে সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি অস্তিত্ব লাভ করেছে, যিনি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব। হে আল্লাহ! দরূদ পেশ কর প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে কেয়ামত পর্যন্ত সারা পৃথিবীতে ছোট বড় যত প্রাণী তুমি সৃষ্টি করেছ এবং সৃষ্টি করবে সবগুলোর সংখ্যা অনুসারে।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ, যা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতি নাযিল হয়েছে। পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা এবং চিরস্থায়ী মোজেযা। সকল নবী রসূলগণকে কিছু কিছু মোজেযা প্রদান করা হয়েছে যা তাঁদের জীবনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে বিদায় নিয়েছে, কিন্তু যেভাবে কেয়ামত পর্যন্ত হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত অব্যাহত থাকবে, আর কোন নবী আসার কোন সম্ভাবনা নেই এবং প্রয়োজনও নেই, কেননা তাঁর নবুওয়্যতই চিরস্থায়ী, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআন তাঁর চিরস্থায়ী মোজেযা, বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে পবিত্র কোরআন তার মোকাবেলা করার জন্যে সমগ্র মানব জাতির সম্মুখে চ্যালেঞ্জ দিয়ে রেখেছে, কিন্তু এ চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব হয়নি, আর কখনো সম্ভবও হবেনা।

আল্লামা জালালুদ্দিন সয়ুতী (র.) তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'খাসায়েসুল কোবরায়' প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দু'টি এমন মোজেযার কথা লিখেছেন যা কেয়ামত পর্যন্ত স্থায়ী থাকবে। একটি হল পবিত্র কোরআন যা সারা পৃথিবীতে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ, এ পর্যন্ত পৃথিবীর চারশত ভাষায় যার অনুবাদ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠায় যার তফসীর লিপিবদ্ধ হয়েছে, লক্ষ লক্ষ হাফেজে কোরআন যা কণ্ঠস্ত করে রেখেছেন, লক্ষ লক্ষ কারী

সাহেবান যার তেলাওয়াত করছেন, লক্ষ বার যা পাঠ করলেও পুরাতন মনে হয়না, যার তত্ত্ব ও তথ্য কখনও শেষ হবার নয়; বরং যুগে যুগে বিভিন্ন পরিবেশে সৃষ্ট জটিল ও কঠিন সমস্যার সমাধান দিতে থাকবে পবিত্র কোরআন।

আর দ্বিতীয় মোজেযাটি হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.)-এর বর্ণনায় স্থান পেয়েছে, তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করেছিলেন, ইয়া রসূলল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! হজ্জের সময়ে হাজীগণ মীনায় অবস্থিত জমরায় তিনদিন পর্যন্ত ছোট পাথর নিক্ষেপ করতে থাকে, লক্ষ লক্ষ মানুষ এ কর্তব্য পালন করে, ঐ পাথর কেউ ওঠায় না, ঐ পাথর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করাও নিষিদ্ধ, প্রত্যেক হাজীকে মোজদালেফা থেকে তিনটি জমরার হিসেবে পাথর নিয়ে আসতে হয়, এ পাথরগুলো নিক্ষিপ্ত হবার পর পাথরের পাহাড়ে পরিণত হওয়াই স্বাভাবিক, কিন্তু তা হয় না কেন? প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ প্রশ্নের জবাবে এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে নিযুক্ত করে রেখেছেন এ দায়িত্ব দিয়ে যে, যার হজ্জ কবুল হয় তার নিক্ষিপ্ত পাথর গুলোকে উঠিয়ে নেয়া হয়, পক্ষান্তরে যার হজ্জ কবুল হয়না তার নিক্ষিপ্ত পাথরগুলো সেখানেই পড়ে থাকে। এজন্যে এখানে সামান্য সংখ্যক পাথর পড়ে থাকতে দেখা যায়, যদি এমন ব্যবস্থা না হতো তবে জমরার নিকট পাথরের পাহাড় দাঁড়িয়ে যেত। (সুনানে বায়হাক্বী)

এই হাদীসের আলোকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথার সত্যতা প্রত্যেক বছর এবং প্রত্যেক যুগে প্রমাণিত হচ্ছে। কেননা, প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ লোক হজ্জ করার উদ্দেশ্যে সেখানে একত্রিত হয়, আর প্রত্যেক জমরায় তিনদিন যাবত সাতটি করে কংকর নিক্ষেপ করে। কিন্তু সেখানে সামান্য সংখ্যক কংকরই পড়ে থাকতে দেখা যায়। যেভাবে এটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একটি মোজেযা ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনও একটি মোজেযা, আর তা কেয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে থাকবে। কোরআনে করীমে কোন কোন ক্ষেত্রে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে সে ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য প্রমাণিত হয়েছে। এটিও পবিত্র কোরআনেরই একটি বৈশিষ্ট্য।

এতদ্ব্যতীত, পবিত্র কোরআনে অতীতের বহু ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, যার পরে হাজার হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে, যেমন বর্তমান পারায়ও হযরত মূসা (আ.), হযরত সালেহ (আ.), হযরত সোলায়মান (আ.) এবং হযরত লুত (আ.) সহ আরও কয়েকজন নবীর ঘটনাবলী বর্ণিত হয়েছে। যাঁরা নিজেদেরকে আহলে কিতাব মনে করে, যাদের নিকট তৌরাত ইঞ্জিল রয়েছে, আর সেই আসমানী গ্রন্থ সমূহে এসব ঘটনার বিবরণও রয়েছে কিন্তু তারা কখনও পবিত্র কোরআনের বিবরণের উপর কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেনি। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, পবিত্র কোরআন মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ লাভের পথ-নির্দেশ করে। মানব জাতির অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে কথা বলে। এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের উন্নয়নের পাশাপাশি পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর চির কল্যাণ লাভের দিক-নির্দেশনাও রয়েছে পবিত্র কোরআনে। এমনি অবস্থায় বিশ্ব মানবের সামগ্রিক কল্যাণ লাভের জন্যে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা গ্রহণ ব্যতীত গত্যন্তর নেই। আর এ প্রয়োজনের তাগিদেই যুগে যুগে বহু মনীষী পবিত্র কোরআনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে আত্ম নিয়োগ করেছেন এবং এ পর্যায়ে মূল্যবান অবদান

রেখে গেছেন, কিন্তু একথা অপ্রিয় হলেও সত্য যে, বাংলা ভাষায় এ সাধনার অভাব পরিলক্ষিত হয় অত্যন্ত বেশী। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সম্মুখে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা প্রচারের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করার অপেক্ষা রাখেনা। মূলতঃ এজন্যেই তফসীরে নূরুল কোরআনের সাধনা শুরু হয় আজ থেকে চৌদ্দ বছর পূর্বে। আলহামদুলিল্লাহ! আল্লাহ পাক আজ এ মহান গ্রন্থের উনবিংশ খণ্ড (উনিশ পারা) পেশ করার তৌফিক দিয়েছেন। এজন্যে তাঁর মহান দরবারে সেজদায়ে শোকরানা আদায় করি, এটি তাঁর একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

হে আল্লাহ! দয়া করে কবুল কর এ সাধনাকে, আর তফসীরে নূরুল কোরআনকে সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। মুসলিম জাহানের নিকট এ মহান গ্রন্থ পৌঁছাবার তৌফিক দান কর, এর বরকতে আমাদেরকে তোমার রহমত ও মাগফেরাত দান কর। যারা আমার সঙ্গে এ সাধনায় রত রয়েছে বা কোন প্রকার সহযোগিতা করেছে বা করবে, তাদের সকলের প্রতি হে আল্লাহ! তুমি বিশেষ রহমত নাযিল কর।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উসিলায় অধমের এ দোয়া এবং এ প্রচেষ্টা কবুল কর, আমীন।

বিনীত–
মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম
২-৫-৯৪ ইং

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক
https://t.me/islaMic_fdf

সূচিপত্র

বিষয় :	পৃষ্ঠা
তফসীরে নূরুল কোরআন	৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	১০
কাফেররা যখন ফেরেশতাদেরকে দেখবে	১১
কাফেরদের জন্যে কঠিন দিন	১৬
ইমাম রাজী (রঃ)-এর বক্তব্য	১৬
শানে নুযুল	১৯
কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ	২১
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা	২৩
শানে নুযুল	২৪
পবিত্র কোরআন অল্প অল্প করে নাযিল করার কারণ	২৫
তফসীরুল কোরআন	২৮
কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি	২৯
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩০
তফসীরুল কোরআন	৩৫
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৩৭
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা	৩৮
কাফেররা চতুঃস্পদ জন্তুর চেয়েও অধম	৪০
পূর্ববর্তী আয়াতের সাতে সম্পর্ক	৪২
তৌহিদের প্রমাণ	৪৩
আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পন্থা	৪৫
মরণ-নিদ্রার পর হবে কেয়ামতের দিনের ভোর	৪৬
তফসীরুল কোরআন	৫০
সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী	৫০
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা	৫৩
তফসীরুল কোরআন	৫৫
ভরসা শুধু এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি	৫৫
আল্লাহ্-প্রেমিকদের নিদর্শন	৫৭
তফসীরুল কোরআন	৬১
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক	৬১
প্রকৃত বন্দার পরিচয়	৬২
আয়াতের মর্মকথা	৬৩
দোযখের কিছু বিবরণ	৬৬
অর্থনীতির দিক-নির্দেশনা	৬৭
শানে নুযুল	৬৮
যারা তওবা করে	৭২
তওবার তাৎপর্য	৭৩
একটি প্রশ্ন	৭৮

জবাব ৭৮
আ'মালুল কোরআন ৮৭
সূরা শুআরা প্রসঙ্গে ৮৮
নামকরণ ৮৮
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ৮৮
এ সূরার ফজিলত ৮৯
স্বপ্নের তা'বীর ৮৯
শানে নুযুল ৯০
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ৯১
কাফেরদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী ৯৪
প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা ৯৬
হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা ৯৭
তফসীরুল কোরআন ১০০
তফসীরুল কোরআন ১০৭
হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযার তাৎপর্য ১১০
তফসীরুল কোরআন ১১২
যাদুকরদের সংখ্যা ১১৪
তফসীরুল কোরআন ১১৫
ঈমানের দৃঢ়তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত ১১৭
যাদুকরদের পরিণতি ১১৮
যাদুকরদের এখলাস ১১৮
তফসীরুল কোরআন ১২০
ফেরাউনের ধ্বংস ১২১
তফসীরুল কোরআন ১২৫
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সর্তকবাণী ১২৫
ফেরাউন যে বিষয়ে গৌরব করতো ১২৬
পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক ১২৬
তফসীরুল কোরআন ১২৯
হেদায়েত আল্লাহ পাকের দান ১৩০
আয়াতের মর্মকথা ১৩৫
তফসীরুল কোরআন ১৩৭
বিশেষ নিদর্শন ১৪০
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ১৪১
তফসীরুল কোরআন ১৪৩
তফসীরুল কোরআন ১৪৮
তফসীরুল কোরআন ১৫২
তফসীরুল কোরআন ১৫৯
সামুদ জাতির আবাস ১৬০
আইকাবাসী ধ্বংস হলো ১৭১
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ১৭৩
সতর্কবাণী ১৭৪

পবিত্র কোরআনের মহিমা ১৭৪
আয়াতের মর্মকথা ১৮১
আল্লাহ পাকের ন্যায় বিচার ১৮১
শানে নুযুল ১৮২
পবিত্র কোরআনের শিক্ষা ১৮৩
আল্লাহর রহমত লাভের পূর্বশর্ত ১৮৭
ভরসা শুধু এক আল্লাহ পাকের প্রতি ১৮৯
পবিত্র কোরআন কাব্য নয়, আল্লাহ পাকের মহান বাণী ১৯৩
একটি ঘটনা ১৯৪
শানে নুযুল ১৯৫
প্রণিধানযোগ্য ১৯৮
কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী ১৯৮
হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ওসিয়ত ১৯৯
সূরা নাম্‌ল ২০০
সূরা নাম্‌ল প্রসঙ্গে ২০০
এই সূরার আমল ২০১
স্বপ্নের তা'বীর ২০১
পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক ২০১
পবিত্র কোরআন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট ২০২
প্রকৃত মোমেনের পরিচয় ২০৩
পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ঘোষণা ২০৬
আয়াতের মর্মকথা ২১৪
আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ২১৫
শোকর গুজারীর মাহাত্ম ২১৬
এলমের ফজিলত ২১৭
পাখীদের ভাষা ২১৯
হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যু ২২১
হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যবাহিনী ২২৩
পিপীলিকার জীবন ধারা ২৫৫
সাবা ২৩৪
রাণী বিলকিসের উপঢৌকন ২৪৪
হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকিসের দূত ২৪৬
এলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম ২৫১
কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব ২৫২
বিলকিস মুসলমান হলো ২৫৬
ইসলাম গ্রহণের পর বিলকিসের অবস্থা ২৫৭
হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঘটনা ২৬০
সামুদ জাতি ধ্বংস হলো ২৬১
প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা ২৬৫
তৌহিদের বাণী ২৬৬

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلى على رسوله الكريم.

তফসীরে নূরুল কোরআন

উনবিংশ খন্ড উনবিংশ পারা

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا
الْمَلَائِكَةُ أَوْ نَرَىٰ رَبَّنَا ۗ لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا
كَبِيرًا ﴿٢١﴾ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ
وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَحْجُورًا ﴿٢٢﴾ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ
فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ﴿٢٣﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا
وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ﴿٢٤﴾ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ
تَنْزِيلًا ﴿٢٥﴾ الْمُلْكُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَٰنِ ۚ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى
الْكَافِرِينَ عَسِيرًا ﴿٢٦﴾

তরজমা

(২১) এবং যারা আমার সাক্ষাতের আশা করেনা তারাই বলে, আমাদের উপর ফেরেশতা অবতীর্ণ করা হয় না কেন? অথবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতে পেতাম। তারা তাদের অন্তরে অহংকার পোষণ করে, আর তারা গুরুতর রূপে সীমালঙ্ঘন করেছে।

(২২) যেদিন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখতে পাবে সেদিন অপরাধীদের জন্যে কোন সুসংবাদ থাকবে না এবং তারা বলবে রক্ষা কর, রক্ষা কর।

(২৩) আমি তাদের কৃত কাজগুলো বিবেচনা করবো। এরপর সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত ধূলি কণায় পরিণত করবো।

(২৪) সেদিন হবে জান্নাতবাসীদের বাসস্থান উৎকৃষ্ট এবং তাদের বিশ্রামস্থল অত্যন্ত মনোরম।

(২৫) যেদিন আকাশ মেঘমালা নিয়ে বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাদেরকে অবতরণ করানো হবে।

(২৬) সেদিন প্রকৃত কর্তৃত্ব হবে দয়াময় আল্লাহ পাকের, আর কাফেরদের জন্যে সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী কয়েকখানি আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালত সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে যে সব প্রশ্ন করা হতো, তার জবাব দেয়া হয়েছে এবং কাফেররা মুসলমানদের উপর যে অকথ্য নির্যাতন করতো, তার উপর সবর অবলম্বনের তাগিদ করা হয়েছে। আর এ আয়াতে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত আরো প্রশ্নের উল্লেখ করা হয়েছে।

যারা আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করেনা এবং আল্লাহ পাকের মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করে না, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং জীবনের যাবতীয় কার্যকলাপের হিসেব দিতে হবে– এ কথাও মানে না, তারাই নিজেদের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হয়ে রয়েছে। তাদের দৌরাত্ম এবং ধৃষ্টতার কোন সীমা নেই, তাই তারা বলে, যদি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহর সত্য নবী হন, তবে আমাদের নিকট আল্লাহর ফেরেশতাগণ এসে তাঁর সত্যতার সাক্ষ্য কেন প্রদান করে না? অথবা স্বয়ং আল্লাহ পাক আমাদেরকে দেখা দিয়ে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার কথা যদি ঘোষণা করতেন, তবে আমরা তাঁর প্রতি বিশ্বাস করতাম। যেহেতু আমাদের নিকট ফেরেশতা আসে না এবং আল্লাহ পাকের দিদারও হয় না তাই তাঁকে আমরা বিশ্বাস করতে পারি না। মূলতঃ তারা নিজেকে অনেক বড় মনে করে, তাই তারা এসব অবাস্তব, অযৌক্তিক অসুন্দর কথা বলেছে এবং নিজেদেরকে পাপাচারে লিপ্ত রেখেছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَآءَنَا

"আর যারা আমার সাথে মোলাকাতের আকাঙ্ক্ষা করেনা"-কেননা, এ জীবনের পর প্রতিটি মানুষকে পুনর্জীবন দান করা হবে একথায় তারা বিশ্বাসই করেনা আর এজন্যে তারা পরকালীন জিন্দেগীর সুখের আশা করেনা এবং শাস্তিরও ভয় করেনা, যাদের এ অবস্থা তারা বলে,

لَوْلَآ اُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلٰٓئِكَةُ

"আমাদের উপর ফেরেশতা কেন অবতরণ করা হয়না"? যে আমাদেরকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে অবহিত করবে, অথবা আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঐ ফেরেশতা আমাদের নিকট বাণী বাহক হিসেবে আসবে।

اَوْ نَرٰى رَبَّنَا

অথবা যদি আমরা আমাদের প্রতিপালককে দেখতাম এবং তিনি আমাদেরকে (হযরত) মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের আদেশ প্রদান করতেন।

لَقَدِ اسْتَكْبَرُوْا فِيْٓ اَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا

"তারা আপন মনে নিজেদেরকে অত্যন্ত বড় ভেবেছে এবং মানবতার সীমালঙ্ঘন করে অনেক দূরে সরে গেছে"।

অর্থাৎ তারা নিজেদেরকে অনেক বড় মনে করেছে এবং এমন কিছু চেয়েছে, যা নবী রসূলগণ বিশেষ অবস্থায় চেয়ে থাকেন। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ

وَعَتَوْ عُتُوًّا كَبِيْرًا

তারা কুফর ও নাফরমানীতে সীমালঙ্ঘন করেছে। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ তারা অত্যন্ত বেশী বিদ্রোহী হয়েছে। মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হলো তারা অহংকারী হয়েছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ عَتَوْ শব্দটির অর্থ হলো জঘন্যতম কুফরী ও নাফরমানী, অত্যন্ত বড় জুলুম, অর্থাৎ তারা অহংকারের চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, এমনকি তারা আল্লাহ পাককে দেখতে চাওয়ার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো, তারা আল্লাহ পাকের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল ও বিস্ময়কর মোজেযা সমূহ স্বচক্ষে দেখার পরও এমন বিষয়ের অন্বেষণ করেছে, যা নবী রসূলগণকে পর্যন্ত প্রদান করা হয়নি।

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلٰٓئِكَةَ لَا بُشْرٰى يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِيْنَ

কাফেররা যখন ফেরেশতাদেরকে দেখবে

যেদিন এ কাফেররা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, সেদিন তাদের খুশীর কোন বিষয় থাকবেনা, অর্থাৎ মৃত্যু মুহূর্তে অথবা কেয়ামতের দিন যখন কাফেররা ফেরেশতাদেরকে দেখবে, তখন তাদের জন্যে খুশীর কোন খবর থাকবেনা। আতিয়্যা (রঃ) বলেছেনঃ সেদিন অতি খুশীর সুসংবাদ প্রদান করা হবে মোমেনদেরকে, আর কাফেরদেরকে বলা হবে আজ তোমাদের জন্যে কোন খুশীর খবর নেই; বরং তোমাদের জন্যে রয়েছে অত্যন্ত কঠিন বিপদের সংবাদ।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো এ কাফেররা যখন ফেরেশতাদেরকে দেখবে, অর্থাৎ মৃত্যুর মুহূর্তে বা কেয়ামতের দিন, সেদিন ফেরেশতাগণ তাদেরকে কোন সুসংবাদ দেবেনা, তারা মোমেনদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেবে।

وَيَقُوْلُوْنَ حِجْرًا مَّحْجُوْرًا

আল্লামা বগভী (রঃ) তফসীরকার আতা (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো হারাম, হারাম করা হয়েছে অর্থাৎ যারা কলেমায়ে তাইয়্যেবা "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ" মেনেছে, তাদের ব্যতীত অন্যদের বেহেশতে প্রবেশ হারাম করা হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ কাফেরদেরকে যখন কবর থেকে বের করা হবে তখন ফেরেশতাগণ তাদেরকে বলবেঃ "তোমাদের জন্যে জান্নাত হারাম করে দেয়া হয়েছে"।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেনঃ পাপীষ্ঠ লোকদের পুনরুত্থানের পর যখন তারা ফেরেশতাদেরকে দেখবে তখন তারা নিজেরাই আলোচ্য শব্দগুলো উচ্চারণ করবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) এবনে জোরায়েযের সূত্রে লিখেছেন, আরবরা যখন বিপদগ্রস্ত হতো তখন حِجْرًا مَّحْجُوْرًا বলতো, তাই পাপীষ্ঠরা ফেরেশতাদেরকে দেখা মাত্র একথা বলবে। আর কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেনঃ এর অর্থ হলো পানাহ। আল্লাহর পানাহ। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেনঃ কাফেররা যখন ফেরেশতাদেরকে দেখবে, তখন তারা ফেরেশতাদের থেকে আল্লাহ পাকের আশ্রয় প্রার্থনা করবে।

حِجْرًا مَّحْجُوْرًا

বলবে অর্থাৎ তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে আরজী পেশ করবে যেন তিনি তাদেরকে ফেরেশতাদের থেকে রক্ষা করেন।[১]

وَقَدِمْنَآ اِلٰى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

আর তারা (কাফেররা দুনিয়াতে) যে সব ভাল কাজ করেছে সেদিকে লক্ষ্য করব, সেগুলোকে বিক্ষিপ্ত বালুর ন্যায় করে দেব তথা বেকার এবং ব্যর্থ করে দেব। কাফেররা কখনও ভাল কাজও করে যেমন, আত্মীয়-স্বজনের সাহায্য, মেহমানদারী, দুঃখী মানুষের দুঃখ নিবারণ প্রভৃতি। কিন্তু আখেরাতে তারা এর কোন সুফল তথা সওয়াব পাবেনা কেননা, আখেরাতে নেক আমলের শুভ পরিণতি লাভের জন্যে ঈমান পূর্বশর্ত। এরপর আরও একটি শর্ত হলো এখলাস অর্থাৎ শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সৎ কাজ করতে হবে। কাফেরদের সৎ কাজে উভয় শর্তই অনুপস্থিত থাকে।

هَبَآءً مَّنْثُوْرًا

হযরত আলী (রা.) বলেছেনঃ هَبَآءً সেই বালু কণাগুলোকে বলা হয় যা গৃহের জানালার ছিদ্র দিয়ে আগত সূর্যের আলোতে বালুর মত মনে হয়, কিন্তু হাত দ্বারা তা স্পর্শ করা যায় না, আর ছায়াতে তা দেখাও যায় না। হাসান বসরী (রঃ) মুজাহেদ (রঃ), একরামা (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), আলোচ্য শব্দটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আর مَنْثُوْرًا শব্দটির অর্থ বিক্ষিপ্ত। হযরত

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪০-৪১

আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেনঃ هَبَآءً সেই বালুকে বলা হয় যা বাতাসের কারণে উড়ে থাকে। মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ هَبَآءً বলা হয় সেই বালু কণাকে যা অশ্বের দৌড়ের সময় উড়ে থাকে।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক কাফেরদের সৎ কাজের একটি বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেভাবে উড়ন্ত বালু কণার কোন গুরুত্ব থাকেনা, ঠিক তেমনি আখেরাতে কাফেরদের সৎ কাজেরও কোন গুরুত্ব থাকবেনা। কেননা, সৎ কাজ মাত্রেরই আল্লাহ্ পাকের দরবারে গ্রহণযোগ্য হবার জন্যে ঈমান পূর্বশত, আর ঈমান না থাকার কারণে তাদের কোন সৎ কাজই আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবুল হয় না, তাই উড়ন্ত বালুর ন্যায় তাদের সৎ কাজ গুলো বেকার এবং নিরর্থক প্রমাণিত হবে।

أَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَّ أَحْسَنُ مَقِيْلًا

জান্নাতবাসীগণ সেদিন আবাস-স্থল হিসেবে অত্যন্ত উত্তম স্থান লাভ করবে, আর বিশ্রামাগার হিসেবেও অতি উৎকৃষ্ট স্থানে থাকবে।

আজহারী (রঃ) বলেছেন, مَقِيْلًا শব্দটি দ্বিপ্রহরে বিশ্রাম গ্রহণের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যদিও তাতে নিদ্রা না থাকে। أَحْسَنُ শব্দটি দ্বারা এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, জান্নাতবাসীদের আবাস-স্থল অতি সুন্দর, অতি মনোরম এবং আকর্ষণীয় হবে। বিভিন্ন রকম আরাম-আয়েশের আসবাবপত্র তাতে থাকবে। অথবা এর অর্থ হলো জান্নাতবাসীগণের আবাস-স্থল এত সুন্দর এবং আরামদায়ক হবে যা বর্ণনাতীত, এমনকি কল্পনাতীত।

এবনে মোবারক (রঃ), আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনে জরীর, এবনে আবি হাতেম এবং হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেনঃ কেয়ামতের অর্ধেক দিন শেষ হওয়ার পূর্বেই জান্নাতবাসীগণ তাঁদের স্থানে এবং দোযখীরা তাদের স্থানে পৌঁছে যাবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন এভাবেঃ কেয়ামতের দিন অর্ধেক হওয়ার পূর্বেই জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছে যাবে। এরপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেছেনঃ

ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ لَإِلَى الْجَحِيْمِ.

আবু নাঈম ইব্রাহীম নখয়ীর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেনঃ কেয়ামতের দিনের অর্ধেকের মধ্যেই মানুষের হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে এবং জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে এবং দোযখীরা দোযখে পৌঁছে যাবে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ সেদিনের প্রারম্ভেই হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে যাবে আর জান্নাতবাসীগণ জান্নাতে পৌঁছেই দ্বিপ্রহরের বিশ্রাম গ্রহণ করবেন। আল্লামা বগভী (রঃ) একথাও লিখেছেন, বর্ণিত আছে যে মোমেনদের জন্যে কেয়ামতের দিনকে ছোট করে দেয়া হবে যেমন আছর থেকে মাগরিব পর্যন্ত যে সময় হয় তার সমান।

وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَآءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا

"আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন আসমান মেঘমালা নিয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে, আর ফেরেশতাগণকে অবতরণ করানো হবে"।

"গামাম" অর্থাৎ হালকা বাদলের ন্যায় হবে যা দুনিয়াতে শুধু বনী ইসরাঈলের জন্যে আল্লাহ পাক ময়দানে তীহে নাযিল করেছেন। কেয়ামতের দিনের অবস্থা সম্পর্কে এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সমগ্র সৃষ্টি জগৎকে একটি ময়দানে একত্রিত করবেন। সমগ্র মানব জাতি, জ্বীন জাতি, সকল চতুঃষ্পদ জন্তু, সকল পাখী এক কথায় সমস্ত সৃষ্টিকে একত্রিত করবেন। এরপর দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান বিদীর্ণ হয়ে যাবে। আর আসমানের অধিবাসীগণ লাগাতার অবতরণ করতে থাকবে, তাদের সংখ্যা সৃষ্টি জগতের সংখ্যা থেকেও অধিক হবে। তারা অবতরণ করা মাত্র চারিদিক পরিবেষ্টন করে ফেলবে, তখন জমিনবাসীগণ জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মধ্যে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? জমিনবাসীকে জবাব দেয়া হবে, না।

এরপর দ্বিতীয় আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। যাদের সংখ্যা পৃথিবীর অধিবাসী ও প্রথম আসমানের অধিবাসীর চেয়েও অধিকতর হবে। লোকেরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মাঝে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? তারা বলবে, না। তারা সমগ্র মানব জাতি, জ্বীন জাতি এবং ফেরেশতাগণকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এরপর তৃতীয় আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে, যাদের সংখ্যা পৃথিবীর অধিবাসী এবং প্রথম ও দ্বিতীয় আসমানবাসীদের থেকেও অধিক হবে। মানুষ তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মাঝে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? তারা জবাব দেবে, না। এরপর চতুর্থ আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। তাদের সংখ্যাও জমিনবাসী এবং প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় আসমানবাসীদের থেকে অধিক হবে। লোকেরা তাদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মাঝে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? তারা বলবে, না। এরপর পঞ্চম আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। তাদের সংখ্যা ইতিপূর্বে যারা অবতরণ করেছে তাদের থেকে অধিক হবে। এরপর ষষ্ঠ আসমানের অধিবাসীগণ এভাবে অবতরণ করবে। অবশেষে সপ্তম আসমানের অধিবাসীগণ অবতরণ করবে। ইতিপূর্বে যত অবতরণ করেছে সকলের চেয়ে তাদের সংখ্যা বেশী হবে। লোকেরা তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের মাঝে কি আমাদের প্রতিপালক রয়েছেন? তারা জবাব দেবে, না। এরপর মেঘমালার মধ্যে আরশ অবতরণ করবে, যার চারিপার্শ্বে কাররুবীগণ[১] থাকবে, তাদের সংখ্যা সাত আসমান, সাত জমিনের অধিবাসীদের চেয়েও অধিক হবে। এরপর আরশ বহনকারীগণ থাকবে। আরশ বহনকারী ফেরেশতাদের শিং থাকবে। তাদের এক এক পদক্ষেপের মধ্যে দূরত্ব এত বেশী থাকবে যা কল্পনাতীত (যদিও এই হাদীসের বর্ণনাকারীদের মধ্যে কারো কারো সম্পর্কে হাদীসবেত্তাগণের আপত্তি রয়েছে তবে অনেক তফসীরকার এই হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন)।

[১]। ফেরেশতাদের বিশেষ একটি দল।

এবনে জরীর, এবনে মোবারক তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, যখন কেয়ামত কায়েম হবে তখন আসমান তার অধিবাসীদের নিয়ে ফেটে পড়বে, আর তখন ফেরেশতাগণ আসমানের এক পার্শ্বে থাকবে, তারা অবতরণ করবে এবং সমগ্র পৃথিবী ও তার অধিবাসীদেরকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে। এরপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম আসমানের ফেরেশতাগণ কাতার বন্দী হয়ে যাবে। একের পর এক ধারাবাহিকভাবে কাতার থাকবে। এরপর একজন ফেরেশতা অবতরণ করবে, যার বাম দিকে দোযখ থাকবে। জমিনবাসীগণ দোযখকে দেখে এদিক সেদিক পলায়ন করতে থাকবে। কিন্তু যেদিকেই যাবে সেখানে সাত কাতার ফেরেশতা তাদেরকে ঘেরাও করে নেবে। তাই বাধ্য হয়ে সেখানেই ফিরে আসবে, যেখান থেকে পলায়ন করেছিল। আল্লাহ্ পাক কোরআনে করীমে এ কথাটি এরশাদ করেছেনঃ

وَجَآءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا

(আপনার প্রতিপালক আগমন করবেন, আর ফেরেশতাগণ উপস্থিত থাকবে কাতারে কাতারে) আর অন্য একখানি আয়াতে রয়েছে–

يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَنْ تَنْفُذُوْا مِنْ اَقْطَارِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ فَانْفُذُوْا.

(সূরা আর রহমান)

"হে মানব ও জ্বীন জাতি! যদি তোমরা আসমান জমিনের চৌহদ্দী থেকে বের হয়ে যেতে পার তবে যাও"।

লোকেরা এ অবস্থায়ই থাকবে। এরপর একটি ভয়ংকর আওয়াজ হবে। আর তখন লোকেরা হিসাব নিকাশের জন্যে রওয়ানা হবে।

اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ ِالْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ

সেদিন প্রকৃত অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্ পাকের ক্ষমতা বিস্তার হবে যখন কোন অবস্থাতেই কারো কোন ক্ষমতা থাকবে না।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন সর্বতোভাবে সর্বত্র একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। আর সেই আধিপত্য হবে নিতান্ত একচ্ছত্র। একমাত্র তাঁরই আদেশ সেদিন কার্যকর হবে। যারা দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনবে, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবে, যথাযথভাবে তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করবে তারাই আল্লাহ্ পাকের রহমতের যোগ্য বলে বিবেচিত হবে। আর সেদিন তারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম রহমত লাভে ধন্য হবে।

পক্ষান্তরে, যারা দুনিয়াতে কাফের মুশরেক হবে, আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ থাকবে তারা তাঁর এ রহমত থেকে হবে বঞ্চিত, তাদের দুঃখ-কষ্টের কোন সীমা থাকবেনা।

আলোচ্য আয়াতে رَحْمٰنِ শব্দটি মোমেনদের উদ্দেশ্যে সান্ত্বনার ইঙ্গিত হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ কেয়ামতের দিন নিঃসন্দেহে কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন হবে। কিন্তু যারা মোমেন এবং পরহেযগার হবে তাদের জন্যে দয়াবান আল্লাহ্ পাকের দয়া মুষলধারে বৃষ্টির মত নাযিল হতে থাকবে। অতএব, মোমেনগণ যেন আল্লাহ্ পাকের রহমত থেকে নিরাশ না হয় তৎপ্রতি বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আর কাফেরদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে অন্যত্রঃ

لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ

আজকের দিন কার ক্ষমতা? এরপর আল্লাহ্ পাক নিজেই জবাব প্রদান করবেন,

لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ

আজকের দিনের ক্ষমতা এক আল্লাহ্ পাকেরই, যিনি কহরকারী, কাফেরদের জন্যে যাঁর কঠিন কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।[১]

কাফেরদের জন্যে কঠিন দিন

وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ عَسِيْرًا

"আর সেদিন হবে কাফেরদের জন্যে অত্যন্ত কঠিন"।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে সেদিন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, যা দুনিয়ার পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান হবে। আরজ করা হয় কত লম্বা দিন হবে? (কিভাবে তা অতিবাহিত করা হবে) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, মোমেনের জন্যে তা হবে অত্যন্ত সহজ, এমনকি একটি ফরজ নামাযের সময়ের চেয়েও তা সহজ হবে।[২]

ইমাম রাজী (রঃ)-এর বক্তব্য

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا বাক্যটির অর্থ হলো هَلَّا أُنْزِلَ অর্থাৎ আমাদের উপর কেন ফেরেশতাদেরকে নাযিল করা হলোনা? যারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতা সম্পর্কে আমাদের নিকট সাক্ষ্য প্রদান করত।

ইমাম রাজী (রঃ) আরো লিখেছেন যে, বিখ্যাত তফসীরকার কালবী (রঃ) এবং মোকাতেল (রঃ)-এর মতে, এ আয়াত নাযিল হয়েছে মক্কার আবু জেহেল-ওলীদ গংদের সম্পর্কে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতে বিশ্বাস করত না এবং আখেরাতের কথাও মানত না।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮০
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৩-৪৪

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যেহেতু পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হয়েছে, আর পবিত্র কোরআন তাঁর বিশেষ মোজেযা, সমগ্র মানব জাতি আজ পর্যন্ত পবিত্র কোরআনের ন্যায় বাণী রচনা করতে সক্ষম হয়নি। তাই এমনি বিস্ময়কর কালাম তথা পবিত্র কোরআনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁর নবুওয়্যতের প্রমাণ স্বরূপ ফেরেশতার আগমনের কোন প্রয়োজনই নেই।

দ্বিতীয়তঃ যদি আল্লাহ পাকের হুকুমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সত্যতার সাক্ষী হিসেবে ফেরেশতা অবতরণও করে, তবে তা-ও হবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা। অথচ কাফেররা ইতিপূর্বে তাঁর বহু মোজেযা দেখেছে তবু ঈমান আনেনি।

মূলতঃ তারা ফেরেশতাদেরকে দেখার বা মহান আল্লাহ পাকের দীদার লাভের যে আবদার করেছে, তা শুধু তাদের অন্তর্নিহিত অহংকারের কারণেই করেছে। আর এ অহংকার যতদিন তাদের মধ্যে থাকবে, ততদিন তারা হেদায়েত লাভ থেকে বঞ্চিত থাকবে।[১]

পবিত্র কোরআন ও হাদীস শরীফে একাধিকবার আল্লাহ পাকের আগমন বা অবতরণের উল্লেখ রয়েছে। এর তাৎপর্য কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে বলেছেন, এর তাৎপর্য হলো আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের নূরের তাজাল্লীর বহিঃ প্রকাশ হবে যা হবে তাঁর শানের মোতাবেক। যেভাবে আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার কোন দৃষ্টান্ত নেই, তাঁর পবিত্র সত্ত্বা এমন কিছু থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র এবং উর্ধ্বে, ঠিক এমনিভাবে তাঁর গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য সমূহেরও কোন দৃষ্টান্ত নেই, সকল প্রকার দৃষ্টান্ত থেকে তাঁর গুণাবলী পবিত্র। যেমন, কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقُلْ جَآءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ

"(হে রসূল!) আপনি বলুন, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিদায় নিয়েছে"। সত্য আসার তাৎপর্য হলো, সত্যের প্রকাশ ঘটা আর মিথ্যা বিদায় নিয়েছে। ঠিক এমনিভাবে আল্লাহ পাকের আগমনের কথাও এ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের নূরের তাজাল্লীর বহিঃপ্রকাশ হবে।[২]

---

[১]। তফসীরে কবীর খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৬৮

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮০

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلٰى يَدَيْهِ يَقُوْلُ
يٰلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُوْلِ سَبِيْلًا ﴿٢٧﴾ يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِيْ لَمْ
اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا ﴿٢٨﴾ لَقَدْ اَضَلَّنِيْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِيْ ؕ
وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا ﴿٢٩﴾ وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ
قَوْمِي اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ﴿٣٠﴾ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ
نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ ؕ وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا ﴿٣١﴾
وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْاٰنُ جُمْلَةً
وَّاحِدَةً ۚ كَذٰلِكَ ۚ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا ﴿٣٢﴾

তরজমা

(২৭) সীমালঙ্ঘনকারী (কাফের মুশরেক অনুতাপে) সেদিন দাঁত দিয়ে নিজের হাত কেটে আক্ষেপ করে বলবে, হায়! আমি যদি রসূলের সাথে সৎ পথ অবলম্বন করতাম!

(২৮) হায়! দুর্ভোগ আমার! আমি যদি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম!

(২৯) নিশ্চয় আমার নিকট উপদেশ পৌঁছার পর সে আমাকে বিভ্রান্ত করেছিল। আর শয়তান তো মানুষের জন্যে অত্যন্ত বড় প্রতারক।

(৩০) আর রসূল বলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি এই কোরআনকে বর্জনীয় বলে মনে করে।

(৩১) (আল্লাহ পাক এরশাদ করেন) আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে পাপীষ্ঠ শত্রু নিয়োগ করেছিলাম, (হে রসূল!) আপনার জন্যে আপনার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী রূপে যথেষ্ট।

(৩২) আর কাফেররা বলে, সমগ্র কোরআন একই সঙ্গে কেন আমাদের নিকট নাযিল হয়নি? এভাবেই (নাযিল করেছি) এবং (হে রসূল!) আপনার মনকে অবিচলিত রাখার জন্যেই আমি এমনভাবে নাযিল করেছি। আর ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আপনাকে তা পাঠ করে শুনিয়েছি।

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, উকবা এবনে আবি মুয়ীত যখন ভ্রমণ থেকে ফিরে আসত তখন মক্কার বিশিষ্ট লোকদের দাওয়াত করত এবং সকলের জন্যে আড়ম্বরপূর্ণ খাবারের ব্যবস্থা করত। এ লোকটি কখনও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারেও বসত। একবার সে ভ্রমণ থেকে ফিরে এসে মক্কার বিশিষ্ট লোকদেরকে তার বাড়ীতে খাবার গ্রহণের দাওয়াত করল। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকেও সে দাওয়াত করল (তিনি তশরিফ নিয়ে গেলেন)। উকবা যখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্মুখে খাদ্য দ্রব্য হাযির করল তখন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত তোমার খাবার গ্রহণ করব না, যতক্ষণ তুমি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ পাঠ করে তার মর্মবাণীর সত্যতার সাক্ষ্য প্রদান না করবে। উকবা কলেমায়ে শাহাদত পাঠ করল। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তার দাওয়াত কবুল করলেন। উকবা উবাই এবনে খালফের বন্ধু ছিল। উবাই যখন তার কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার কথা শ্রবণ করল, তখন সে উকবাকে বলল, তুমি ধর্মত্যাগী হয়েছ, উকবা বলল, তা সত্য নয়। কথা শুধু এতটুকু, আমার বাড়ীতে একজন মানুষ এসেছেন। তিনি কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ না করলে আমার খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। আমার পক্ষে এ অবস্থা সহ্য করা সম্ভব ছিল না যে কোন ব্যক্তি আমার বাড়ী থেকে খাবার গ্রহণ না করে চলে যাবে। এজন্যে আমি কলেমা শাহাদাত পাঠ করেছি। এরপর তিনি খাবার গ্রহণ করেছেন।

উবাই এবনে খালফ বলল, আমি সে পর্যন্ত তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবো না যে পর্যন্ত তুমি তার মুখের উপর থুথু না ফেল। তখন উকবা এ জঘন্য অপরাধ করল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তখন এরশাদ করেছিলেন, মক্কার বাইরে তোমাকে পাওয়া গেলে হত্যা করা হবে। বদরের যুদ্ধের দিন উকবাকে হত্যা করা হয়। আর উবাই এবনে খালফকে ওহোদের যুদ্ধের দিন হত্যা করা হয়।

তফসীরকার যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, উকবা এবনে আবি মুয়ীত যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারকের উপর থুথু দেয়, তখন তা ফিরে এসে তার গালের উপর পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার গাল জ্বলে যায়। আর মৃত্যু পর্যন্ত তার গালে ঐ চিহ্ন থেকে যায়।

ইমাম শা'বী (রঃ) বর্ণনা করেন, উকবা এবনে আবি মুয়ীত উমাইয়া এবনে খালফের বন্ধু ছিল। উকবা যখন ইসলাম গ্রহণ করে তখন উমাইয়া তাকে বলল, যেহেতু তুমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বয়আত করেছ, এজন্যে আমার চেহারা দেখা তোমার জন্যে, আর তোমার চেহারা দেখা আমার জন্যে হারাম। তখন উকবা ইসলামকে অস্বীকার করল আর ধর্মত্যাগী (মুরতাদ) হয়ে গেল। এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ

আর সেদিনকে স্মরণ কর যেদিন কাফেররা অনুতাপে দাঁত দিয়ে নিজের হাত কাটতে থাকবে। আর আক্ষেপ করে বলবে, হায়! যদি অমুকের কথা না মানতাম এবং হায়! যদি দুনিয়াতে অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম! রসূলের প্রদর্শিত পথে চলতাম! তবে আজ দুঃখের অকূল সাগরে ভাসতাম না! আলোচ্য আয়াতে 'জালেম' শব্দ দ্বারা উকবা এবনে আবি মুয়ীত এবনে উমাইয়া এবনে আবদ শামসকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

'আক্ষেপে দাঁত দিয়ে হাত কাটতে থাকবে' একথার তাৎপর্য হলো অনুতপ্ত হওয়া এবং একান্ত আক্ষেপ প্রকাশ করা। কেননা, আকাবা কেয়ামতের দিন অত্যন্ত আক্ষেপ করবে এজন্যে যে, সে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কথা অমান্য করে তাঁর সাথে বেয়াদবী করেছে এবং সত্য ও ন্যায়ের পথ বর্জন করেছে। পরিণামে তার ধ্বংস অনিবার্য হয়েছে।

তফসীরকার আতা (রঃ) বলেছেন, (কেয়ামতের দিন) আকাবা ক্ষোভে-দুঃখে, ব্যথায় নিজের হাত কনুই পর্যন্ত কামড়ে খেয়ে ফেলবে, কিন্তু পরক্ষণেই আবার তার হাত পূর্বের ন্যায় হয়ে যাবে। সে দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ করে পুনরায় তা খেয়ে ফেলবে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তার হাত পুনরায় ঠিক হয়ে যাবে। সে আক্ষেপ করে ঐ হাত কামড়ে খেতে থাকবে।[২]

يٰوَيْلَتٰى لَيْتَنِىْ لَمْ اَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيْلًا

হায় আক্ষেপ! যদি আমি অমুককে বন্ধু হিসেবে গ্রহণ না করতাম, অর্থাৎ দুনিয়াতে যাদের বন্ধুত্ব আখেরাতে মহাবিপদের কারণ হয়েছে তাদের কথা উল্লেখ করে দোযখীরা বলবে, হায় আক্ষেপ! যদি অমুকের কথা না মানতাম! যদি শয়তানের ফাঁদে না পড়তাম! যদি অমুকের সঙ্গে আমার কোন সম্পর্কই না থাকত তবে আজ এ বিপদ হতো না। অর্থাৎ আকাবা সেদিন আক্ষেপ করে বলবে, যদি দুনিয়াতে উবাই এবনে খালফের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব না হতো, তবে আজ এ মহা বিপদের সম্মুখীন হতাম না। হতভাগ্য কাফেররা আরো বিলাপ করে বলবে,

لَقَدْ اَضَلَّنِىْ عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ اِذْ جَآءَنِىْ

(আমার নিকট উপদেশ উপস্থিত হওয়ার পরও সে আমাকে বিভ্রান্ত করে দিল)

আলোচ্য আয়াতে 'জিকর' শব্দটি দ্বারা আল্লাহ পাকের স্মরণ, অথবা পবিত্র কোরআন অথবা হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উপদেশ অথবা কলেমা শাহাদাতকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেররা সেদিন আক্ষেপ করে বলবে, আমাদের অদৃষ্ট মন্দ, আল্লাহ পাককে স্মরণ করার আহ্বান তাঁর রসূলের মাধ্যমে আমরা পেয়েছিলাম, অথবা এর অর্থ হলো পবিত্র কোরআনও পেয়েছিলাম, অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশ শুনেছিলাম এমনকি, কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করার সুযোগও পেয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহর স্মরণের আহ্বানে সাড়া দেইনি, কোরআনের

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৪-৪৬
২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা-৪৪৬

শিক্ষাও গ্রহণ করিনি, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নছিহতের উপরও আমল করিনি। এমনকি, কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করেও তা অমান্য করেছি। আসলে শয়তান যত নষ্টের মূল, শয়তানের পাল্লায় পড়েই আমাদের এ দুরবস্থা, ঐ দূরাত্মা বন্ধুর কারণেই আমার সর্বনাশ হলো।

وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِلْاِنْسَانِ خَذُوْلًا

"আর শয়তানতো মানুষের জন্যে অত্যন্ত বড় প্রতারক"।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে 'শয়তান' শব্দটি দ্বারা মানুষের সেই বন্ধুকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে যা তাকে পথভ্রষ্ট করে। যে মানুষকে আদর্শচ্যুত, পথভ্রষ্ট করে, আল্লাহর পথে যে বাধার সৃষ্টি করে, সে জ্বীন হোক কি মানুষ সে হয় অবশ্যই শয়তান। আর শয়তান কারো বন্ধুও হয় না; বরং বন্ধু সেজে মানুষকে ধ্বংসের পথে ঠেলে দেয়।

তফসীরকারগণ আরো বলেছেন, এ আয়াত যদিও বিশেষ প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে, কিন্তু এর ক্ষেত্র অত্যন্ত বিস্তৃত। যে কেউ মানুষকে প্রতারণা করে, সত্য পথ থেকে বঞ্চিত করে তাদের সম্পর্কে এ আয়াতখানি প্রযোজ্য। হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ভাল এবং মন্দ বন্ধুর দৃষ্টান্ত হলো এরূপঃ যেমন এক ব্যক্তির নিকট সুগন্ধি রয়েছে, আর দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট রয়েছে চুল্লি। যার নিকট সুগন্ধি রয়েছে সে তোমাকে বিনামূল্যে সুগন্ধি দেবে, তুমি ইচ্ছা করলে ক্রয় করে নেবে অথবা তার নিকট থেকে তুমি পাবে। পক্ষান্তরে, যে চুল্লিতে অগ্নি সংযোগ করে, সে হয়তো তোমার পোষাক জ্বালিয়ে ফেলবে। অথবা তার তরফ থেকে কমপক্ষে দুর্গন্ধ তোমার নিকট পৌঁছবে। (বোখারী শরীফ) এই হাদীসে প্রথমতঃ নেককার বন্ধুর এবং দ্বিতীয়তঃ বদকার বন্ধুর পরিচয় দেয়া হয়েছে।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেনঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মোমেন ব্যতীত কারো সঙ্গে সময় অতিবাহিত করোনা। আর পরহেযগার ব্যতীত অন্য কেউ যেন তোমাদের খাবার গ্রহণ না করে। অর্থাৎ শুধু নেককার লোকদেরকেই দাওয়াত করবে। (আহমদ, তিরমিযী, এবনে হাব্বান, হাকেম)

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ মানুষ সাধারণতঃ নিজের বন্ধুর কথা-মত চলে এজন্যে পূর্বোহ্নেই দেখা উচিত যে, সে কার সঙ্গে বন্ধুত্ব করছে। (বগভী)

ইমাম আহমদ (রঃ) এবং ইমাম বোখারী (রঃ) ও ইমাম মুসলিম (রঃ) হযরত আনাস (রাঃ)-এর বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যা হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, মানুষ তারই সাথে থাকবে যার সাথে তার প্রীতি ও ভালবাসার সম্পর্ক থাকবে।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৬-৪৭

কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا

আর রসূল বলেন, "হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি এই কোরআনকে বর্জনীয় বলে মনে করে"। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেনঃ মক্কার কাফেররা যখন পবিত্র কোরআনের ব্যাপারে অন্যায়, অযৌক্তিক এবং আপত্তিকর মন্তব্য করতে থাকে, তখন স্বাভাবিক ভাবেই তাদের এ অন্যায় আচরণে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মন আহত হয়, তাই তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দূরাত্মা কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি কোরায়শরা পবিত্র কোরআনকে বর্জনীয় বলে মনে করে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে তারা উপেক্ষা করে চলে, পবিত্র কোরআন সম্পর্কে তারা অত্যন্ত আপত্তিকর মন্তব্য করে, তারা পবিত্র কোরআন নিজেও শ্রবণ করে না এবং অন্যকেও শ্রবণ করতে দেয় না, তাদের সম্মুখে যখন আমি পবিত্র কোরআন পাঠ করি, তখন তারা চিৎকার শুরু করে। যেমন অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَا تَسْمَعُوْا لِهٰذَا الْقُرْاٰنِ ـ الاية

আর কাফেররা বলে, এই কোরআন শ্রবণ করোনা। এভাবে পবিত্র কোরআন পাঠ করার সময় তারা চেচামেচি শুরু করত, যাতে করে কেউ পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতে না পারে এবং পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে না পারে। আর এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত ব্যথিত, মর্মাহত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে কাফেরদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ পেশ করেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কেয়ামতের দিন কাফেরদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ করবেন। তবে ইমাম রাজী (রঃ) বলেছেন, পূর্বোল্লেখিত ব্যাখ্যাই উত্তম। কেননা, পরবর্তী আয়াতে এ অভিযোগের প্রতি-উত্তরে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে এরশাদ করেছেনঃ

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِيْنَ

(আর এভাবেই আমি প্রত্যেক নবীর জন্যে পাপীষ্ঠ লোকদের থেকে শত্রু নিয়োগ করেছিলাম) ইতিপূর্বে যেভাবে অন্য নবী রসূলগণ কাফেরদের উৎপীড়ন-নির্যাতনে সবর অবলম্বন করেছেন (হে রসূল!) আপনিও অনুরূপভাবে সবর অবলম্বন করুন, ধৈর্যের সাথে পরিস্থিতি মোকাবেলা করুন।

তফসীরকারগণ বলেছেন, যদিও আলোচ্য আয়াত কাফেরদের ব্যাপারে নাযিল হয়েছে কিন্তু এর ক্ষেত্র ব্যাপক অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন দেশে যে কোন জাতি পবিত্র কোরআনকে অমান্য করবে, তার বিধানের প্রতি অবহেলা করবে তাদের পরিণতি অবশ্যই ভয়াবহ হবে, যেমন মক্কার কাফেরদের পরিণতি হয়েছিল অত্যন্ত শোচনীয়।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

وَكَذٰلِكَ

(এভাবেই) এ শব্দটি উচ্চারণ করে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে যে সান্ত্বনা দিয়েছেন তার মূল বক্তব্য এই, হে নবী! আপনার প্রতি কাফেররা যে অন্যায় আচরণ করেছে তা নতুন কিছু নয়, প্রত্যেক যুগেই নবী রসূলগণের বিরুদ্ধে দূরাত্মা কাফেররা ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু কোন ষড়যন্ত্রই তাদের জন্যে উপকারী হয়নি। ঠিক এমনিভাবে আপনার বিরুদ্ধে কাফেররা যে চক্রান্তে লিপ্ত হয়েছে, তা-ও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। কেননা, আল্লাহ পাক তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন এবং আপনাকে তিনি উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করাবেন এবং এ পর্যায়ে কারো কোন বাধা বা ষড়যন্ত্র কার্যকর হবে না। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَكَفٰى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَّنَصِيْرًا

(আর (হে রসূল!) আপনার জন্যে আপনার প্রতিপালকই পথ প্রদর্শক ও সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট) অর্থাৎ দুশমনের বিরুদ্ধে আপনার প্রতিপালকই সাহায্যকারী হিসেবে যথেষ্ট। দুশমনদেরকে শায়েস্তা করার জন্যে আল্লাহ পাকের কৌশলই কার্যকর হবে।

এ কথাটি দ্বারাও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, হে আমার নবী! আপনি কাফেরদের কথায় কোন অবস্থাতেই মনক্ষুণ্ন হবেন না। কেননা, আপনার পরওয়ারদেগার দুশমনদের বিরুদ্ধে আপনাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন, আর যদি কাউকে আল্লাহ পাক সাহায্য করেন, তবে তার আর কারো সাহায্যের প্রয়োজন হয় না।

এখানে একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মক্কার জীবনে দু'টি বড় সমস্যা ছিলঃ (এক) মক্কাবাসীর পথভ্রষ্ট হওয়া (দুই) মক্কাবাসীর তরফ থেকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কষ্ট দেয়া। আল্লাহ পাক আলোচ্য বাক্যে উভয় সমস্যারই সমাধান পেশ করে ঘোষণা করেছেনঃ (এক) আল্লাহ পাক হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট। অর্থাৎ যদি কাউকে হেদায়েত করা আল্লাহ পাকের মঞ্জুর হয়, তবে তিনি তাকে অবশ্যই হেদায়েত করবেন। যে কোন অবস্থায় সে হেদায়েত লাভ করবে।

(দুই) যদি কারো হেদায়েত আল্লাহ পাকের দরবার থেকে মঞ্জুর না হয় এবং সে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামকে কষ্ট দিতে চায়, তখন তার মোকাবেলা করার জন্যেও আল্লাহ পাকের তরফ থেকে সাহায্য আসবে। আর পথ প্রদর্শনকারী হিসেবে এবং সাহায্যকারী হিসেবে আল্লাহ পাক যথেষ্ট।[১]

এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। আলোচ্য আয়াতে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের মহান

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৩৪

দরবারে অভিযোগ পেশ করেছেন যে, তারা পবিত্র কোরআনকে বর্জনীয় মনে করে। ঠিক এমনিভাবেই বহুদিন পূর্বে হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতির বিরুদ্ধে আল্লাহ্ পাকের দরবারে অভিযোগ পেশ করেছিলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَّنَهَارًا۔ الاية

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! আমি আমার জাতিকে রাত দিন সত্য গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছি, কিন্তু তারা আমার আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং তারা আমার নছিহত থেকে পলায়নপর রয়েছে এবং এরপর হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতিকে প্রলয়করী বন্যা দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

প্রশ্ন হল, আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং হযরত নূহ (আঃ)-এর মধ্যে পার্থক্য কোথায়? অথচ তাঁকে রহমতুল্লিল আলামীন রূপে প্রেরণ করা হয়েছে। ইমাম রাজী (রঃ) এর জবাবে বলেছেন, পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) কাফেরদের কার্যক্রম বর্ণনা করার পর কাফেরদের বিরুদ্ধে আল্লাহ পাকের দরবারে বদ দোয়া করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছেন সত্য, কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন বদ দোয়া করেননি; বরং আল্লাহ পাকের আদেশের অপেক্ষা করেছেন। আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে সবরের তা'লিম দিয়েছেন। এটিই তাঁর বৈশিষ্ট্য, তাঁদের উভয়ের মাঝে এটিই পার্থক্য।[১]

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً

"আর কাফেররা বলে, সমগ্র কোরআন একই সময়ে কেন আমাদের নিকট নাযিল হয়নি"?

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম ও হাকেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেনঃ একবার মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্যে একথা প্রচার করতে থাকে, কোরআন যদি সত্যি সত্যি আল্লাহর কিতাব হতো, আর (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যদি আল্লাহর নবী হতেন তবে কোরআন অল্প অল্প করে বছরের পর বছর নাযিল হতো না; বরং অন্যান্য আসমানী কিতাবের ন্যায় এক সঙ্গে নাযিল হতো। যেমন, হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট তৌরাত এবং হযরত ঈসা (আঃ)-এর প্রতি ইঞ্জিল ও দাউদ (আঃ)-এর প্রতি যবুর নাযিল হয়েছে। কোরআনও ঠিক এমনিভাবে সম্পূর্ণ নাযিল হতো। আসলে এটি মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামেরই নিজস্ব রচনা। তাই তিনি স্থান-কাল-পাত্র বুঝে ধীরে ধীরে প্রকাশ করে থাকেন (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

---

[১]। তফসীরে কবীর খণ্ড ২৪, পৃষ্ঠা-৭৮

আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এ প্রশ্নের জবাবই দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

كَذٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهٖ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

এভাবেই (পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি) এবং (হে রসূল!) আপনার মনকে অবিচলিত রাখার জন্যেই আমি এমনিভাবে পবিত্র কোরআন নাযিল করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আপনাকে তা পাঠ করে শুনিয়েছি।

পবিত্র কোরআন অল্প অল্প করে নাযিল করার কারণ

১. মূলতঃ অল্প অল্প করে কোরআনে করীম নাযিল করার কারণ বুঝবার ক্ষমতাই এ কাফেরদের ছিলনা। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আপনার মনকে অবিচলিত রাখার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ পাকের মহান বাণী অল্প অল্প করে নাযিল করা হয়েছে।

২. অল্প অল্প করে কোরআনে করীম নাযিল করার ফলে তা মুখস্ত করা ও আয়ত্ব করা সহজ হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি করাও সহজ হয়েছে। যদি একই সঙ্গে সমস্ত কোরআন নাযিল করা হত, তবে এ উদ্দেশ্য সফল হতো না।

৩. প্রতিটি সমস্যার সমাধানে পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মনোবল বৃদ্ধি পেয়েছে।

৪. বিশেষ বিশেষ প্রয়োজনে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হওয়ার কারণে কোরআনে করীমের অলৌকিক মহিমা বারে বারে বিকশিত হয়েছে।

৫. আর পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন আয়াত নিয়ে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-এর বারে বারে আগমনও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মনোবল বৃদ্ধির কারণ হয়েছে এবং শান্তি ও সান্ত্বনার উপকরণ হয়েছে (প্রসঙ্গক্রমে এ পর্যায়ে উল্লেখযোগ্য, হযরত জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের পয়গাম নিয়ে সকল নবী রসূলের নিকটই আগমন করেছেন। কোন নবীর নিকট একবার দু' বারও এসেছেন। হযরত মূসা (আঃ)-এর নিকট জীব্রাঈল (আঃ) এসেছেন চারশ' বার। অন্যান্য নবীগণের মধ্যে এটিই সর্বাধিক সংখ্যা। কিন্তু আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর ২৩ বছরের নবুওয়্যতের আমলে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত জীব্রাঈল (আঃ)-কে ২৪ হাজার বার আসতে হয়েছে)।

৬. দূরাত্মা কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে নতুন নতুন চক্রান্ত করতো। তাদের শত্রুতা-ষড়যন্ত্র উত্তরাত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকতো। এ কারণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত পেরেশান হতেন। আর এমনি অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল হতো যা তাঁর সান্ত্বনার কারণ হয়।

৭. এতদ্ব্যতীত, এখানে আরও একটি কথা উল্লেখযোগ্য তা হল– কোরআনে করীমের অনেক বিধান রয়েছে, যার মধ্যে নাসেখ ও মনসুখ রয়েছে। যে আদেশটি রহিত হয় তাকে মনসুখ বলা হয়। আর নাসেখ ও মনসুখ একত্রিত হওয়া সম্ভব নয়।

৮. পবিত্র কোরআনের বহু আয়াত কাফেরদের প্রশ্নের জবাবে নাযিল হয়েছে। যে পর্যন্ত তাদের প্রশ্ন উত্থাপিত না হয় সে পর্যন্ত তার জবাব দেয়ার প্রশ্নই ওঠেনা। এমনিভাবে, অনেক আয়াত রয়েছে যা কোন নতুন ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে। এ ঘটনা ঘটার পূর্বে ঐ আয়াত নাযিল হবার প্রশ্ন অবান্তর।

৯. পবিত্র কোরআন অল্প অল্প করে নাযিল হতো এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদেরকে বলতেন, যদি এই কোরআনের সত্যতার ব্যাপারে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে, তবে তোমরা অনুরূপ আয়াত রচনা করে নিয়ে আস। কিন্তু তারা এভাবে পবিত্র কোরআনের মোকাবেলা করতে সক্ষম হতো না। আর বারে বারে তাদের এ অক্ষমতা প্রমাণিত হতো।[১]

১০. যদি একই সঙ্গে পবিত্র কোরআন নাযিল হতো তবে তা মুখস্থ করা কঠিন হয়ে পড়ত এবং তার মর্মবাণী আয়ত্ব করাও সহজ হতো না। অথচ অল্প অল্প করে নাযিল করার কারণে এ সুযোগ হয়েছে।

১১. যদি একই সঙ্গে পবিত্র কোরআন নাযিল হতো, তবে কাফেরদের পক্ষ থেকে বলা হতো যে, এত বড় কিতাব আমরা কি করে পাঠ করতে পারি! আর এখন যখন অল্প অল্প নাযিল হয়েছে আর কাফেররা এর কোন অংশেরই মোকাবেলা করতে সক্ষম হয় না, এমন অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মনোবল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। অতএব, একত্রে পবিত্র কোরআন নাযিল না করে অল্প অল্প করে নাযিল করার মধ্যে রয়েছে অসাধারণ সার্থকতা এবং অতুলনীয় উপকারিতা যা একই সঙ্গে নাযিল করার মধ্যে অর্জিত হতো না।

وَرَتَّلْنٰهُ تَرْتِيْلًا

"আর আমি ক্রমে ক্রমে আপনাকে তা পাঠ করে শুনিয়েছি"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, "আর আমি সুস্পষ্টভাবে, ধীরে ধীরে পবিত্র কোরআন পাঠ করেছি"।

তফসীরকার সুদ্দী (রঃ) এ আয়াতের অর্থ বর্ণনা করেছেন এভাবে– "আমি এই কিতাবকে খণ্ড খণ্ড করে বর্ণনা করেছি"।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল "আমি এর এক অংশকে আরেক অংশের পরে এনেছি"। আর ইমাম নখয়ী এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল "আমি এ মহান গ্রন্থকে বিভিন্ন খণ্ডে বিভক্ত করেছি"।

আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) বলেছেন, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহ একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে। কিন্তু পবিত্র কোরআন শ্রেষ্ঠতম আসমানী গ্রন্থ, নাযিল হয়েছে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলের প্রতি। তাই এ মহান গ্রন্থ অত্যন্ত বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত।

প্রথমতঃ যখন যা প্রয়োজন হতো এবং যে সমস্যা দেখা দিত, তার সমাধান-কল্পে প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে আসমানী হেদায়েত তথা পবিত্র কোরআনের অংশবিশেষ নাযিল হতো। দ্বিতীয়তঃ পবিত্র কোরআন অবতরণের মাধ্যমেও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে

---

[১]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৬-৭৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮২
তফসীরে কবীর খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৭৮-৭৯

ওয়াসাল্লামের উচ্চ মর্যাদার বহিঃপ্রকাশ হয়েছে, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন এভাবে তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বারে বারে কথা বলেছেন। এটি তাঁর উচ্চতম মর্যাদারই প্রমাণ। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যতদিন এ পৃথিবীতে ছিলেন, ততদিনই আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে এমনকি, যখন তিনি স্ব-স্থানে অবস্থান করেছেন, অথবা ভ্রমণরত ছিলেন, সকাল-সন্ধ্যায়, দিন-রাতে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের মহান বাণী তাঁর নিকট নাযিল হতে থাকে। এটি নিঃসন্দেহে তাঁর বৈশিষ্ট্য।

এতদ্ব্যতীত, এখানে আরো একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ যেভাবে একই সঙ্গে নাযিল হয়েছে, ঠিক তেমনি পবিত্র কোরআনও একই সঙ্গে লওহে মাহফুজ থেকে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানে নাযিল হয়েছে এবং এরপর প্রয়োজন মোতাবেক অল্প অল্প করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট অবতীর্ণ হয়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সমগ্র কোরআন একই সঙ্গে লায়লাতুল কদরে লওহে মাহফুজ থেকে নাযিল হয়েছে এবং পরবর্তীতে সুদীর্ঘ ২৩ বছরে দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমান থেকে অল্প অল্প করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট নাযিল হয়েছে। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, অন্যান্য আসমানী কিতাবের বৈশিষ্ট্য পবিত্র কোরআনের ক্ষেত্রে অক্ষুণ্ন রয়েছে, আর পবিত্র কোরআনের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, তা প্রয়োজন মাফিক সুদীর্ঘ ২৩ বছরে নাযিল হয়েছে।

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا ﴿٣٣﴾ الَّذِينَ
يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ
سَبِيلًا ﴿٣٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ
وَزِيرًا ﴿٣٥﴾ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ
تَدْمِيرًا ﴿٣٦﴾ وَقَوْمَ نُوحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ
لِلنَّاسِ آيَةً ۖ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا ﴿٣٧﴾ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ
الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَٰلِكَ كَثِيرًا ﴿٣٨﴾ وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ
الْأَمْثَالَ ۖ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا ﴿٣٩﴾

তরজমা

(৩৩) আর তারা (হে রসূল!) আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা হাযির করেনি, যার সঠিক সমাধান এবং উত্তম ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি।

(৩৪) যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় দোযখের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদের স্থান হবে অত্যন্ত জঘন্য এবং তারাই পথভ্রষ্ট।

(৩৫) আর নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম, আর তার ভ্রাতা হারুনকে করেছিলাম তার সাহায্যকারী।

(৩৬) আর আমি বলেছিলাম, তোমরা উভয়ে সেই সম্প্রদায়ের নিকট যাও, যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। এরপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম।

(৩৭) আর নূহের জাতিও যখন পয়গম্বরগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করি। আর মানব জাতির জন্যে তাদেরকে নিদর্শন স্বরূপ করে রেখেছিলাম এবং আমি প্রস্তুত করে রেখেছি জালেমদের জন্যে মর্মন্তুদ শাস্তি।

(৩৮) আর আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ এবং কূপের অধিবাসী লোকদেরকে এবং তাদের মধ্যকালীন অনেক সম্প্রদায়কেও আমি ধ্বংস করেছি।

(৩৯) আমি তাদের প্রত্যেকের জন্যে বর্ণনা করেছিলাম দৃষ্টান্ত এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংস করেছিলাম।

তফসীরুল কোরআন

কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এবং পবিত্র কোরআন সম্পর্কে যখনই কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতো বা কোন দৃষ্টান্ত পেশ করতো, সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক ঐ প্রশ্নের জবাব প্রদান করতেন এবং তাদের উত্থাপিত সমস্যার সমাধান ঘোষণা করতেন। এতে কোন রকম সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকতো না, কোন প্রকার অস্পষ্টতা থাকতো না। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কাফেররা সত্যকে গ্রহণ করতো না কেননা, তাদের অন্তর ছিল বক্র, সত্য তাদের নিকট বারে বারে উদ্ভাসিত হয়েছে কিন্তু তারা সত্য গ্রহণে কখনও রাজী হয়নি। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

"আর তারা (হে রসূল!) আপনার নিকট এমন কোন সমস্যা হাযির করেনি, যার সঠিক সমাধান এবং উত্তম ব্যাখ্যা আমি আপনাকে দান করিনি"।

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) লিখেছেন, কাফেররা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কোন প্রশ্ন করতো, আল্লাহ পাক সঙ্গে সঙ্গে তাদের প্রশ্নের জবাবে পবিত্র কোরআনের আয়াত নাযিল করতেন। নবুওয়্যতের তেইশ বছর কাল এ অবস্থাই বিরাজমান ছিল।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তারা এমন কোন বিস্ময়কর প্রশ্ন উত্থাপন করেনি যার সন্তোষজনক জবাব আল্লাহ পাকের তরফ

[১]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৭

থেকে সঙ্গে সঙ্গে প্রদান করা হয়নি, আর সে জবাব হতো উত্তম, আকর্ষণীয়, সুস্পষ্ট, হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্যবহ।[১]

হাকীমুল উম্মত হযরত থানবী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, কাফেররা যত বিস্ময়কর প্রশ্নই করুক না কেন, (হে রসূল!) আমি আপনাকে তাদের সে প্রশ্নের সুস্পষ্ট জবাব সঙ্গে সঙ্গে দিয়েছি, আর এ জবাবের দু'টি বৈশিষ্ট্য হতঃ

(১) ঐ জবাবের কারণে তাদের সকল সন্দেহ দূরীভূত হতো এবং (২) জবাব এত সুস্পষ্ট হতো যে, বিষয়টির ব্যাখ্যার আর কোন অবকাশ থাকতো না।[২]

اَلَّذِيْنَ يُحْشَرُوْنَ عَلٰى وُجُوْهِهِمْ اِلٰى جَهَنَّمَ ۙ اُولٰٓئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضَلُّ سَبِيْلًا

"যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় দোযখের দিকে একত্রিত করা হবে, তাদের স্থান হবে অত্যন্ত জঘন্য এবং তারাই পথভ্রষ্ট"।

কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতি

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শত্রুতা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি এবং পবিত্র কোরআনের প্রতি প্রশ্ন উত্থাপনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেয়ার কথাও বলা হয়েছে। এ আয়াতে দূরাত্মা কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

اَلَّذِيْنَ

অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে ইসলামের বিরোধিতা করে, পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষাকে উপেক্ষা করে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সঙ্গে শত্রুতা করে তাদেরকে একত্রিত করা হবে, ফেরেশতাদের দ্বারা ঘেরাও করে রাখা হবে, তাদেরকে মুখের উপর ভর দিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। দোযখের কারাগারই হবে তাদের চিরকালের আবাস-স্থল। আর ঐ স্থান অত্যন্ত জঘন্য, মন্দ, আর তারাই পথভ্রষ্ট।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন মানুষকে তিনভাবে চলতে হবে (১) আরোহী অবস্থায় (২) পদব্রজে (৩) মুখের উপর ভর করে। এক ব্যক্তি আরজ করলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! মানুষ মুখের উপর ভর করে কিভাবে চলবে? তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যিনি পায়ের উপর দিয়ে চলার শক্তি দিয়েছেন, তিনি মুখের উপর ভর করে চালাবারও শক্তি রাখেন। (আবু দাউদ, বায়হাকী)

হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসেও অনুরূপ কথা রয়েছে।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৯
[২]। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭১৫

হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমাকে আমার সত্য নবী বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন লোকেরা তিন দলে বিভক্ত হয়ে চলবে। এক দলের উদর-পূর্ণ এবং পোষাক পরিহিত অবস্থায় থাকবে। দ্বিতীয় দল পদব্রজে দৌড়াতে থাকবে। তৃতীয় দল মুখের উপর ভর করে থাকবে, ফেরেশতাগণ তাদেরকে দোযখের দিকে টেনে নিয়ে যাবে।[১] (নেসায়ী, হাকেম, বায়হাকী)

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا

"আর নিশ্চয় আমি মূসাকে কিতাব প্রদান করেছিলাম, আর তার ভ্রাতা হারুনকে করেছিলাম তার সাহায্যকারী"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সত্যতায় যাদের সন্দেহ ছিল, এ পর্যায়ে যারা বিভিন্ন প্রশ্নের অবতারণা করেছে পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে তাদের সে সব প্রশ্নের জবাব দেয়া হয়েছে এবং তাদের সন্দেহ নিরসন করা হয়েছে।

আলোচ্য আয়াত থেকে পূর্বকালের কয়েকজন নবী রসূলের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যাঁদেরকে তাঁদের জাতি অবিশ্বাস করেছিল, এর শোচনীয় পরিণাম স্বরূপ তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে এবং পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়েছে। এ বর্ণনা দ্বারা সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে তাদের উদ্দেশ্যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কোরআনকে অস্বীকার করে। আলোচ্য ঘটনা সমূহে বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে, এ পর্যায়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا مُوْسَى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَا مَعَهٗۤ اَخَاهُ هٰرُوْنَ وَزِيْرًا

(আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার ভাই হারুনকে তার সাহায্যকারী বানিয়েছি) আল্লাহর একত্ববাদের উজ্জ্বল দলিল প্রমাণ সহ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর জাতির নিকট প্রেরণ করেন এবং তাঁর ভ্রাতা হারুন (আঃ)-কে সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করেন, যাতে করে তাঁরা দ্বীন ইসলামের প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর নবুওয়্যতের মহান দায়িত্ব পালনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেন।

فَقُلْنَا اذْهَبَاۤ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ....

আমি বললাম, তোমরা উভয়ে এই জাতির হেদায়েতের জন্যে যাও, তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। অর্থাৎ সমগ্র সৃষ্টি জগতে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের তৌহিদের নিদর্শন সমূহ বিরাজমান রয়েছে, তারা তা দেখেও দেখেনা এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস করেনা; বরং তারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৪৯-৫০

করে, দেব-দেবীর পূজা করে। অতএব, তোমরা তাদের নিকট যাও এবং তাদেরকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাও, শেরক ও মূর্তিপূজা পরিহার করার শিক্ষা দাও।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, তা হলো হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা সমূহ। অর্থাৎ পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হবার সময় যারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা সমূহকে অস্বীকার করত, তাদের উদ্দেশ্যে একথা এরশাদ হয়েছে।

فَدَمَّرْنٰهُمْ تَدْمِيْرًا

"এরপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলাম"।

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে ফেরাউন ও তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট প্রেরণের পর তাঁরা যখন তাদেরকে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাসের আহ্বান জানান, তখন ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান করে। তাই তারা আল্লাহ পাকের আযাবের যোগ্য বলে বিবেচিত হয়, অবশেষে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনীর সলিল সমাধি হয়, ঠিক এভাবেই যারা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূলকে অস্বীকার করে, তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়া তো দূরের কথা, বরং তাঁর বিরোধিতায় তৎপর হয়, তারা যে কোন মুহূর্তে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হতে পারে। অতএব, হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতকে যারা অস্বীকার করেছে তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত সকলেরই।[১]

وَقَوْمَ نُوْحٍ لَّمَّا كَذَّبُوا الرُّسُلَ اَغْرَقْنٰهُمْ

"আর নূহের জাতিও যখন পয়গম্বরগণকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তখন আমি তাদেরকে নিমজ্জিত করি"।

হযরত মূসা (আঃ)-এর পূর্বে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, যেহেতু একজন নবীকে অস্বীকার করার মাধ্যমে প্রকারান্তরে সকল নবীকে অস্বীকার করা হয়, এ কারণেই আলোচ্য আয়াতে الرسل শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এর তাৎপর্য এই, যদি তাদের নিকট সমস্ত নবী রসূলগণকেও প্রেরণ করা হতো, তবে তারা তাঁদেরকেও অস্বীকার করত। অবশ্য এ বাক্যটির অর্থ এই নয় যে, তাদের নিকট অনেক রসূল প্রেরিত হয়েছেন। কেননা, তাদের নিকট শুধু হযরত নূহ (আঃ)-কেই প্রেরণ করা হয়, যিনি তাদের মাঝে সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত দ্বীনের তবলিগ করেছেন, সত্য গ্রহণের জন্যে তিনি তাদেরকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তারা তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-কে ঐতিহাসিক তরী নির্মাণের নির্দেশ প্রদান করেন। তাদের মাঝ থেকে অতি সামান্য সংখ্যক লোকই হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনে। তাঁর তরীতে আরোহন করে মাত্র ৪০ জোড়া মানুষ। আর অবশিষ্ট সমস্ত

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫১

লোককে আল্লাহ্ পাক প্রলয়ংকরী প্লাবনের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। হযরত নূহ (আঃ)-এর তরীতে যারা আরোহণ করেছিল, তাদের ব্যতীত তদানীন্তন পৃথিবীতে আর কেউই বেঁচে থাকেনি, এভাবে পাপীষ্ঠরা নিশ্চিহ্ন হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের অনুগত বন্দারা আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হয়েছে। অতএব, হে মক্কাবাসী! যদি তোমরা সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা কর, তবে তোমাদের পরিণাম হবে অত্যন্ত শোচনীয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَجَعَلْنٰهُمْ لِلنَّاسِ اٰيَةً

"আর মানব জাতির জন্যে তাদেরকে নিদর্শন স্বরূপ করে রেখেছিলাম"।
অতএব, এ নিদর্শন থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই কর্তব্য।

وَاَعْتَدْنَا لِلظّٰلِمِيْنَ عَذَابًا اَلِيْمًا

আর যারা কুফর এবং শেরক করে নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, আমি তাদের জন্যে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তৈরী করে রেখেছি।

وَّعَادًا وَّثَمُوْدَا وَاَصْحٰبَ الرَّسِّ

(আর আমি ধ্বংস করেছিলাম আদ, সামুদ এবং কূপের অধিবাসী লোকদের) অর্থাৎ কূপের অধিবাসী। বর্ণিত আছে যে, আজারবাইজানের মরুভূমিতে একটি কূপ রয়েছে, সেই কূপের চারিপার্শ্বে যারা বাস করতো তারা কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল। অথবা এর অর্থ হলে রস্ নামক মরুভূমির অধিবাসী। এ শব্দ দ্বারা তাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অথবা ঐ কাফেররা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করে দাফন করেছিলো। তাদের নিকট প্রেরিত নবীর নাম ছিলো হানজালাহ সানআনী। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে "আসহাবুর রস" শব্দটি দ্বারা হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর সম্প্রদায়কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। হযরত শোয়ায়ের (আঃ)-এর সম্প্রদায় একটি কূপের পার্শ্বে তাদের আবাসনের ব্যবস্থা করেছিল। এরা চতুঃস্পদ জন্তু পালন করত এবং মূর্তি পূজা করত। আল্লাহ্ পাক তাদের হেদায়েতের জন্যে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে প্রেরণ করলেন। তিনি তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের জন্যে আহ্বান করলেন কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দিল না; বরং হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে বিভিন্নভাবে নির্যাতন করতে থাকে। অবশেষে আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, তাদের ঐ জমিন ধ্বসে গেল এবং তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। এ বিবরণ পেশ করেছেন ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রঃ)। এবনে জরীর এবং এবনে আসাকের কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে এ বিবরণের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কূপের কথা বলা হয়েছে, তা ইয়ামামা নামক এলাকায় ছিল। ঐ এলাকার অধিবাসীরা তাদের নিকট প্রেরিত নবীকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

আল্লামা বগভী (রঃ) একথাও লিখেছেন যে সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বর্ণনা করেছেন, ঐ কূপবাসীর নিকট একজন নবী প্রেরিত হয়েছিলেন, যাঁর নাম ছিল হানজালাহ

এবনে সাফওয়ান। ঐ দূরাত্মা কাফেররা তাঁকে শহীদ করেছিল, তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন।

বর্ণিত আছে, ঐ সম্প্রদায় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একটি বিপদে পড়েছিল। একটি পাখী যার ঘাড় অনেক লম্বা ছিল, তাকে 'আনকা' বলা হতো। ঐ পাখীটি মাঝে মধ্যে ঐ সম্প্রদায়ের শিশুদেরকে ছোঁ মেরে নিয়ে যেত। আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাদের নিকট প্রেরিত নবী হানজালাহ্ ঐ পাখীর বিরুদ্ধে বদদোয়া করলেন, ফলে 'আনকা' নামক পাখীটি বজ্রপাতে ধ্বংস হল, কিন্তু এরপর ঐ সম্প্রদায় তাদের নবীকে শহীদ করল। পরিণামে তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের আযাব নাযিল হল এবং তাদের নিশ্চিহ্ন করা হল।

তফসীরকার কা'ব (রঃ), মোকাতেল (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) বর্ণনা করেছেনঃ 'রস' কূপটি ছিল আনতাকিয়া নামক স্থানে, লোকেরা হাবীব এবনে নাজ্জারকে হত্যা করে ঐ কূপে নিক্ষেপ করে। হাবীব এবনে নাজ্জার এবং তাঁর সম্প্রদায়ের কথা সূরা ইয়াসীনে উল্লেখ করা হয়েছে।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদেরকে 'আসহাবুর রস' বলা হয়েছে, তারা আসহাবুল ওখদুদ, এরা সেই জালেম সম্প্রদায় যারা মোমেনদেরকে ধ্বংস করার জন্যে একটি অগ্নিকুন্ড তৈরী করেছিল (তাদের ব্যাপারে সূরা বুরুজে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে)।[১]

وَقُرُوْنًا بَيْنَ ذٰلِكَ كَثِيْرًا

"এবং তাদের মধ্যকালীন অনেক সম্প্রদায়কেও আমি ধ্বংস করেছি"।

আলোচ্য আয়াতের قرون শব্দটি قرن শব্দের বহুবচন অর্থাৎ আদ জাতি, সামুদ জাতি সহ পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব জাতির উল্লেখ করা হয়েছে, তাদের ছাড়াও যুগে যুগে বহু জাতিকে তাদের অন্যায়-অনাচারের কারণে ধ্বংস করা হয়েছে। قرن শব্দটি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একখানি হাদীসেও ব্যবহৃত হয়েছে। তিনি এরশাদ করেছেনঃ

خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم

অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হলো আমার যুগ। এরপর পরবর্তী যুগ, এরপর পরবর্তী যুগ। অর্থাৎ সর্বোত্তম যুগ হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের যুগ, এরপর যাঁরা সাহাবায়ে কেরামকে দেখেছেন অর্থাৎ তাবেয়ীনদের যুগ, এরপর যারা তাবেয়ীনদের দেখেছেন, অর্থাৎ তাবে তাবেয়ীনদের যুগ।

এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য, কত বছরকে এক قرن বলা হয়, এ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞানীদের একাধিক মত রয়েছে। কেউ বলেছেন, চল্লিশ বছরের সময়কে এক قرن বলা হয়। কারো কারো মতে, দশ বছর, বিশ বছর, ত্রিশ বছর, পঞ্চাশ অথবা ষাট বছর, আর কারো মতে সত্তর বছর, আর কারো মতে নব্বই বছর, আর কারো কারো মতে, একশ' বছর বা তার চেয়ে বেশী সময়কে قرن বলা হয়। তবে সঠিক মত হলো, এক

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫২-৫৩

শতাব্দীকেই قرن বলা হয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একটি শিশুর জন্যে দোয়া করেছিলেন, সে যেন এক قرن পর্যন্ত বাঁচে। ঐ শিশুটি একশ' বছর বেঁচেছিল। এতে একথাই প্রমাণিত হয় যে, এক শতাব্দীকে قرن বলা হয়। আর আয়াতের মর্মকথা হল এই, হযরত নূহ (আঃ) থেকে নিয়ে পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়া পর্যন্ত যুগে যুগে বিভিন্ন দেশে অনেক কাফের মুশরেককে তাদের অন্যায়ের কারণে ধ্বংস করা হয়।

وَكُلًّا ضَرَبْنَا لَهُ الْأَمْثَالَ وَكُلًّا تَبَّرْنَا تَتْبِيرًا

(এবং আমি তাদের প্রত্যেকের জন্যে বর্ণনা করেছিলাম দৃষ্টান্ত এবং তাদের প্রত্যেককেই আমি ধ্বংস করেছিলাম) অর্থাৎ আল্লাহ পাক হঠাৎ কোন জাতিকে ধ্বংস করেন না; বরং তাদের নিকট নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাদেরকে সত্য গ্রহণের সুযোগ দিয়েছেন, তাদের প্রত্যেকের সম্মুখে শিক্ষণীয় ঘটনাবলীর দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, সত্যকে উপলব্ধি করার যথেষ্ট সুযোগ দিয়েছেন, কিন্তু এরপরও তারা যখন আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণকে অমান্য করেছে, সত্যের বিরোধিতায় তৎপর হয়েছে, জুলুম অত্যাচার করেছে এবং তাতে সীমালঙ্ঘন করেছে তখন আল্লাহ পাকের আযাব তাদের প্রতি আপতিত হয়েছে এবং তিনি তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছেন।

তফসীরকার জুযাজ (রঃ) বলেছেন, কোন জিনিষকে টুকরো টুকরো করে ভেঙে ফেলাকে تتبير বলা হয়। আর স্বর্ণ রৌপ্যের ক্ষুদ্র খণ্ডকে تبر বলা হয়।

যাহোক, পূর্বকালের এসব ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে এজন্যে যে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অবিশ্বাস করে এবং পবিত্র কোরআনকে অমান্য করে; তারা যেন এসব ঘটনা থেকে যথাসময়ে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারে।

وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي
أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ ۚ أَفَلَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ۚ بَلْ كَانُوا لَا
يَرْجُونَ نُشُورًا ﴿٤٠﴾ وَإِذَا رَأَوْكَ إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَٰذَا
الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا ﴿٤١﴾ إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ آلِهَتِنَا لَوْ
لَا أَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا ۚ وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ
مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٢﴾ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ ۖ أَفَأَنْتَ
تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا ﴿٤٣﴾ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ
أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا ﴿٤٤﴾

তরজমা

(৪০) তারা তো সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে, যার উপর বর্ষিত হয়েছিল অকল্যাণের বৃষ্টি, তারা কি তা লক্ষ্য করতো না? মূলতঃ তারা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করে না।

(৪১) (হে রসূল!) তারা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে বিদ্রুপ করা ব্যতীত তাদের যেন কোন কাজই নেই, আর তারা বলে, ইনিই কি তিনি আল্লাহ যাকে রসূল করে পাঠিয়েছেন?

(৪২) সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম। যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

(৪৩) তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার প্রবৃত্তিকেই উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে। তবু কি তুমি তার কর্ম বিধায়ক হবে?

(৪৪) অথবা তুমি কি মনে কর যে তাদের অধিকাংশ লোক শ্রবণ করে এবং বোঝে, তারা তো চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও বেশী পথচ্যুত।

তফসীরুল কোরআন

পূর্বের আয়াত সমূহের ন্যায় এ আয়াতেও পূর্বকালের একটি ধ্বংস-প্রাপ্ত জাতির উল্লেখ করা হয়েছে। এ আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তারা

'সদুম' নামক শহরে বাস করত। মক্কাবাসী সিরিয়া যাতায়াতের সময় সমুম জনপদটি দেখতে পায়, এখানেই লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় বাস করত। আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবার কারণে তাদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَقَدْ

আর নিশ্চয় মক্কাবাসী সেই জনপদ দিয়েই যাতায়াত করে, যাদের উপর প্রস্তর-বৃষ্টি হয়েছিল, যদি তারা ঐ কোপগ্রস্ত জাতির অবস্থা দেখত, তবে এ ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করত।

بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا

(মূলতঃ তারা পুনরুত্থানের আশঙ্কা করেনা) তারা যে ধ্বংসপ্রাপ্ত জনপদকে দেখে না তা নয়; বরং পুনরুত্থানে তারা বিশ্বাসই করেনা অর্থাৎ প্রতিটি মানুষকে যে অবশেষে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে এবং তাকে জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের হিসেব দিতে হবে, তারা একথায় বিশ্বাসই করে না। আর এ কারণেই তারা পাপাচারে লিপ্ত হয় এবং আত্ম সংশোধনের প্রয়াস পায়না। আলোচ্য আয়াতের الْقَرْيَةِ শব্দ দ্বারা সদুম শহরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। সদুম শহর ও তার উপকণ্ঠের অধিবাসীরা হযরত লুত (আঃ)-এর হেদায়েত গ্রহণ করেনি; বরং তাঁর প্রতি তারা বিদ্রুপ করত এবং সর্বদা ঘৃণ্য পাপাচারে লিপ্ত থাকত। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে সৎ পথে আনার সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন কথাই মানেনি; তাঁর বিরুদ্ধে তারা হয়েছিল তৎপর। তাই আল্লাহ পাক প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে ধ্বংস করে দেন।

اَفَلَمْ يَكُوْنُوْا يَرَوْنَهَا

অর্থাৎ মক্কাবাসীরা কি লুত (আঃ)-এর ধ্বংসপ্রাপ্ত সেই জনপদটি দেখেনি? অর্থাৎ তারা সদুম শহরের অধিবাসীদের ধ্বংসলীলা দেখেও তারা শিক্ষা গ্রহণ করেনি।

بَلْ كَانُوْا لَا يَرْجُوْنَ نُشُوْرًا

বরং প্রকৃত অবস্থা এই যে, তারা পুনর্জীবন লাভের আশঙ্কা করেনা অর্থাৎ মক্কাবাসী লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের ধ্বংসপ্রাপ্ত ঐ জনপদটি যে দেখে না তা নয়; বরং দেখে, কিন্তু তাদের অন্তর অন্ধ হয়ে গেছে, তারা অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা কিছুই দেখে না। তাই কেয়ামতের দিন তাদের পুনরুত্থান হবে, একথায়ও তারা বিশ্বাস করেনা। যেভাবে মোমেনগণ এ আশা রাখে যে, আখেরাতে তারা দুনিয়ার জীবনের সকল সত্য-সাধনার সওয়াব পাবে, সেভাবে কাফেররা আখেরাতের কোন আশা রাখেনা আর এজন্যে তারা সত্য-সাধনায় রত হয় না।

وَاِذَا رَاَوْكَ اِنْ يَّتَّخِذُوْنَكَ اِلَّا هُزُوًا

"(হে রসূল!) তারা যখন আপনাকে দেখে তখন আপনাকে বিদ্রুপ করা ব্যতীত তাদের যেন কোন কাজই নেই, আর তারা বলে, ইনিই কি তিনি যাকে আল্লাহ তাআলা রসূল করে পাঠিয়েছেন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সম্পর্কে কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন ও তার জবাব রয়েছে। এ আয়াত থেকে কাফেরদের অন্যায় আচরণের কিছু বিবরণ স্থান পেয়েছে।[১] যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করতো, তারা অতীতের কাফেরদের ভয়াবহ পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করেনি; বরং গোমরাহীর যে অন্ধকারে তারা ইতিপূর্বে ছিল, সেই অন্ধকারেই রয়েছে তারা নিমজ্জিত। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনা তো দূরের কথা, তারা তাঁকে বিদ্রুপ করত। এ দুরাত্মা কাফেররা যখনই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে দেখত, তখনই তাঁকে তারা বিদ্রুপ করত। অথচ তাঁর শান, তাঁর উচ্চ মর্যাদা, তাঁর আমানতদারী, তাঁর সততা ও সত্যবাদিতা, তাঁর চরিত্র-মাধুর্য এক কথায় তাঁর অনেক গুণ সম্পর্কে তারা অবগত ছিল। তারা স্বচক্ষে দেখত যে তিনি এতীম, মিসকীন, অনাথ বিপদগ্রস্ত লোকদের সাহায্য করছেন, শুধু তাই নয়; বরং তাঁর ন্যায় আমানতদার এবং বিশ্বস্ত লোক কেউ ছিল না। তাই তাঁর শত্রুরাও তাদের ধন-রত্ন তাঁরই নিকট আমানত রাখত।

কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর প্রতি ঈমান আনতো না; বরং তাঁকে নিয়ে বিদ্রুপ করাকেই তাদের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তাদের বিদ্রুপের ভাষা ছিল এই,

أَهٰذَا الَّذِيْ بَعَثَ اللّٰهُ رَسُوْلًا

ইনিই কি তিনি যাঁকে আল্লাহ পাক রসূল করে পাঠিয়েছেন? সারা পৃথিবীতে পয়গম্বরী প্রদানের জন্যে আল্লাহ পাক তাঁকেই খুঁজে পেলেন? (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)

إِنْ كَادَ لَيُضِلُّنَا عَنْ اٰلِهَتِنَا لَوْلَآ اَنْ صَبَرْنَا عَلَيْهَا

"সে তো আমাদেরকে আমাদের দেবতাদের থেকে দূরে সরিয়েই দিত, যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম"।

অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে, এ ব্যক্তির কথা মানব মনে বেখাপাত করে, তাঁর বক্তব্য শ্রবণ করলে যাদুর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করে, আমরা যদি অত্যন্ত যত্ন সহকারে আমাদের ঠাকুর দেবতার পূজা-অর্চনায় আত্মনিয়োগ না করতাম, তবে এ ব্যক্তির আহ্বানে আকৃষ্ট হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। কাফেরদের একথায় এ বিষয়টি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, ইসলামের প্রচারে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কঠোর পরিশ্রম করেছেন, এ পর্যায়ে তিনি অসাধারণ সাধনা করেছেন। অনেক মোজেযাও

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৬

তিনি দেখিয়েছেন। যার ফলে এ দূরাত্মা কাফেরদেরও ইসলাম গ্রহণের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, কিন্তু তাদের মূর্তিপূজা, তাদের জেদ এবং অহংবোধ তাদেরকে সরল সঠিক পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে এবং তারা হেদায়েত লাভের সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়েছে।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে ব্যাকুল থাকতেন এবং এ উদ্দেশ্যে অক্লান্ত সাধনা করতেন, তাই পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এবং কাফেরদের উদ্দেশ্যে উচ্চারণ করেছেন কঠোর সতর্কবাণী। এরশাদ হয়েছেঃ

وَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ حِيْنَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ اَضَلُّ سَبِيْلًا

"যখন তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট"। এ বাক্যটিতে প্রথমতঃ রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা এ মর্মে যে, (হে রসূল!) এ কাফেররা আপনার প্রতি এবং মুসলমানদের প্রতি যে অকথ্য নির্যাতন করছে, তা আর বেশী দিন তারা করতে সক্ষম হবেনা কেননা, অদূর ভবিষ্যতে তারা তাদের কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ পাকের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন তারা মর্মে মর্মে অনুভব করবে, কে ছিল পথভ্রষ্ট, আর কে ছিল সত্য পথের উপর সুপ্রতিষ্ঠিত। আর এ শাস্তি আসতে বিলম্বও হবে না, سَوْفَ শব্দটি দ্বারা একথা বোঝানো হয়েছে যে, কাফেরদের শাস্তি অতি নিকটবর্তী।

اَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهٗ هَوٰىهُ

(হে রসূল!) আপনি কি ঐ লোকটিকে দেখেছেন, যে তার প্রবৃত্তিকেই উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির প্রতি অনুগত হয়েছে, যে তার খেয়াল খুশি মাফিক চলে, কোন সত্য কথা শ্রবণও করেনা এবং কোন সত্য কথা মানেওনা, তার প্রবৃত্তি যা বলে তাই সে মানে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেনঃ এর অর্থ হল, "(হে রসূল!) আপনি কি এমন ব্যক্তিকে দেখেছেন যে আল্লাহর এবাদতকে বর্জন করেছে, যিনি তাঁর স্রষ্টা ও পালনকর্তা, আর সে পাথরের দিকে আকৃষ্ট হয়েছে এবং পাথরের পূজা করেছে"।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম এবং এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, অজ্ঞতার যুগে লোকেরা কোন একটি পাথরের পূজা করতো, তার চেয়ে সুন্দর আরও একটি পাথর পেলে নতুন পাথরটির পূজা করতো, পুরাতনটির পূজা বর্জন করতো। তখন এ আয়াত নাযিল হয়।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫৬

আর এবনে মুনজের এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আলোচ্য আয়াতের অর্থ হল কাফেররা কোন প্রকার দলিল-প্রমাণ ব্যতীতই তাদের ধর্মমত গ্রহণ করতো। কখনও এক পাথরকে তারা পূজা করতো; পরে এর চেয়ে সুন্দর পাথর পেলে পুরাতনটি বাদ দিয়ে নতুনটির পূজা করতো।[১]

অতএব, যারা প্রবৃত্তির দাসত্ব করে বেড়ায়, যারা কোন পাথর পছন্দ হলে তার পূজা শুরু করে দেয় এবং এর চেয়ে সুন্দর কোন পাথর পেলে পূর্বের পছন্দনীয় পাথরকে বর্জন করে, এমন পথভ্রষ্ট জাতিকে (হে রসূল!) আপনি কিভাবে হেদায়েত করবেন?

أَفَأَنتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا

(হে রসূল!) আপনি কি কখনও তার দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারেন? আর এ দায়িত্ব গ্রহণ করে আপনি কি তাকে প্রস্তর খণ্ডের পূজা থেকে বিরত রাখতে পারেন?

অর্থাৎ আপনি তার শেরক ও কুফরের জন্যে দায়ী নন।

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ۚ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ ۖ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

"অথবা আপনি কি মনে করেন যে, তাদের অনেকেই শুনতে পায় অথবা বুঝতে পারে, আদৌ নয়, তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়েও অধিকতর পথভ্রষ্ট"।

মূলতঃ চতুঃষ্পদ জন্তু তাদের কথা মেনে চলে এবং প্রভূ ভক্তির দৃষ্টান্ত পেশ করে থাকে, এমনকি প্রভূর নিরাপত্তার খাতিরে প্রাণ দিতেও দ্বিধাবোধ করে না। অথচ এ কাফেররা চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম। এতে কোন সন্দেহ নেই যে. চতুঃষ্পদ জন্তুর জ্ঞান বুদ্ধি থাকে না, এতদসত্বেও তাদের প্রভূর ডাকে তারা বিলম্বও করেনা। অথচ এ হতভাগা কাফেররা তাদের মালিকের পরিচয় পায় না, যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; যিনি তাদেরকে লালন-পালন করছেন, তাঁকে তারা চেনে না।

মূলতঃ তারা আল্লাহ পাকের কথা শ্রবণও করেনা এবং বোঝেওনা এবং তাঁর মহান বাণী তাদের কর্ণ কুহরে প্রবেশ করে না, কেননা তাদের অন্তর সমূহকে আল্লাহ পাক মোহরাঙ্কিত করে দিয়েছেন। তাই কোন আদেশ-উপদেশ-নসিহত তাদের জন্যে উপকারী হয় না। আর তাদের মধ্যে কেউ কেউ এমনও রয়েছে যে, তারা সত্য বোঝে কিন্তু তাদের অহংকার ও জেদের বশীভূত হয়ে এবং তাদের নেতৃত্ব বিনষ্ট হওয়ার আশঙ্কায় তারা সত্যকে গ্রহণ করেনা।

মূলতঃ এরা চতুঃষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তার চেয়ে বেশী পথভ্রষ্ট।

[১]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৭৯

কাফেররা চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম

চতুঃষ্পদ জন্তুর জ্ঞান নেই, আর তাদের জ্ঞান আছে, চতুঃষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকলেও সে তার প্রভূর ডাকে সাড়া দেয়, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে কিন্তু এ দূরাত্মা কাফেররা নিজের জীবনের মালিককে চেনে না এবং তার অনুগতও হয় না এমনকি, তিনি তাদের হেদায়েতের জন্যে যখন নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেন এবং তাঁরা তাঁদের মোজেযা প্রদর্শন করেন, তারপরও এ কাফেররা সত্য গ্রহণে প্রস্তুত হয়না, বরং সত্যের বিরোধিতায় তৎপর থাকে।

চতুঃষ্পদ জন্তুরা সত্যকে সত্য জানেনা, বাতিলকে বাতিল বোঝেনা কেননা, তাদেরকে বোধ শক্তি দেয়া হয়নি, কিন্তু তারা হক্বকে বাতিল মনে করেনা। এ দূরাত্মা কাফেররা হক্বকে বাতিল মনে করে এবং বাতিলকে হক্ব। তাই তারা চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম।

মূর্খতার দু'টি স্তর রয়েছে। প্রথম স্তর হলো, এক ব্যক্তি কিছুই জানেনা তবে একথা জানে যে সে জানেনা, এ মূর্খতা সহনীয় কিন্তু এর চেয়েও মারাত্মক মূর্খতা হলো আরেক ব্যক্তি যে কিছুই জানেনা অথচ সে মনে করে যে, সে অনেক কিছু জানে। কাফেররা এ পর্যায়ের মূর্খ। যিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, সর্বদা লালন-পালন করছেন, অহরহ তার অনন্ত অসীম নেয়ামত মানুষ ভোগ করছে, কিন্তু তারা তাঁর প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি এবং আনুগত্য প্রকাশ করেনা, তাঁর সম্মুখে মাথানত করেনা, তবে মাথা নত করে তাদের হাতে গড়া মূর্তিগুলোর সম্মুখে, আর এ কাজকে তারা দুর্ভাগ্য বশতঃ পূণ্যের কাজ মনে করে, এ কারণে তাদেরকে চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলা হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেনঃ কাফেরদেরকে চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়ে অধম বলার কারণ এই, তারা তাদের প্রভূকে চেনে এবং তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে।

দ্বিতীয়তঃ চতুষ্পদ জন্তুও তার উপকারী ও ক্ষতিসাধনকারীর মধ্যে পার্থক্য করে; শুধু তাই নয়; বরং যা দ্বারা তারা উপকৃত হয় তা পেতে চায়, পক্ষান্তরে যা দ্বারা তাদের ক্ষতি হয় তা থেকে আত্মরক্ষা করে, কিন্তু এ দূরাত্মা, হতভাগা কাফেররা নিজেদের ভাল-মন্দের মধ্যে পার্থক্য করে না এবং তাদের চির শত্রু ইবলিসের সঙ্গে তারা করে বন্ধুত্ব, তার অনুগত হয় এবং যে কাজে দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের লাভ হবে, তা থেকে তারা থাকে দূরে, আর যা তাদের জন্যে ক্ষতিকর হয়, তার প্রতি হয় তারা আকৃষ্ট। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক তাদেরকে চতুঃষ্পদ জন্তুর চেয়েও অধম বলেছেন। আরো একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, চতুঃষ্পদ জন্তুর মনে যেমন জ্ঞানের কোন পরশ নেই তেমনি মূর্খতারও কোন স্থান নেই, কিন্তু কাফেরদের ব্যাপার ভিন্নধর্মী, তাদের নিকট একে তো এলম বা জ্ঞান নেই, উপরন্তু তাদের অন্তর মূর্খতায় পরিপূর্ণ। কাফেররা জানেনা, তাদের পরিণতি কত ভয়াবহ হবে, আর তারা জানেনা যে একথাও জানেনা, এতদসত্ত্বেও তারা একথার দাবীদার যে তারা জানে। দ্বিতীয়তঃ চতুঃষ্পদ জন্তুর জ্ঞান না থাকা কারো জন্যে ক্ষতিকর হয়না; কিন্তু এ কাফেরদের মূর্খতা শুধু তাদের নিজেদের জন্যেই ক্ষতিকর হয়না;

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৫৭

বরং অন্যদের জন্যেও হয় বিরাট অনিষ্টের কারণ। কেননা, তারা মানুষকে সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে এবং মন্দের দিকে আহ্বান জানায়। পরিণামে অনেককেই তারা পথভ্রষ্ট করে।

তৃতীয়তঃ চতুঃষ্পদ জন্তুর এলম বা জ্ঞান না থাকলে তার প্রতি কোন শাস্তি হয় না, আখেরাতেও হবে না; কিন্তু এ কাফেরদের জন্যে কঠিন কঠোর শাস্তি অপেক্ষা করছে।[১]

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, চতুঃষ্পদ জন্তু নিজের স্রষ্টাকে চেনে, তাঁর প্রতি অনুগত থাকে এবং আল্লাহ পাকের তসবীহ্ পাঠে মশগুল থাকে। যদিও সাধারণ লোকেরা ের তসবীহ বুঝতে পারে না। বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী াহ্ আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ব্যক্তি একটি গরু নিয়ে যাচ্ছিল, া চলতে সে ক্লান্ত হয়ে পড়ে এবং গরুর ওপর আরোহণ করে (আল্লাহ পাক গরুটিকে বাকশক্তি দান করেন) গরুটি তখন বললো, আমাকে এজন্যে সৃষ্টি করা হয়নি, আমাকে জমীনে কাজ করার জন্যে সৃষ্টি করা হয়েছে। লোকেরা একথা শ্রবণ করে বললো, সুবহানাল্লাহ! গরু কি কথা বলে? হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ একথার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে এবং আবুবকর ও উমরও একথা বিশ্বাস করে, অথচ তাঁরা ঐ সময় উপস্থিত ছিলেন না।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ এক ব্যক্তি তার ছাগল নিয়ে যাচ্ছিলো, হঠাৎ একটি বাঘ ছাগলটির উপর আক্রমণ করলো, ছাগলের মালিক উপস্থিত হয়ে ছাগলটিকে বাঘের হাত থেকে ছিনিয়ে নিলো, তখন বাঘটি বললো, কেয়ামতের দিন কে তাকে সাহায্য করবে? যখন আমি ব্যতীত তার কোন রক্ষণাবেক্ষণকারী থাকবে না, লোকেরা বলল সুবহানাল্লাহ! বাঘ কি কথা বলতে পারে? হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ এর উপর আমি বিশ্বাস করি এবং আবু বকর ও উমরও বিশ্বাস করে। তাঁরা তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন না।

[১]। তফসীরে কবীর খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৮৭

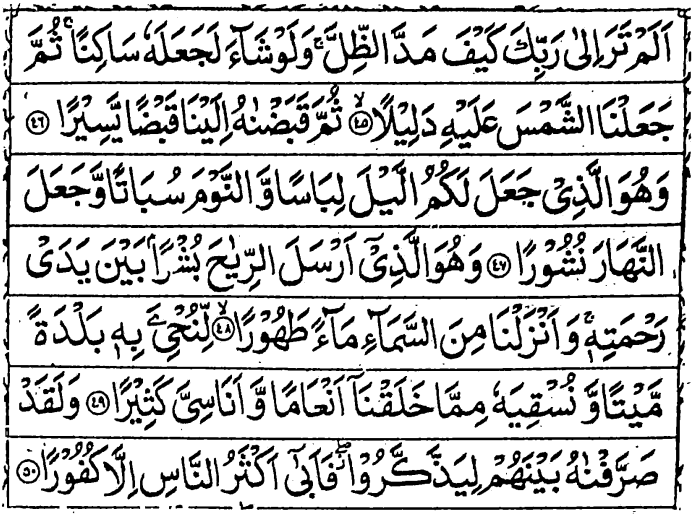
أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ ۖ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ
جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴿٤٥﴾ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ إِلَيْنَا قَبْضًا يَسِيرًا ﴿٤٦﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ
النَّهَارَ نُشُورًا ﴿٤٧﴾ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ
رَحْمَتِهِ ۚ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ﴿٤٨﴾ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً
مَيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ﴿٤٩﴾ وَلَقَدْ
صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۖ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا ﴿٥٠﴾

তরজমা

(৪৫) তুমি কি তোমার প্রতিপালকের প্রতি লক্ষ্য করোনি কিভাবে তিনি ছায়া সম্প্রসারণ করেছেন, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে স্থির করে রাখতে পারতেন। এরপর সূর্যকে আমি কিভাবে পথ-প্রদর্শক করেছি?

(৪৬) এরপর ধীরে ধীরে আমি তাকে নিজের দিকে টেনে এনেছি।

(৪৭) আর তিনিই তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, তোমাদের বিশ্রামের জন্যে দিয়েছেন নিদ্রা আর উত্থানের জন্যে তিনি দিয়েছেন দিন।

(৪৮) আর তিনি স্বীয় রহমত নাযিল করার প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ করেন বায়ু আর আমি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি।

(৪৯) যা দ্বারা আমি মৃত ভূখণ্ডকে সঞ্জীবিত করি, আর আমারই সৃষ্টি অনেক জীব-জন্তু এবং মানুষকে আমি তা পান করাই।

(৫০) আর আমি তা তাদের মধ্যে বিতরণ করি যাতে করে তারা স্মরণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাতে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে মুশরেকদের মূর্খতা এবং পথভ্রষ্টতার কথা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত সমূহ বর্ণিত হয়েছে যা তাঁর তৌহিদ বা একত্ববাদের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আর এ প্রমাণ সমূহ কাফেররা অহরহ দেখতে পায়, যদি ক্ষণিকের জন্যেও তারা চিন্তা করে তবে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের সত্যতা অনুধাবন করা কারো পক্ষেই আদৌ কঠিন হয় না।[১]

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৮৯

ইমাম রাজী (রঃ) বিষয়টিকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। যেহেতু পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের উপর কাফেরদের পক্ষ থেকে উত্থাপিত প্রশ্নের বিবরণ রয়েছে, তাই এ আয়াত থেকে তৌহিদের দলিল প্রমাণ বর্ণিত হচ্ছে।[১]

তৌহিদের প্রমাণ

তৌহিদের প্রমাণ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত সমূহে কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, ছায়া, সূর্য, রাত দিনের পরিবর্তন প্রভৃতি। মানব জীবনে এসবের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلٰى رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ

তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, তোমার প্রতিপালক কিভাবে ছায়াকে সম্প্রসারিত করেছেন? কিভাবে ছায়া সর্বপ্রথম দীর্ঘ হয় এবং বিস্তৃতি লাভ করে। বেলা যত বাড়তে থাকে তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়া ক্রমশঃ সংকুচিত হতে থাকে। প্রত্যক্ষদর্শী মাত্রই লক্ষ্য করে দ্বিপ্রহরে সম্প্রসারিত ছায়াটি নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সংকুচিত করে ফেলে। এদিকে সূর্য যখন পশ্চিম দিকে ঢলে যায় তখন ছায়াটি আবার সুদীর্ঘ হয় এবং তা বিস্তৃতি লাভ করে। প্রশ্ন হল, ছায়ার এ পরিবর্তন ও পরিবর্ধন কে করেন? এ প্রশ্নের একই জবাব, তা হল এক আল্লাহ পাকই সব কিছু করেন। তিনি এক, অদ্বিতীয়, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, দ্যূলোক-ভূলোকে যা কিছু আছে সবই তাঁর কর্তৃত্বাধীন। আল্লাহ পাকের মা'রেফাত বা পরিচয় লাভ করতে হলে, তথা স্রষ্টার পরিচয় পেতে হলে তাঁর সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। দুনিয়ার প্রকৃত অবস্থা বুঝতে হলে সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে এবং এতে তার স্রষ্টার পরিচয় পাওয়া যাবে।

একদিন পৃথিবীর কোন কিছুর অস্তিত্ব ছিলনা, আল্লাহ পাক দয়া করে এক একটি বস্তু সৃষ্টি করেছেন এবং বস্তু মাত্রকে তার অস্তিত্ব দান করেছেন যা ছিল অনস্তিত্বের গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। অবশেষে আল্লাহ পাক প্রদত্ত অস্তিত্বের আলোয় সবই উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। কিন্তু কথা এখানেই শেষ নয়; বরং এই ছায়া পুনরায় প্রথম অবস্থায় ফিরে যাবে। অর্থাৎ শূণ্যের আঁধারে মিশে যাবে। অতএব, পৃথিবী এবং পৃথিবীর এ জীবন ছায়ার ন্যায় অর্থাৎ পূর্বে ছিলনা পরেও থাকবেনা। এখানে একথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, মানুষের আধ্যাত্মিক ও আত্মিক জীবনের অবস্থাও অনুরূপ। আল্লাহ পাকের নাফরমানী ও কুফরের অন্ধকারে আচ্ছন্ন আত্মা ঐ অবস্থাতেই থাকতো যদি আল্লাহ পাকের হুকুমে নবুওয়্যতের সূর্যোদয় না হতো। আল্লাহ পাক যদি তাঁর দয়া-মায়ায় নবুওয়্যতের সূর্যোদয় না করতেন তবে মানবাত্মা কখনও সত্য পথের সন্ধান পেত না।

وَلَوْ شَآءَ لَجَعَلَهٗ سَاكِنًا

[১]। তফসীরে কবীর খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-৮৮

(তিনি ইচ্ছা করলে তাকে স্থির করে রাখতে পারতেন) অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যদি ইচ্ছা হতো, তবে তিনি ছায়াকে স্থির করে রাখতেন। এমন অবস্থায় সূর্য উঠতো না, কেয়ামত পর্যন্ত রাতই থাকত। অতএব, সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত ছায়ার সম্প্রসারিত হওয়া, এরপর সূর্যোদয় হওয়া, এরপর জমীনে তার আলো বিচ্ছুরিত হওয়া, এরপর ছায়া সংকুচিত হওয়া-এসব কিছুই আল্লাহ পাকের মহান কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ। আলোচ্য আয়াতে ظل শব্দটি ছায়া অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, আর তা সোবহে সাদেক থেকে সূর্যোদয় পর্যন্ত এমন একটি সময় যখন শুধু ছায়াই থাকে, তখন সূর্যের আলোও থাকে না এবং রাতের অন্ধকারও থাকে না, আলো-আঁধারের এ মাঝামাঝি অবস্থাকে ظل বা ছায়া বলা হয়।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, ছায়া এমন একটি মধ্যবর্তী বস্তুর নাম যা সম্পূর্ণ আলো এবং ঘন অন্ধকারের মাঝে বিরাজ করে, আর এ মধ্যবর্তী অবস্থা অত্যন্ত উত্তম এবং মনোরম সময়। কেননা, মানব মন স্বভাবতই অন্ধকারকে পছন্দ করে না আর সূর্যের কিরণ যখন মানুষের নয়ন যুগলের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তখনও তা তার জন্যে সহনীয় হয় না। অতএব, ঘন অন্ধকার এবং আলোর মাঝে আলো-আঁধারের ঐ অবস্থা যাকে আলোচ্য আয়াতে ظل বলা হয়েছে, তা মানব জাতির জন্যে আল্লাহ পাকের একটি বিশেষ রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন, তবে এ ছায়াকে আল্লাহ পাক স্থির করে রাখতেন, তখনও তা মানুষের জন্যে কষ্টকর হতো। সূর্যের উদয়-অস্ত তার এখতিয়ারভুক্ত নয়; বরং সব কিছুই একমাত্র আল্লাহ পাকের ইচ্ছাধীন, ঠিক এমনিভাবে ছায়া সম্প্রসারিত বা সংকুচিত হওয়া অথবা স্থির থাকা-এর কোনটিই সূর্যের ইচ্ছাধীন নয়; বরং সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের কর্তৃত্বাধীন। তাই পরবর্তী বাক্যে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيْلًا

এরপর সূর্যকে আমি কিভাবে পথপ্রদর্শক করেছি? অর্থাৎ সূর্য যদি না হতো তবে ছায়াও থাকত না যেমন অন্ধকার না থাকলে আলোর পরিচয় পাওয়া যেত না।

এতদ্ব্যতীত, ছায়া সম্প্রসারিত হওয়া বা সংকুচিত হওয়ার মধ্যে সূর্যের অবদান রয়েছে।

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا

"এরপর ধীরে ধীরে আমি তাকে নিজের দিকে টেনে এনেছি"-এ বাক্যটির দু'টি অর্থ হতে পারে। এরপর আমি তাকে সহজে নিজের দিকে টেনে এনেছি, অথবা এর অর্থ হলো, আমি তাকে ধীরে ধীরে, পর্যায়ক্রমে নিজের দিকে টেনে এনেছি। সূর্যোদয় এবং তার কিরণ সমূহ বিচ্ছুরিত হওয়ার মাধ্যমে ছায়া দূরীভূত হয়। আর ছায়ার স্থলে সূর্যের আলো স্থান গ্রহণ করে, প্রথমে ধীরে ধীরে অন্ধকার বিদায় হতে থাকে, এমনকি অবশেষে সর্বত্র সম্পূর্ণভাবে আলো ছড়িয়ে পড়ে, এরপর সূর্য ওঠে।

আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভের পন্থা

আল্লাম সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, এর আরো একটি ব্যাখ্যাও হতে পারে। যখন কোন সত্য-সাধক আল্লাহ্ পাকের আশেক বন্দার অন্তরে আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বার বা তাঁর গুণাবলী প্রভাব বিস্তার লাভ করে, আর এভাবে বন্দা আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়, তখন আল্লাহ্ পাকের সান্নিধ্য লাভের বরকতে দুনিয়া এবং আখেরাত উভয় জাহানের তাৎপর্য ঐ বন্দার সম্মুখে ভাস্বর হয়ে দেখা দেয়। কেননা, আল্লাহ্ পাক রব্বুল আলামীনের পবিত্র সত্ত্বার ছায়া তার অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে পড়ে এবং ধীরে ধীরে ঐ বন্দা আধ্যাত্মিক জগতের বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে উন্নতির দিকে ধাবিত হতে থাকে, আর সে অবস্থাকেই আল্লাহ্ পাক আলোচ্য বাক্যাংশে এরশাদ করেছেনঃ

ثُمَّ قَبَضْنٰهُ اِلَيْنَا قَبْضًا يَّسِيْرًا

অর্থাৎ এরপর ধীর ধীরে তাকে আমি নিজের দিকে টেনে এনেছি তথা তাকে আমার নৈকট্য দান করেছি, সে আমার সান্নিধ্য লাভে ধন্য হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্ পাকের ফরমানের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ নফল এবাদতের মাধ্যমে আমার বন্দা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে এমনকি, অবশেষে সে আমার প্রিয় হয়ে যায়। আর তখন আমি তাকে মহব্বত করতে থাকি, এমনকি আমি তার কর্ণ হয়ে যাই যা দ্বারা সে শ্রবণ করে, আমি তার চক্ষু হয়ে যাই যা দ্বারা সে দেখে। (আল-হাদীস)

সুফী সাধকদের বক্তব্য হলো, যার দু'দিন সমান যায় সে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি গতকাল থেকে আজ আধ্যাত্মিক জগতে আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য লাভে উন্নতি করতে পারেনি সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।[১]

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ لِبَاسًا

"আর তিনিই তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ, তোমাদের বিশ্রামের জন্যে দিয়েছেন নিদ্রা আর উত্থানের জন্যে তিনি দিয়েছেন দিন"।

সৃষ্টি জগতে মানব জাতির প্রতি আল্লাহ্ পাকের যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, তন্মধ্যে কয়েকটি নেয়ামতের উল্লেখ রয়েছে পূর্ববর্তী আয়াতে। আলোচ্য আয়াতেও আরো কয়েকটি নেয়ামতের বিবরণ স্থান পেয়েছে। এ পর্যায়ে রাত এবং দিনের উল্লেখ করা হয়েছে। দিনকে আল্লাহ্ পাক নির্দিষ্ট করেছেন কর্মের জন্যে। সারা দিনের কঠিন পরিশ্রমের কারণে মানুষের একটু বিশ্রাম চাই, এজন্যে আল্লাহ্ পাক রাত্রিকে বিশ্রাম গ্রহণের জন্যে দান করেছেন। এটি তাঁর বিশেষ দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُوَ الَّذِىْ

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা ৪৫৯-৬০

তিনিই সেই আল্লাহ পাক, যিনি তোমাদের জন্যে রাত্রিকে করেছেন আবরণ স্বরূপ। তোমাদের বিশ্রামের জন্যে দিয়েছেন নিদ্রা। আলোচ্য আয়াতে রাতকে 'লেবাছ' বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে।

'লেবাছ' তথা পোষাক মানব দেহকে আবৃত করে রাখে। তাই লেবাছ হয় মানব দেহের জন্যে একটি আবরণ। ঠিক এমনিভাবে রাতের আঁধার একটি বিরাট চাদরের ন্যায়, সারা পৃথিবীর উপর ছড়িয়ে পড়ে, ঐ আঁধারের আবরণে ঢেকে দেয়া হয় পৃথিবীর সব কিছু, ফলে কর্মক্লান্ত মানুষ বিশ্রাম করে, ঐ বিশ্রামের ফলশ্রুতি স্বরূপ তার দিনের যাবতীয় ক্লান্তি দূর হয়ে যায়। পরদিন সকালে সে নব উদ্যমে বেরিয়ে পড়ে, তার কর্মক্ষেত্রের উদ্দেশ্যে। রাতের এ বিশ্রামের কারণে তার দেহ-মনে এমন উদ্যম উৎসাহ আসে, মনে হয় যে সে কখনো ক্লান্ত হয়নি, এটি বন্দার প্রতি আল্লাহ পাকের কত বড় রহমত তা চিন্তা করে তাঁর মহান দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

মরণ-নিদ্রার পর হবে কেয়ামতের দিনের ভোর

আলোচ্য আয়াতে একথাই এরশাদ হয়েছেঃ হে আত্মবিস্মৃত মানব জাতি। দয়াবান আল্লাহ পাক দিনকে দান করেছেন তোমার কর্মের জন্যে, তুমি সারা দিন কর্মমুখর থেকে ক্লান্ত হও, আর এ ক্লান্তি দূর করার জন্যে তিনি দিয়েছেন রাত। রাতের আবরণ তোমাকে ঢেকে দিলে তুমি বিশ্রাম কর, আর এ বিশ্রামের মাধ্যমে আল্লাহ পাক তোমার ক্লান্তি দূর করে দেন। পরদিন ভোরে তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ, সবল, কর্মক্ষম হয়ে কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়। হে আত্মভোলা মানুষ! আরো লক্ষ্য কর মৃত্যুকে নিদ্রার ন্যায় মনে কর, মরণ-নিদ্রার পর মনে রেখো! কেয়ামতের দিনের ভোর হবে, সমগ্র বিশ্বমানব প্রতিদিনের ভোরের ন্যায় গাত্রোত্থান করবে, সমবেত হবে হাশরের ময়দানে, হাযির হবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে, প্রত্যহ সকালে এ সত্যকে উপলব্ধি করা এবং কেয়ামতের কঠিন দিনের জন্যে নেক আমলের সম্বল সংগ্রহ করা কল্যাণকামী মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

এর আরো একটি ব্যাখ্যা হতে পারে, পৃথিবীতে নবী রসূলগণ যখন ওহীর আলো প্রজ্জ্বলিত করেন, তখন কুফরী ও নাফরমানীর ঘন অন্ধকারে আচ্ছন্ন ও অচেতন মানুষের গাফলতের নিদ্রা ভেঙে যায়, সে জেগে ওঠে এবং নব-জীবনের সন্ধান পায়।

وَهُوَ الَّذِيْ اَرْسَلَ الرِّيٰحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَىْ رَحْمَتِهٖ

"আর তিনি স্বীয় রহমত নাযিল করার প্রাক্কালে সুসংবাদবাহী রূপে প্রেরণ করেন বায়ু, আর আমি পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি"।

বস্তুতঃ এটি আল্লাহ পাকের আরও একটি বিশেষ রহমত যে, তিনি মানব জাতির উপকারার্থে আসমান থেকে বারি বর্ষণ করেন। বারি বর্ষণের পূর্বাহ্নে এ সম্পর্কে সুসংবাদ দেয় বায়ু। আল্লাহ পাক মানব জাতিকে সুসংবাদ প্রদানের লক্ষ্যে বায়ু প্রেরণ করেন, এরপর আল্লাহ পাকের রহমতের বৃষ্টি নাযিল হয়, আল্লাহ পাকের করুণা-বৃষ্টি অবতীর্ণ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খরায় মৃত শুষ্ক ধরণীর ধড়ে প্রাণ সঞ্চার হয়। পৃথিবীতে সবুজের মেলা

দেখা দেয়। বৃক্ষ তরুলতা নানা প্রকার অলংকারে সুশোভিত হয়। ঐ নয়নাভিরাম দৃশ্য অনেকেরই মন জুড়িয়ে দেয়। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

(আর পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতার জন্যে আমি আসমান থেকে বারি বর্ষণ করি) ঐ পানি দ্বারা মানুষ পবিত্রতা ও পরিচ্ছন্নতা অর্জন করে এবং প্রাণী মাত্রই ঐ পানি পান করে পিপাসা নিবারণ করে পরিতৃপ্তি লাভ করে।

আলোচ্য আয়াতের طهور শব্দটির অর্থ হল সেই বস্তু, যা দ্বারা পবিত্রতা অর্জন করা হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পবিত্র মাটি দ্বারা মুসলমান পবিত্রতা অর্জন করে, যতক্ষণ পানি না পাওয়া যায়, যদি এমন অবস্থায় দশ বছরও অতিবাহিত হয়। (আহমদ, আবু দাউদ, তিরমিযী)

আর একথাও হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সারা পৃথিবীকে আমার জন্যে মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে, আর মাটিকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম বানানো হয়েছে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, طهور শব্দটির অর্থ হল পরিপূর্ণ পবিত্রতা অর্জন করা। অর্থাৎ নিজেও পাক থাকা আর অন্যকেও পবিত্র করা। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পানির মধ্যে উভয় গুণই বর্তমান, পানি নিজেও পবিত্র এবং অপবিত্র বস্তুকে পবিত্র করার যোগ্যতাও তার রয়েছে।

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا

"যা দ্বারা আমি মৃত ভূখন্ডকে সঞ্জীবিত করি, আর আমারই সৃষ্টি অনেক জীব-জন্তু এবং মানুষকে আমি তা পান করাই"।

অর্থাৎ আমি এজন্যে আসমান থেকে পানি বর্ষণ করি যেন মৃত, শুষ্ক জমীনকে এর দ্বারা পুনর্জীবন দান করি এবং মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর পিপাসা নিবারণ করি ও তাদেরকে পরিতৃপ্তি দান করি।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক মানুষের প্রতি তাঁর কয়েকটি নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন। সাধারণতঃ মানুষ যে সব বস্তু দ্বারা উপকৃত হয় যথা পানি, আলো-বাতাস প্রভৃতির আলোচনা এতে স্থান পেয়েছে কেননা, এসব এমন নেয়ামত যার প্রয়োজন সকলেরই হয়। যে সব বস্তুর মাধ্যমে মানুষের আর্থিক প্রয়োজনের আয়োজন হয় এতে সেগুলোর উল্লেখ রয়েছে।

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

"আর আমি তা তাদের মধ্যে নানাভাবে বিতরণ করি যাতে করে তারা স্মরণ করে, কিন্তু অধিকাংশ লোক শুধু অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে"।

অর্থাৎ আমি মানুষের মধ্যে তা নানাভাবে বিতরণ করি তথা বৃষ্টির পানি সর্বত্র সমানভাবে পড়ে না; বরং কোথাও বেশী কোথাও কম হয়। মানব জাতি হোক কিংবা

অন্য কোন প্রাণী, কেউই সমানভাবে পানি পায় না, কেউ কম কেউবা বেশী, কখনো এক এলাকায় বেশী বৃষ্টি হয়, অন্য এলাকায় কম হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। কোন বছর এমন যায় না যে, অন্য বছরের চেয়ে ঐ বছর বৃষ্টি বেশী হয়; বরং আল্লাহ্ পাক বৃষ্টিকে জমীনের উপর ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রাখেন।

অন্য একখানি হাদীসে রয়েছে, দিনে কী রাতে এমন কোন মুহূর্ত নেই যখন পৃথিবীতে কোথাও না কোথাও বৃষ্টি না হয়। এখানে এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রণিধানযোগ্য যে, বৃষ্টির চাবি কাঠি বৃষ্টির হাতে নয়; বরং স্বয়ং আল্লাহ্ পাকেরই হাতে।

তাই বারি বর্ষণ একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই ইচ্ছাধীন, তিনি যখন এবং যেখানে বৃষ্টিপাত করা পছন্দ করবেন, সেখানেই তা হবে কেননা, এটি করুণাময়ের করুণা ব্যতীত আর কিছুই নয়।

لِيَذَّكَّرُوا

অর্থাৎ মানুষ যেন এসব বিষয় চিন্তা করে এবং আল্লাহ্ পাকের নেয়ামত লাভ করে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে অথবা এর অর্থ হলো মানুষ যেন এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে যে, বৃষ্টি কখনো তাদের উপর বর্ষিত হয়, আর কখনো অন্যদের উপর।

فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا

কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই, অধিকাংশ লোক বড়ই অকৃতজ্ঞ, তারা সব কিছু দেখে শুনেও আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, যখন তাদের প্রতি বৃষ্টিপাত হয় তখন তারা আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে না, তারা বলে এ বৃষ্টি অমুক তারকার কারণে হয়েছে (নাউজুবিল্লাহ মিন জালেক)।

হযরত যায়েদ এবনে খালেদ জোহায়নী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুদায়বিয়া নামক স্থানে রাতে বৃষ্টি হলো, সকালে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নামায আদায় করলেন, এরপর উপস্থিত সাহাবাগণকে বললেন, তোমরা কি জান তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ্ পাক এবং তাঁর রসূলই জানেন। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ আমার বন্দাদের মধ্যে কিছু লোক আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর কিছু লোক কাফের হয়েছে। যারা বলেছে আমাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, তারা হলো ঈমানদার, আর যারা বলেছে, নক্ষত্রের কারণে বৃষ্টি হয়েছে তারা কাফেরে পরিণত হয়েছে।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭৭

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِيْ كُلِّ قَرْيَةٍ نَّذِيْرًا ﴿٥١﴾ فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَ
جَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا ﴿٥٢﴾ وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا
عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ ۚ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَّحِجْرًا
مَّحْجُوْرًا ﴿٥٣﴾ وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهٗ نَسَبًا وَّ
صِهْرًا ۭ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيْرًا ﴿٥٤﴾ وَيَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ
مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ ۭ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلٰى رَبِّهٖ
ظَهِيْرًا ﴿٥٥﴾ وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا ﴿٥٦﴾ قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِلَّا مَنْ شَآءَ اَنْ يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيْلًا ﴿٥٧﴾

তরজমা

(৫১) আর যদি আমি ইচ্ছা করতাম তবে প্রত্যেকটি জনপদেই একজন সতর্ককারী প্রেরণ করতে পারতাম।

(৫২) অতএব, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের কথা মেনে নেবেন না, আর পূর্ণ শক্তিতে তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করতে থাকুন।

(৫৩) এবং তিনিই তো দু'টি সাগরকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন। একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় অন্যটির পানি নোনা এবং বিস্বাদ। আল্লাহ্ পাক উভয়ের মধ্যে রেখে দিয়েছেন আড়াল এবং এক অনতিক্রম্য ব্যবধান।

(৫৪) এবং তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পানি থেকে। আর তাদের মধ্যে তিনি বংশগত ও বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করেছেন আর আপনার প্রতিপালক সর্বশক্তিমান।

(৫৫) আর তারা আল্লাহ্ পাকের পরিবর্তে এমন অক্ষমদের বন্দেগী করে যারা তাদের উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারে না। মূলতঃ কাফের স্বীয় পালনকর্তার বিরোধী।

(৫৬) (হে রসূল!) আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদ দাতা এবং সতর্ককারী রূপেই প্রেরণ করেছি।

(৫৭) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি এ তবলিগের জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, তবে যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে পারে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমত এবং বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ দেখেও অধিকাংশ লোক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা; বরং কাফের ও পাপীষ্ঠ থাকে। আর আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের উচ্চতম মর্যাদা ঘোষণা করা হয়েছে এবং কাফেরদের অন্যায় আচরণের কারণে মনক্ষুন্ন না হওয়ার এবং তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا

সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে সারা পৃথিবীর সকল জনপদে পথ প্রদর্শকরূপে একেক জন নবী প্রেরণ করতে পারতেন। কিন্তু হে নবী! আপনার নবুওয়্যতের পর আর কোন নবী প্রেরণের ইচ্ছাই আল্লাহ পাকের নেই। শুধু এ কারণেই আপনার নবুওয়্যতকে স্থান-কালের উর্দ্ধে রাখা হয়েছে, বিশেষ কোন দেশ বা জাতির মধ্যে আপনার নবুওয়্যতকে সীমিত রাখা হয়নি। আপনি শুধু একজন নবী ও রসূল নন; বরং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশেষ নবী। নবী রসূলগণের আপনিই দলপতি, সমগ্র বিশ্ববাসীর নিকটই আপনাকে প্রেরণ করা হয়েছে। আরব-অনারব, সাদা-কালো, ধনী-নির্ধন এক কথায় সমগ্র বিশ্ববাসীর হেদায়েতের দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে আপনার প্রতি। (হে রসূল!) আপনি শুধু বর্তমানের নবী নন; বরং সর্বকালের মানুষের জন্যে আপনার নবুওয়্যত সুপ্রতিষ্ঠিত থাকবে। কেয়ামত পর্যন্ত আর কোন নবীর আগমন হবে না, আপনার হেদায়েতই সর্বকালে গ্রহণযোগ্য হবে। আপনার আদর্শই সর্বত্র অনুসরণীয়, অনুকরণীয় হবে।

অতএব, (হে রসূল!) কাফেরদের অন্যায় আচরণের কারণে বিরক্ত না হয়ে আপনার প্রতি আরোপিত কর্তব্য পালন করতে থাকুন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تُطِعِ الْكٰفِرِيْنَ وَجَاهِدْهُمْ بِهٖ جِهَادًا كَبِيْرًا

অতএব, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদের কথা মানবেন না এবং পবিত্র কোরআনে যে সব দলিল প্রমাণ বর্ণিত হয়েছে, তার আলোকে হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করতে থাকুন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখুন। আর আল্লাহ পাক আপনাকে যে অশেষ নেয়ামত দান করেছেন, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। আমি যেহেতু সারা বিশ্বের মানুষের জন্যে আপনাকে নবী রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছি, তাই আপনি মানুষকে সত্যের দিকে আহ্বান করুন, আল্লাহ পাকের তওফিক এবং সাহায্য দ্বারা অথবা কোরআনে করীমের মাধ্যমে আপনি তাদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখুন। জেহাদ রসনা দ্বারাও হতে পারে, অস্ত্র দ্বারাও হতে পারে। অতএব, কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ অব্যাহত রাখুন, আপনাকে সাহায্য করা হবে। আর এ জেহাদ হতে হবে সর্ব প্রকারে-অন্ত র দ্বারা, রসনা দ্বারা এবং অস্ত্রের মাধ্যমে। যেহেতু কাফেররা সত্যের মোকাবেলায় সচেষ্ট রয়েছে, তাই (হে রসূল!) আপনি সত্য প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠায় সর্বাত্মক চেষ্টা করবেন।

وَهُوَ الَّذِيْ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هٰذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَّهٰذَا مِلْحٌ اُجَاجٌ

"এবং তিনিই তো দু'টি সাগরকে মিলিতভাবে প্রবাহিত করেছেন, একটির পানি মিষ্ট, সুপেয় অন্যটির পানি নোনা এবং বিস্বাদ"।

এ আয়াতেও আল্লাহ্ পাক তাঁর কুদরতের এক বিশেষ নমুনার উল্লেখ করেছেন। দু'টি সমুদ্রকে আল্লাহ্ পাক পাশাপাশি কাছাকাছি রেখেছেন, দু'টি সম্মিলিতভাবে প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ দু'টি বিপরীত ধর্মী। একটির পানি সুমিষ্ট এবং সুপেয় আর অন্যটির পানি নোনা এবং বিস্বাদ। বিরুদ্ধ প্রকৃতির এ দু'টি সাগর বা নদী আবহমান কাল ধরে একই সঙ্গে প্রবাহিত হচ্ছে, অথচ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের কুদরতে একে অন্যের সঙ্গে মিশতে পারে না, আল্লাহ্ পাক যেন তাদের উভয়ের মাঝে এক অদৃশ্য প্রাচীর তৈরী করে দিয়েছেন। চট্টগ্রাম থেকে আরাকান পর্যন্ত প্রবাহিত দু'টি নদী এর জীবন্ত সাক্ষী, দু'টিই পাশাপাশি কাছাকাছি হয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। একটির পানি কালো আরেকটির পানি সাদা। যে নদীর পানি কালো তাতে ঝড় ওঠে, উত্তাল তরঙ্গ ছুটতে দেখা যায়, আর যে নদীর পানি সাদা তা একান্ত শান্ত। যে নদীর পানি কালো তা নোনা, আর যে নদীর পানি সাদা তা সুমিষ্ট এবং সুপেয়। এটি আল্লাহ্ পাকের কুদরতের কত বড় নিদর্শন তা সহজেই অনুমেয়। আর একথাও সর্বজন-বিদিত সমুদ্রের জোয়ার-ভাটার সময় যখন সমুদ্রের নোনাপানি ঐ নদীতে প্রবেশ করে, তখন নদীর মিঠা পানির সঙ্গে সমুদ্রের নোনাপানি মিশতে পারে না, বরং তার নিচে পড়ে যায়। আশ্চর্যজনক বিষয় হলো এই, ভাটার সময় সমুদ্রের নোনাপানি নিচে নেমে যায় কিন্তু নদীর পানি ইতিপূর্বে যেমন ছিল পরেও তেমনি থাকে। এখানেই আল্লাহ্ পাকের কুদরতের জীবন্ত নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। এই যে নোনা পানি এবং মিঠা পানি এক হয়না এমনিভাবে সাদা এবং কালো পানিও একটি আরেকটির সঙ্গে গা ঘেষে থাকে অথচ একত্রিত হয় না। প্রত্যেকটির জন্যে আল্লাহ্ পাক সীমা নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, ঐ নির্দিষ্ট সীমা তারা কখনও লঙ্ঘন করে না। নোনাপানি আর মিষ্ট পানি স্ব-স্ব সীমায় থেকেই প্রবাহিত হয়, এখানে দেখা যায় আল্লাহ্ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের বিশেষ নমুনা।

আল্লামা বয়যাভী (রহ.) লিখেছেন, অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, বাইরের কোন জিনিষ সমুদ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে উভয় পানির মাঝে আড়াল হয়ে আছে।[১]

وَهُوَ الَّذِيْ خَلَقَ مِنَ الْمَآءِ بَشَرًا

"এবং তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষকে পানি থেকে এবং তাদের মধ্যে তিনি বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন"। এটিও আল্লাহ্ পাকের একটি কুদরত এবং মানুষের প্রতি তাঁর অনন্ত অসীম করুণার দান যে, তিনি মানুষকে পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন। এক ফোটা নগণ্য পানি তথা শুক্র থেকে বুদ্ধিমান মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে বহু গুণে গুণান্বিত করা আল্লাহ্ পাকেরই মহান দান। আর তিনিই তাদের মধ্যে বংশগত ও বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। বংশীয় এবং বৈবাহিক সূত্রে মানুষের পরস্পরের

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭৮

মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন স্থাপন করে দিয়েছেন এবং পরস্পরের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত বড় শক্তিশালী, তিনি যা ইচ্ছা তা করেন, একই উপাদান থেকে কখনও পুরুষ, কখনও নারী তিনিই সৃষ্টি করেন, সর্বত্র তাঁর ইচ্ছাই কার্যকর হয়। হতভাগা মানুষ তার প্রতি আল্লাহ পাকের দানের কথা ভুলে যায়। ভুলে যায় তার প্রকৃত ইতিহাস। সে আত্মবিস্মৃত হয়, ভুলে যায় তার আত্মপরিচয়, যদি সে তার উচ্চ মর্যাদার কথা ভুলে না যেত, তবে তার নিজেরই হাতে গড়া মূর্তির সম্মুখে সে মাথা নত করতো না। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ

"আর তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন অক্ষমদের বন্দেগী করে, যারা কারো উপকারও করতে পারেনা, অপকারও করতে পারেনা"। কত বিস্ময়কর ব্যাপার, মানুষ এমন সব বস্তুকে নিজেদের উপাস্য হিসেবে গ্রহণ করে, যদি তাদের উপাসনা করা হয় তবে তারা পূজারীদের কোন উপকার করতে পারে না, আর যদি উপাসনা না করা হয় তবুও তারা কোন ক্ষতি করতে সক্ষম হয় না।

সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের পরিবর্তে এমন অক্ষম, অপদার্থ বস্তুকে উপাস্য বানানোর মত নির্বুদ্ধিতা আর কি হতে পারে! আর যারা নির্বোধ, তারাই শয়তানের দলে ভিড়ে যায়।

وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا

মূলতঃ কাফের স্বীয় পালনকর্তার বিরোধী হয় এবং পাপাচারের মাধ্যমে শয়তানের সাহায্যকারী হয়। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতে ظهير শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন হীন, ঘৃণ্য, নীচ এবং অপমানিত অর্থাৎ যারা কাফের, মুশরেক, তারা পাপাচারের মাধ্যমে নিজেদেরকে নীচ এবং অপমানিত করেছে এবং নিজেদেরকে আল্লাহর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের শত্রু বানিয়েছে। অথচ এর কোন ন্যায্য কারণ নেই কেননা, তিনি হলেন তৌহিদ তথা মানবতার উৎকর্ষ সাধনের আহবায়ক, তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا

"আর (হে রসূল!) আমি তো আপনাকে শুধু সুসংবাদ দাতা ও ভয় প্রদর্শক রূপেই প্রেরণ করেছি"।

অর্থাৎ যারা কল্যাণবাদী, বাস্তববাদী, যারা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনে এবং তাঁর বিধি-নিষেধ পালন করে, তাদের জন্যে (হে রসূল!) আপনাকে সুসংবাদ দাতা রূপে প্রেরণ করেছি।

পক্ষান্তরে, যারা কুফর ও নাফরমানী করবে, আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হবে, তাদের জন্যে ভয়-প্রদর্শক রূপে প্রেরণ করেছি। এতে রয়েছে সমগ্র মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। অতএব, এমন ব্যক্তির সঙ্গে শত্রুতা পোষণ করার কোন যুক্তিই নেই; বরং এমন ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি পেশ করাই বুদ্ধিমান মাত্রের কর্তব্য।[১]

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

আল্লাহ পাক এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এই বলে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) যারা মোমেন, যারা আল্লাহ পাকের অনুগত, তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের সুসংবাদ দিন, তাদের জীবন-সাধনার সাফল্যের খোশখবরী দিন, আর যারা অবাধ্য, নাফরমান তাদের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করুন, এটিই আপনার কর্তব্য। এ কর্তব্য আপনি পালন করতে থাকুন, কে আপনার প্রতি ঈমান আনল আর কে আপনার সাথে শত্রুতা করল, এ সম্পর্কে আপনার দুশ্চিন্তার কোন প্রয়োজন নেই। তাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান করাই আপনার কাজ, এ কাজ আপনি করতে থাকুন, আপনি তাদের নিকট আপনার এ কাজের জন্যে কোন প্রকার পারিশ্রমিক কামনা করেন না, তাই তারা আপনার প্রতি ঈমান না আনলে আপনার কোন ক্ষতির আশঙ্কা নেই। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ مَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমি এ তবলিগের জন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না, তবে যার ইচ্ছা সে তার প্রতিপালকের পথ অবলম্বন করতে পারে"।

অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে সত্য পথ অবলম্বনের উপদেশ দিচ্ছি, তোমাদের পরিণাম সম্পর্কে তোমাদেরকে সতর্ক করছি, তোমাদেরকে সরল-সঠিক পথ-প্রদর্শন করছি, আর এজন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমি শুধু এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই এ কাজ করছি তথা আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই তাঁর দিকে তোমাদেরকে আহ্বান করছি। আমার কামনা শুধু এতটুকু যে তোমাদের যার ইচ্ছা সৎ পথ অবলম্বন কর, আল্লাহ পাকের নৈকট্য ও সান্নিধ্যের পথ গ্রহণ কর, আর এতেই রয়েছে তোমাদের কল্যাণ।

আমি তোমাদের নিকট কোন প্রকার বিনিময় চাইনা। তোমরা হেদায়েত গ্রহণ করলেই আমি সন্তুষ্ট। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, مَنْ شَاءَ শব্দ দ্বারা একথা জানা যায় যে, কেউ যদি আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভের উদ্দেশ্যে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করতে চায়, সে তা করতে পারে, তবে আমি নিজের জন্যে কিছুই চাইনা। আল্লাহর রাহে কেউ ব্যয় করুক এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির অন্বেষণ করুক তাতেও বাধা দেইনা।

পরবর্তীতে যাকাত এবং সদকার বিধান যখন প্রবর্তন করা হয়, তখন আল্লাহর রসূলের দুশমনদের মনে এ সন্দেহ হতে পারতো যে, হয়তো এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে অর্থ-সম্পদ আহরণের একটি ব্যবস্থা করা হলো, কিন্তু

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৬

আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর বংশধরদের জন্যে যাকাত সদকা হারাম ঘোষণা করেছেন, ফলে সন্দেহের উদ্রেককারীদের সন্দেহ করার কোন সুযোগই রইল না।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এর অর্থ হলো– (১) হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সত্য ও ন্যায়ের জন্যে মানুষকে যে আহ্বান করছেন, তার বিনিময়ে তিনি মানুষের কাছে কিছুই চান না, তবে তারা যদি আল্লাহর রাহে জেহাদের ব্যাপারে অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির অন্বেষণ করে, তবে তারা এভাবে আল্লাহর রহমত লাভ করবে এবং সওয়াব পাবে। (২) অথবা এর অর্থ হলো, আমি নিজের জন্যে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা, তবে তোমাদের নিকট আমার কাম্য হলো, তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের পথ অবলম্বন কর।[২]

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ ۚ وَكَفَىٰ بِهِ
بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا ﴿٥٨﴾ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا
بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ ۛ الرَّحْمَٰنُ فَاسْأَلْ
بِهِ خَبِيرًا ﴿٥٩﴾ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَٰنِ قَالُوا وَمَا
الرَّحْمَٰنُ أَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ نُفُورًا ﴿٦٠﴾ تَبَارَكَ الَّذِي
جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ﴿٦١﴾
وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ
أَوْ أَرَادَ شُكُورًا ﴿٦٢﴾

তরজমা

(৫৮) (হে রসূল!) আপনি ভরসা করুন একমাত্র সেই চিরঞ্জীবের উপর, কখনও যাঁর মৃত্যু নেই। আর তাঁর প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করুন। তিনি তাঁর বন্দাদের পাপাচার সম্পর্কে যথেষ্ট অবগত।

(৫৯) তিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান জমিন এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুকে ছয় দিনে, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি বড়ই দয়াবান, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৮০
[২]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১০২

(৬০) তাদেরকে যখন বলা হয় তোমরা সেজদা রত হও রহমানের প্রতি, তখন তারা বলে, রহমান আবার কে? তুমি যাকে বলবে আমরা কি তাকেই সেজদা করতে যাব? অধিকন্তু এতে তাদের বিমুখতাই বেড়ে যায়।

(৬১) অপূর্ব মহিমা তাঁর যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তর এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য এবং রেখেছেন জ্যোতির্ময় চন্দ্র।

(৬২) আর যারা উপদেশ গ্রহণ করতে এবং শোকর গুজার হতে চায় তাদের জন্যে তিনিই সৃষ্টি করছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) আপনি কাফেরদেরকে জানিয়ে দিন, আমি যে তোমাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি, এজন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা, আমি শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে তোমাদের কল্যাণের পথ দেখাচ্ছি। আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, (হে রসূল!) যদি এতদসত্ত্বেও কাফেররা আপনার প্রতি শত্রুতা পোষণ করে এবং কাফেরদের দুর্ব্যবহার অব্যাহত থাকে তবে আপনি তাদের এ অন্যায় আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।

ভরসা শুধু এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি

যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি চিরঞ্জীব শুধু তাঁর প্রতিই আপনি ভরসা করুন। যাঁর লয় নেই, ক্ষয় নেই, বিনাশ নেই তিনিই একমাত্র ভরসার পাত্র, অতএব (হে রসূল!) আপনি শুধু তাঁর প্রতিই ভরসা রাখুন। আর কাফেরদের শত্রুতার কারণে আপনি ব্যাকুল হবেন না, বরং নিশ্চিন্ত মনে আল্লাহ পাকের হামদের তসবীহ পাঠ করতে থাকুন, কেননা এর দ্বারাই মানব মনে শান্তি আসে, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ

"সতর্ক হও, আল্লাহ পাকের জিকরের মাধ্যমেই মানব মন শান্তি লাভ করে"।

অতএব, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের দ্বীনের তবলিগ করতে থাকুন এবং তাঁর পবিত্র নামের তসবিহ পাঠ করতে থাকুন এবং আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর আদায় করতে থাকুন, কাফেরদের অন্যায় আচরণের প্রতি ভ্রুক্ষেপও করবেন না, কেননা তাদের পাপাচার সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত, তাদের কোন অন্যায় অনাচারই তাঁর নিকট গোপন নেই। এ সম্পর্কে যথা সময়ে তিনি তাদের শাস্তি বিধান করবেন।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন,

وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا

এ আয়াতাংশে কাফেরদের উদ্দেশ্যে রয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী, কাফেরদের অন্যায় অনাচার সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল এবং তাদের শাস্তি বিধানে তিনি

সম্পূর্ণ সক্ষম। যদি এ কাফেররা আল্লাহর রসূলের বিরোধিতায় লিপ্ত থাকে তবে তাদের শাস্তি অনিবার্য।[১]

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন যে, এবনে আবিদ দুনিয়া এবং বায়হাকী ওতবা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেনঃ তৌরাতে লিপিবদ্ধ রয়েছে যে তোমরা বনী আদমের উপর ভরসা করোনা, তবে সেই মহান সত্ত্বার প্রতি ভরসা কর, যিনি চিরঞ্জীব, যিনি চির বিরাজমান।

এ পর্যায়ে ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে তাঁর প্রতি সর্বাবস্থায় পূর্ণ ভরসা করার নির্দেশ প্রদান করে নিজের যে গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন তা হলো এই,

(এক) الْحَيِّ الَّذِيْ لَا يَمُوْتُ অর্থাৎ তিনি এমন এক মহান সত্ত্বা, যাঁর লয় নেই, যিনি চিরঞ্জীব।

(দুই) وَكَفٰى بِهٖ بِذُنُوْبِ عِبَادِهٖ خَبِيْرًا অর্থাৎ তিনি সব বিষয়ে সম্পূর্ণ অবগত। তাই বন্দাদের পাপাচার সম্পর্কেও তিনি যথেষ্ট অবহিত।

(তিন) তিনি সর্বশক্তিমান। অতএব, তাঁর প্রতি পূর্ণ ভরসা রাখাই হলো উত্তম পন্থা। কেননা, পৃথিবীর সমস্ত নেয়ামতের একমাত্র সত্ত্বাধিকারী স্বয়ং আল্লাহ পাক, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে তা দান করে থাকেন এবং তিনিই মানুষকে যে কোন ক্ষতি থেকে রক্ষা করেন। তাই যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করে, তারাই জীবন-সাধনায় সফলকাম হয়।

الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا...

"তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান জমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সমস্ত কিছুকে ছয় দিনে, এরপর তিনি আরশে সমাসীন হয়েছেন"।

অর্থাৎ যিনি মাত্র ছয় দিনে এ নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন, যিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও পালনকর্তা, যাঁর ক্ষমতা সর্বত্র সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি সর্বত্র বিরাজমান তাঁর প্রতিই মানুষের ভরসা করা উচিত, এরপর তিনি মহান আরশের উপর সমাসীন হয়েছেন, যা তাঁর শান মোতাবেক, আর এ আরশ সমগ্র সৃষ্টি জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি যা আসমান সমূহ থেকে উচ্চতর অবস্থানে রয়েছে, যা সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে পরিবেষ্টন করে রেখেছে। 'আরশ' শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো শাহী সিংহাসন আর এ মহান আরশ থেকেই ফেরেশতাদের উপর আল্লাহ পাকের বিধি-নিষেধ জারী করা হয়।[২]

اَلرَّحْمٰنُ فَسْـَٔلْ بِهٖ خَبِيْرًا

"তিনি বড়ই দয়াবান, তাঁর সম্পর্কে যে অবগত, তাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ"।

আল্লাহ পাক অত্যন্ত বড় দয়াবান, অতীব করুণাময়, যারা তাঁর অনন্ত-অসীম করুণা সম্পর্কে অবগত তাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। কাফের-মুশরেক, বে-দ্বীনরা তাঁর

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১০৩

২। এ সম্পর্কে বিস্তাতির জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১১, পৃষ্ঠা-১৩৮-৪২

সম্পর্কে কিছুই জানেনা। যারা আল্লাহ-প্রেমিক, যারা করুণাময়ের করুণা-ধারা লাভ করেছে তাদেরকে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। যারা তাঁর সম্পর্কে অবগত তথা জীব্রাঈল (আঃ) অথবা সে সব ওলামায়ে কেরাম যারা অন্যান্য আসমানী কিতাব পাঠ করেছে, তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর। এ আয়াতের ন্যায় আরও একখানি আয়াত রয়েছেঃ

فَسْئَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ

আল্লাহ-প্রেমিকদের নিদর্শন

(যদি তোমরা না জান তবে যারা জানে তাদেরকে জিজ্ঞাসা কর) অতএব, আলোচ্য আয়াতের মমার্থ হলো যারা আল্লাহ পাকের সাথে মহব্বত রাখে, যারা আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকে, যারা আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হয়েছে, যাদের অন্তর আল্লাহ পাকের নূরে আলোকিত হয়েছে তাদেরকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। আল্লাহর নূর দ্বারা যাদের অন্তর আলোকিত তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে (১) তাদের মন দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয় না। (২) আখেরাতের সাফল্য অর্জনই তাদের চিন্তা-চেতনা এবং চেষ্টার একমাত্র লক্ষ্য থাকে। (৩) মৃত্যুর পূর্বেই মৃত্যুর জন্যে তারা প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ তিনটি নিদর্শনই আল্লাহ-প্রেমিকদের মধ্যে পাওয়া যায়। আর তাদেরকেই আল্লাহ পাক সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার নির্দেশ রয়েছে আলোচ্য আয়াতে। এজন্যেই মওলানা রূমী (রঃ) বলেছেনঃ

اولیاء راکار دنیا جبر ہست * کافراں راکار عقبی جبر ہست

"আল্লাহর ওলীদের পক্ষে দুনিয়ার কাজ অত্যন্ত কঠিন। তারা নিতান্ত বাধ্য হয়েই এ কাজ করেন। আর কাফেরদের পক্ষে আখেরাতের কাজ অত্যন্ত কঠিন এমনকি, অসম্ভব"।

এজন্যে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন,

فَمَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ اَنْ يَّهْدِيَهٗ يَشْرَحْ صَدْرَهٗ لِلْاِسْلَامِ

(আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েত করার ইচ্ছা করেন ইসলামকে বুঝবার জন্যে, তার মনের কপাট উম্মুক্ত করে দেন) তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় মনের কপাট উম্মুক্ত করার তাৎপর্য কি? তিনি এরশাদ করেনঃ যখন কারো অন্তরে আল্লাহ পাকের নূর প্রবেশ করে তখন ইসলামকে বুঝবার জন্যে তার মনের কপাট উম্মুক্ত করা হয়।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক তার মনকে ইসলামকে বুঝবার জন্যে তৈরী করে দেন। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, যাদের মনের এ অবস্থা হয় তারা এ ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি আকৃষ্ট হয় না এবং চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمُ

(আর যখন তাদেরকে বলা হয় রহমানকে সেজদা কর, তখন কাফেররা চরম ধৃষ্টতা প্রকাশ করে বলে, রহমান আবার কে?) "রহমান"-কে আমরা জানিনা। তুমি কি মনে করেছ তুমি যার কথা বলবে, আমরা তাকেই সেজদা করবো? দয়াময় আল্লাহ পাকের

মোবারক নাম শ্রবণ মাত্র তাঁর সম্মুখে মাথা নত করাই হলো তাদের কর্তব্য, সে কর্তব্য ভুলে গিয়ে তারা এমন আপত্তিকর কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায়। এভাবে তাদের বিরোধিতা বেড়ে যায়, তারা তাদের ধ্বংসের পথ বেছে নেয়।

تَبٰرَكَ الَّذِىْ جَعَلَ فِى السَّمَآءِ بُرُوْجًا

"অপূর্ব মহিমা তাঁর, যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বিভিন্ন স্তর এবং তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য এবং রেখেছেন জ্যোতির্ময় চন্দ্র"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের অনেক নিদর্শনের উল্লেখ ছিল। এ আয়াত থেকে পুনরায় কুদরতে এলাহীর অতীব বিস্ময়কর কয়েকটি নিদর্শনের উল্লেখ করা হয়েছে। তাই এরশাদ হয়েছে,

تَبٰرَكَ الَّذِىْ

অর্থাৎ অপূর্ব মহিমা সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আসমানে সৃষ্টি করেছেন বুরুজ।

بروج

এ শব্দটির ব্যাখ্যায় তফসীরকারগণ একাধিক মত পোষণ করেছেন। বিখ্যাত তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) এবং হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো বড় বড় নক্ষত্র। بُرُوْج শব্দটির প্রকৃত অর্থ হলো প্রকাশ পাওয়া। যেহেতু বড় বড় তারকারাজী প্রকাশ্য, এজন্যে এ তারকাগুলোকে بُرُوْج বলা হয়।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, بُرُوْج বলা হয় আসমানী দুর্গকে, যেখানে ফেরেশতাগণ প্রহরারত রয়েছে। এ মত পোষণ করেন হযরত আলী (রাঃ), হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মোহাম্মদ এবনে কা'ব (রঃ), ইবরাহীম নখয়ী (রঃ) সোলায়মান এবনে নাহরাহ (রঃ) এবং আ'মাশ (রঃ)।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, বুরুজ বলা হয় সূর্যের পরিক্রমাণ পথের বারটি মঞ্জিলকে। এ বারটি মঞ্জিল হলো– (১) হামল, (২) সওর, (৩) জওযা, (৪) সরতান, (৫) আসাদ, যাকে লায়েসও বলা হয়, (৬) সুম্বলা, (৭) মিযান, (৮) আকরাব, (৯) কাওস, (১০) জাদ্দী, (১১) দুলব, (১২) এবং হুত। আসমানে বিভিন্ন নক্ষত্র একত্রিত হলে বিভিন্ন আকৃতির সৃষ্টি হয়। কোথাও বাঘের আকৃতি হয়, আর কোথাও পাল্লার, কোথাও গরুর, আর কোথাও বিচ্ছু ও মাছের। সূর্য যখন এক মঞ্জিল থেকে আরেক মঞ্জিলে যায়, তখন মৌসুমের পরিবর্তন হয়। আর এটি নিঃসন্দেহে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতেরই অপূর্ব নিদর্শন। আল্লাহ পাক জমিন থেকে আসমান পর্যন্ত তাঁর বন্দাদের জন্যে এক বিশাল বিস্তৃত বাড়ী নির্মাণ করেছেন। যাকে আলোকিত করার জন্যে চন্দ্র সূর্য তারকারাজীর ব্যবস্থা করেছেন এবং সমগ্র সৃষ্টি জগতের পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অপূর্ব নমুনা এবং তিনি এতে রেখেছেন আশরাফুল মাখলুকাত মানব জাতির জন্যে অনেক প্রয়োজনের আয়োজন,

এক কথায় সার্বিক কল্যাণ। অথচ হতভাগা কাফেররা করুণাময় আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সেজদা করতে অস্বীকৃতি জানায়।[১]

"বুরুজ" শব্দের ব্যাখ্যায় আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) আরও কয়েকজন তফসীরকারের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি লিখেছেনঃ আবদে এবনে হুমায়েদ এবং এবনে জরীর ইয়াহয়া এবনে রাফে থেকে বর্ণনা করেছেন, বুরুজ হলো আসমানের মহল সমূহ। কাতাদা (রহঃ) বর্ণনা করেছেন, বুরুজ হলো আসমানের মহল সমূহ যাতে প্রহরী রয়েছে। এবনে জরীর কাতাদা (রঃ)-এর আরেকটি কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বুরুজ হলো নক্ষত্রপুঞ্জ। আর একরামা (রহঃ) বলেছেন, আসমানের ফেরেশতাগণ জমিনের মসজিদ সমূহের নূরকে এভাবে দেখেন যেভাবে জমিনবাসী আসমানের তারকরাজীকে দেখে।[২]

ইমাম রাজি (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াত সমূহে যে সব বিস্ময়কর সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে যদি কাফেররা এসব বিষয়ে চিন্তা করতো তবে এ সত্য উপলব্ধি করতো যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের উদ্দেশ্যে সেজদা করা মানুষের অবশ্য কর্তব্য, তিনি বুরুজ শব্দের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এটি হলো বিভিন্ন তারকারাজির নির্দিষ্ট ঠিকানা।

ইমাম রাজি (রঃ) হযরত এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বুরুজ হলো বড় বড় নক্ষত্র।[৩]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত হাসান বসরী (রহঃ), কাতাদা (রহঃ), মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, বুরুজ হলো বড় বড় নক্ষত্র।

আতীয়্যা ওফী (রহঃ) বলেছেন, বুরুজ অর্থ হলো আসমানের সুউচ্চ মহল সমূহ যেখানে প্রহরী রয়েছে।[৪]

وَّ جَعَلَ فِيْهَا سِرٰجًا وَّ قَمَرًا مُّنِيْرًا

"তাতে স্থাপন করেছেন সূর্য এবং জ্যোর্তিময় চন্দ্র"।

আলোচ্য আয়াতের 'সিরাজ' শব্দটি সমগ্র কোরআনের তিনটি স্থানে দু' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। (এক) সিরাজ অর্থ প্রদীপ। (দুই) এ শব্দটি সূর্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন সূরা নূহের একখানি আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا

(আর আল্লাহ্ পাক সূর্যকে প্রদীপ রূপে তৈরী করেছেন) আর সূরা নাবায় ঘোষণা করা হয়েছে–

وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَّهَّاجًا

"আর আমি প্রদীপকে অত্যন্ত দীপ্তিময় ও আলোকময় করেছি"।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯৮
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮২
[২]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮২
[৩]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১০৬
[৪]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৮২

একথা সর্বজনবিদিত যে, চন্দ্র সূর্য সৃষ্টির মধ্যে আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম হেকমত রয়েছে।[১]

যাহোক, এখানে যেন এরশাদ হয়েছে, হে মানব জাতি! আসমানের দিকে দৃষ্টিপাত কর যা মানুষের জন্যে এক বিস্ময়কর দৃশ্য হিসেবে বিদ্যমান রয়েছে। এই সূর্য এবং চন্দ্র শুধু যে নিকট এবং দূরে আলো বিচ্ছুরিত করছে তাই নয়; বরং সমগ্র বিশ্বের আলোর একমাত্র উৎস এবং বাহন, এ বিস্ময়কর এবং বিরাটকায় সৃষ্টি কিভাবে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে সেজদারত রয়েছে! কিভাবে তারা আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করছে তা মানুষ মাত্রেরই দেখা উচিত এবং শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

মূলতঃ বিশ্ব-সৃষ্টিতে কোন কিছুই এমন নেই যা আল্লাহ্ পাকের অনুগত নয়, কোরআনে করীমের ভাষায়ঃ

اَلشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ۝ وَّالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدٰنِ

"আল্লাহ্ পাকের আদেশক্রমে সূর্য এবং চন্দ্র একটি নির্দিষ্ট হিসেব অনুযায়ী ঘুরছে এবং নক্ষত্রপুঞ্জ, বৃক্ষরাজি (এক কথায় সকল সৃষ্টি) তাঁর সম্মুখে সেজদায় রত রয়েছে"।

وَهُوَ الَّذِىْ جَعَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً

আর তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত এবং দিনকে পরস্পরের অনুগামী রূপে। এসব কিছু অনুধাবনের বিষয় সে সব লোকদের জন্যে যারা উপদেশ গ্রহণ করতে ইচ্ছুক এবং যারা শোকর গুজারী করতে চায়।

রাতের পর আসে দিন। দিনের পর আসে রাত। এভাবেই তো মানুষের জীবন হয় অতিবাহিত। আল্লাহ্ পাক একের পেছনে অন্যের গমনাগমনের যে ব্যবস্থা করেছেন এবং কখনো রাত ছোট হয় এবং কখনো দিন, এসব কিছুর মধ্যে রয়েছে আল্লাহ্ পাকের কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন। মানুষ যাতে করে আল্লাহর এসব কুদরত হেকমত দেখে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাঁর শোকর গুজার হয়। যারা এ সত্য উপলব্ধি করে এবং যারা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের জন্যে রয়েছে এতে বিশেষ উপদেশ। এতদ্ব্যতীত, রাত এবং দিন একে অন্যের পরিপূরক হিসেবেও কার্যকর হয়। দিনের অসমাপ্ত কাজ রাতে এবং রাতের অসমাপ্ত কাজ দিনে করা হয়। হাদীস শরীফে রয়েছে, আল্লাহ্ পাক রাত্রিকালে তাঁর দস্তে মোবারক সম্প্রসারণ করেন যাতে করে দিনের গুনাহগার তওবা করে আর দিনেও দস্তে মোবারক সম্প্রসারণ করেন যাতে করে রাতের গুনাহগার তওবা করে।

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-১৩১-৪৩

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ
هَوْنًا وَّاِذَا خَاطَبَهُمُ الْجٰهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا ﴿٦٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ
لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّقِيَامًا ﴿٦٤﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا
عَذَابَ جَهَنَّمَ ۖ اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا ﴿٦٥﴾ اِنَّهَا سَآءَتْ
مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٦٦﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ
يَقْتُرُوْا وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ
مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ وَلَا يَقْتُلُوْنَ النَّفْسَ الَّتِيْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُوْنَ ۚ وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا ﴿٦٨﴾

তরজমা

(৬৩) আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত বন্দা তারাই, যারা পৃথিবীতে ধীর পদে (বিনম্রভাবে) চলে এবং যখন তাদেরকে অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম তোমায়।

(৬৪) এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে সেজদারত হয়ে এবং দন্ডায়মান অবস্থায়।

(৬৫) আর যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে দোযখের আযাবকে দূরে সরিয়ে রাখ। নিশ্চয় এর শাস্তি নিশ্চিত ধ্বংস।

(৬৬) নিশ্চয় তা আশ্রয়-স্থল এবং বসতি হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য।

(৬৭) আর তারা যখন ব্যয় করে, তখন তারা অযথা ব্যয় করেনা এবং কার্পণ্যও করেনা, বরং তারা উভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় থাকে।

(৬৮) আর যারা আল্লাহ্ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না (শেরক করেনা) এবং আল্লাহ্ পাক যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন এমন কোন লোককে যথার্থ কারণ ব্যতীত যারা হত্যা করে না এবং যারা ব্যভিচার করে না। যে এসব কাজ করে সে শাস্তি ভোগ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে কাফের মুশরেকদের আলোচনা রয়েছে, যারা করুণাময় আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম করুণা অহরহ ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ এবং অবাধ্য থাকে। আলোচ্য আয়াত থেকে আল্লাহ্ পাকের প্রকৃত বন্দাগণের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী

বর্ণিত হয়েছে, পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে যেভাবে অবাধ্য নাফরমানদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, ঠিক এমনিভাবে করুণাময় আল্লাহ পাকের তাবেদার এবং পেয়ারা বন্দাগণের বৈশিষ্ট্যের পাশাপাশি তাদের শুভ পরিণতির কথাও ঘোষণা করা হয়েছে, মানুষ যেন উল্লিখিত গুণাবলী অর্জন করে আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং প্রিয় বন্দা হতে পারে তার জন্যে রয়েছে এ আয়াত সমূহে উদাত্ত আহ্বান এবং মানুষ যেন দয়াময় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম দয়া মায়া ভোগ করে তাঁর প্রতি শোকর গুজার হয় এ শিক্ষাও রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। আর যারা আল্লাহ পাকের শোকর গুজার বন্দা, তাদের অনুসরণ করার জন্যেও এক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে।

হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী (রঃ) এ পর্যায়ে লিখেছেন, সমগ্র কোরআনে আল্লাহ পাক কোথাও হেদায়েত প্রাপ্ত, সরল সঠিক পথের অনুসারীদের উল্লেখ করেছেন, আবার কোথাও পথভ্রষ্ট এবং কোপগ্রস্ত লোকদের অবস্থাও বর্ণনা করেছেন। নেককার লোকদের উদ্দেশ্যে জান্নাতের সুসংবাদ দিয়েছেন এবং কাফের মুশরেকদের উদ্দেশ্যে দোযখের শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন। যারা সরল সঠিক পথের অনুসারী হয়েছেন, তাদের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলীর উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। যেমন, (১) বিনয় (২) এবাদতে তাদের মনের একাগ্রতা (৩) আল্লাহর ভয় (৪) পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণ (৫) মধ্যপন্থা অবলম্বন (৬) তৌহিদে পরিপূর্ণ বিশ্বাস (৭) এখলাস (৮) ফেতনা-ফাসাদ পরিহার করা (৯) অবিচার (১০) ব্যভিচার থেকে দূরে থাকা (১১) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকা।

যখন এ আয়াত নাযিল হলো তখন যারা উপস্থিত ছিলেন, তারা হলেন প্রথম যুগের মুহাজেরগণ। এ আয়াত সমূহে নিঃসন্দেহে তাঁদের ফজিলত বর্ণিত হয়েছে।[১]

আলোচ্য আয়াতের عِبَادُ الرَّحْمٰنِ (দয়াবান আল্লাহ পাকের বন্দাগণ) দ্বারা কাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে? এ সম্পর্কে আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, তারা হলেন সেই মোমেনগণ যারা অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে পৃথিবীতে চলাফেরা করে এবং যারা আল্লাহ পাকের পূর্ণ অনুগত থাকে।

এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) আরেকটি কথারও উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তারা হলেন সে সব লোক যারা বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, যারা কোন ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করেন না।[২]

প্রকৃত বন্দার পরিচয়

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক তাঁর খাঁটি বন্দাদের পরিচয় দিয়েছেন। প্রকৃত বন্দাদের পরিচয় হলো এই, তারা প্রকৃত মোমেন, পরহেযগার, উন্নত আদর্শের অনুসারী, তারা বিনম্র পদক্ষেপে চলাফেরা করে, তারা কখনো অহংকার করেনা, তাদের মনে যেমন

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০০-০১
[২]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৩

অহংকার থাকেনা, তেমনি তাদের চাল-চলনে, কথা-বার্তায়, ওঠা-বসায় কখনো অহংবোধ পরিলক্ষিত হয় না, তারা রহমানের নাম শ্রবণ করে মুশরেকদের ন্যায় মন্দ কথা বলার ধৃষ্টতা দেখায় না। বিনীত, বিনম্র, নিরহংকার মোমেনদেরকেই আল্লাহ পাক তাঁর প্রকৃত বন্দা বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের আচরণে কখনো অহংকারের বহিঃপ্রকাশ হয়না, আর যখন তাদেরকে অজ্ঞ লোকেরা সম্বোধন করে, তখন তারা বলে সালাম (তোমায়)।

মুজাহেদ, মোকাতেল এবং এবনে হাব্বান বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে সালামের অর্থ হলো সোজা কথা, যাতে কোন কষ্ট না থাকে এবং গুনাহও না হয়। হাসান বসরী (রহঃ) বলেছেনঃ যদি কোন অজ্ঞ ব্যক্তি তাদের সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে তবে তারা তা সহ্য করে। অর্থাৎ মন্দ ব্যবহারের জবাবে মন্দ ব্যবহার করেনা। হযরত হাসান বসরী (রঃ) এ পর্যায়ে "সালাম" শব্দটির আরেকটি অর্থ বলেছেন, তা হল আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ বলে, তোমার প্রতি সালাম।

তফসীরকার আবুল আলীয়া বলেন, এ আয়াতের হুকুম জেহাদের আদেশ হওয়ার পূর্বে ছিল। জেহাদের আয়াত নাযিল হওয়ার পর এ আয়াত মনসুখ হয়ে গেছে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বলেছেন, আয়াত মনসুখ হয়নি; বরং মুহকাম। কেননা, জেহাদের আদেশ প্রদান করা হয়েছে শুধু আল্লাহ পাকের নাম বুলন্দ করার জন্যে। যদি লোকেরা কলেমায়ে তাইয়্যেবার আদর্শ গ্রহণ করে অথবা জিযিয়া (অমুসলিম কর) আদায় করে তবে জেহাদের আদেশ শেষ হয়ে যায়।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমাকে সে পর্যন্ত জেহাদ করার আদেশ দেয়া হয়েছে যতক্ষণ লোকেরা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মোহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ বলে এবং তার মর্ম স্বীকার করে নেয়।

আয়াতের মর্মকথা

এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর প্রকৃত বন্দাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তা হল, যারা মূর্খ লোক তারা যদি মূর্খতা সুলভ আচরণ করে, অন্যায় অসুন্দর কথা বলে তবে আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণ তাদের মূর্খতা সুলভ আচরণের প্রতি-উত্তরে মূর্খতা প্রকাশ করে না, তাদের সঙ্গে কোন প্রকার কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়না, অত্যন্ত ভদ্রভাবে তাদেরকে এড়িয়ে চলে, বিনম্র ভাষায় তাদেরকে জবাব দেয় এবং তাদের সঙ্গে এমনভাবে আচরণ করে যাতে করে কোন প্রকার ঝগড়া-ফাসাদ না করে তথা সুকৌশলে ভদ্রতার সাথে তাদের সঙ্গে আচরণ করে।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আরজ করলো, আমার একজন আত্মীয় রয়েছেন যার সঙ্গে আমি মিলে মিশে থাকতে চাই, কিন্তু সে আমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে রাখে। আমি তার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করি, কিন্তু সে আমার সঙ্গে মন্দ ব্যবহার করে। আমি তার জুলুম সহ্য করি, কিন্তু সে গাল-মন্দ দেয়া বন্ধ করেনা। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, যদি সে এমনই হয় যা তুমি বলেছ, তবে তুমি তার উপর যেন ধূলা নিক্ষেপ করছো, যতক্ষণ তুমি এ অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমার জন্যে একজন সাহায্যকারী থাকবে। (মুসলিম শরীফ)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) যখন এ আয়াত পাঠ করলেন তখন তিনি বললেন, এ হলো আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের দিনের অবস্থা, তাঁদের রাতের অবস্থা পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ يَبِيْتُوْنَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَّ قِيَامًا

"এবং যারা রাত অতিবাহিত করে তাদের প্রতিপালকের সম্মুখে সেজদারত হয়ে এবং দন্ডায়মান অবস্থায়"।

অর্থাৎ যারা আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা, তারা রাত্রিকালকে গাফলতের আবর্তে নিপতিত হয়ে সুখ-নিদ্রায় অতিবাহিত করে না; বরং সমগ্র বিশ্ব যখন ঘুমের ঘোরে থাকে, তখন তারা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে নামাযে দন্ডায়মান ও সেজদারত থাকে এবং গভীর রাত্রে নিরালায় একাকী আল্লাহ পাকের স্মরণে তন্ময় থাকে। সাহাবায়ে কেরাম এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন।

হযরত সাঈদ এবনুল মুসায়্যেব (রঃ) সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর যাবত এশার নামাজের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। ইমাম আবু হানিফা (রঃ) চল্লিশ বছর যাবত এশার নামাজের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন। মওলানা রুমী (রঃ) দু' রাকাতেই রাত শেষ করতেন। এক ব্যক্তি হযরত ওয়সুল করনী (রঃ)-এর নিকট তিনি দিন তিন রাত অতিবাহিত করেন কিন্তু কোন কথা বলার সুযোগ পাননি কেননা, তিন সর্বক্ষণ এবাদতে মশগুল ছিলেন। হযরত শাহ আফাক (রঃ) দৈনিক পঞ্চাশ হাজার বার কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতেন। ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) দৈনিক এক হাজার রাকাত নফল নামায আদায় করতেন। হযরত রাবেয়া বসরী (রঃ)-ও অনুরূপ আমল করতেন। এমনি অগণিত আওলিয়ায়ে কেরাম তাঁদের সমগ্র জীবন আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল অবস্থায় অতিবাহিত করেছেন এবং আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছেন। এ আয়াত সম্পর্কে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, এবাদতের ব্যাপারে বিশেষভাবে রাতের উল্লেখ এজন্যে করা হয়েছে যে, রাতের এবাদত অত্যন্ত কঠিন হয়। তাতে রিয়াকারী বা লোক দেখানোর কোন সম্ভাবনা থাকেনা, মন সর্বদা আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির থাকে, এভাবে আল্লাহ পাকের নৈকট্য-ধন্য হওয়া সম্ভব হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমার উম্মতের সর্দার হবে পবিত্র কোরআনের ধারকগণ এবং রাতে এবাদতকারীগণ।

হযরত আবু হোরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেছেন, আমি নিজে শুনেছি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করছিলেন, ফরজ নামাযের পরে সেই নামাযই উত্তম যা রাত্রিকালে আদায় করা হয়।

হযরত আবু উমামা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ রাত্রিকালে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান হওয়া জরুরী মনে কর

কেননা, এটি পূর্বকালের নেককার লোকদের অভ্যাস, আল্লাহর নৈকট্য লাভের, গুনাহ মাফ করাবার এবং ভবিষ্যতে গুনাহ থেকে বিরত থাকার এটি একটি মাধ্যম। (তিরমিযী)

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তিনটি বিষয় এমন, যা দেখে আল্লাহ পাক খুশী হন।

(এক) সে ব্যক্তিকে দেখে যে রাত্রিকালে উঠে নামায আদায় করে,

(দুই) সে সব লোকদেরকে দেখে যারা নামাযের জামাতে কাতারবন্দী হয়।

(তিন) সে সব লোকদেরকে দেখে যারা রণাঙ্গনে দুশমনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নিমিত্তে কাতারবন্দী হয়। (বগভী)

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামাযের পর দু' রাকাআত অথবা তার চেয়ে বেশী নামায আদায় করে, সে যেন সারারাত আল্লাহ পাকের দরবারে সেজদারত বা দন্ডায়মান অবস্থায় অতিবাহিত করেছে।

হযরত ওসমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে ব্যক্তি এশার নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করল, তার অবস্থা এমন সে যেন অর্ধেক রাত এবাদত করল। (মুসলিম, আহমদ)

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا

আর যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের থেকে দোযখের আযাবকে দূরে সরিয়ে রাখ"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দাদের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল এই, তারা দিবা-রাত্রি আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকা সত্ত্বেও ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে, আল্লাহ পাকের আযাবকে ভয় করতে থাকে এবং দরবারে এলাহীতে ক্রন্দন করে মুনাজাত করে বলতে থাকে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা কর'। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এবাদতের কারণে তারা অহংকারী হয়না এবং নিজেদের নেক আমলের উপরও নির্ভরশীল হয় না; বরং আল্লাহ পাকের এবাদত করার পরও নিজেদের ত্রুটি-বিচ্যুতির কথা মনে করে কান্নাকাটি করতে থাকে।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ বনী ইসরাঈলের একজন নবী হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট আল্লাহ পাক ওহী নাযিল করলেন যে, নিজের উম্মতের নেককার লোকদের বলে দাও, তারা যেন নিজেদের আমলের উপর ভরসা না করে বসে। কেননা, কেয়ামতের দিন আমি যে বন্দাকে হিসাবের জন্যে দাঁড় করাব আর তাকে আযাব দিতে ইচ্ছা করব, তখন সুবিচারের ভিত্তিতে তাকে আযাব দেব। আর আমার নাফরমান বন্দাদেরকে বলে দাও যে, তারা যেন নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে না দেয়। অর্থাৎ তারা যেন আল্লাহ পাকের মাগফেরাত এবং রহমত থেকে নিরাশ না হয়। কেননা, আমি ইচ্ছা করলে স্বীয় রহমতে অনেক বড় বড় গুনাহও মাফ করে দেব। আর আমি কোন বিষয়ে পরোয়া করি না, অর্থাৎ কাউকে আযাব দেয়া বা মাফ করার ব্যাপারে আল্লাহ পাকের মর্জিই সর্বশেষ কথা।

আলোচ্য আয়াতের غرام শব্দটির অর্থ হলো এমন বস্তু যা কখনো দূরীভূত হয়না অর্থাৎ কাফেরদেরকে দোযখে যে শাস্তি দেয়া হবে তা কখনো দূরীভূত হবেনা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, এর অর্থ হলো ধ্বংস। আর কারো কারো মতে, এর অর্থ হলো কঠিন বিপদ।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক কাফেরদেরকে আদেশ দিয়েছেন তাঁর নেয়ামতের শোকর গুজার হতে, কিন্তু তারা অকৃতজ্ঞ, নাফরমান হয়েছে। তাই আল্লাহ্ পাক তাদেরকে কঠিন এবং স্থায়ী বিপদের কেন্দ্র দোযখে নিক্ষেপ করবেন।

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

"নিশ্চয় দোযখ আশ্রয়-স্থল এবং বসতি হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য"। অর্থাৎ দোযখ অত্যন্ত কষ্টদায়ক, বিপজ্জনক স্থান।

দোযখের কিছু বিবরণ

মালেক এবনে হারেস (রঃ) বর্ণনা করেন, যখন দোযখীকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে তখন আল্লাহ্ পাকই জানেন কতকাল পর্যন্ত সে নিচের দিকে যেতে থাকবে। এরপর দোযখের একটি দ্বারে তাকে পৌঁছান হবে আর বলা হবে, তুমি অত্যন্ত তৃষ্ণার্ত অতএব, কিছু পান কর, এরপর তাকে বিষাক্ত সর্প ও বিচ্ছুর বিষ পান করানো হবে। যার পরিণামে দেহ থেকে তার চামড়া বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, রগ এবং হাড়গুলো পৃথক পৃথক হয়ে যাবে।

হযরত ওবায়েদ এবনে ওমায়ের (রঃ) বর্ণনা করেন, দোযখে অনেক গর্ত এবং কূপ রয়েছে। তাতে রয়েছে বড় আকারের বিষাক্ত সর্প এবং বিচ্ছু। যখন কোন ব্যক্তিকে দোযখে নিক্ষেপ করা হয়, তখন ঐ সর্প বিচ্ছুগুলো তাদের দেহে দংশন করতে থাকে এবং সারা শরীরে বিষ ছড়িয়ে পড়ে। পরিণামে দোযখী ব্যক্তির মাথার চুলগুলো পড়ে যায়। এরপর সর্পগুলো বিদায় নেয়।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ দোযখীরা এক হাজার বছর যাবত 'ইয়া হান্নান' 'ইয়া মান্নান' বলে চিৎকার করতে থাকবে। তখন আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-কে নির্দেশ প্রদান করবেন, 'দেখ ওরা কি বলে'। জীব্রাঈল (আঃ) এসে দেখবেন, তারা অত্যন্ত মন্দ অবস্থায় হাহাকার করছে, তখন জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের অবস্থা বর্ণনা করবেন। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করবেন, তুমি পুনরায় যাও, অমুক স্থানে এ ব্যক্তি আছে তাকে নিয়ে আস। তখন ঐ চিহ্নিত ব্যক্তিকে আল্লাহ পাকের দরবারে দন্ডায়মান করা হবে। আল্লাহ পাক তাকে জিজ্ঞাসা করবেন, তুমি কেমন স্থানে আছ? সে জবাব দেবে,

إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا

অর্থাৎ হে আল্লাহ! নিশ্চয় দোযখ আশ্রয়-স্থল এবং বসতি হিসেবে অত্যন্ত জঘন্য। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, তাকে তার স্থানে পৌঁছে দাও। সে তখন ক্রন্দনরত

অবস্থায় এই বলে কাকুতি-মিনতি করতে থাকবে, ইয়া আরহামার রাহিমীন! (দয়াবানদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান) তুমি যখন আমাকে দোযখ থেকে বের করেছে, তখন আমাকে আর সেখানে প্রেরণ করোনা, তোমার পবিত্র সত্ত্বা এমন নয় যে, তুমি আমাকে পুনরায় দোযখে নিক্ষেপ করবে, আমি তোমার নিকট করুণা ভিক্ষা করি, হে আল্লাহ! এখন আমার প্রতি দয়া কর, যখন তুমি আমাকে দোযখ থেকে বের করেছ তখন আমি খুশী হয়ে এ আশা করেছি যে, তুমি আর আমাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেনা। তখন দয়াময় আল্লাহ পাকের দয়া হবে, তিনি আদেশ দেবেন, আমার বন্দাকে ছেড়ে দাও।[১]

যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করা সত্ত্বেও তাঁর অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, মানবতার কলঙ্ক পৌত্তলিকতায় বিশ্বাস স্থাপন করে, যিনি সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, তাঁকে অস্বীকার করে তাঁর তৌহিদে অবিশ্বাস করে, তাঁর প্রেরিত নবী রসূলকে অমান্য করে, তাঁর মহান বাণী পবিত্র কোরআনকে অগ্রাহ্য করে এ ক্ষণস্থায়ী জগতের লোভ-লালসায় মত্ত থাকে, আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে থাকে গাফেল, মানবতার উৎকর্ষ সাধনে বাধার সৃষ্টি করে, ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্তে লিপ্ত হয়, এমন জঘন্য অপরাধীদের শাস্তিই হলো দোযখ। আর এ শাস্তির কথাই আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

পক্ষান্তরে, যারা প্রকৃত মোমেন, যারা বিনয়ী, যারা বিনম্র স্বভাবের অধিকারী, যারা দিবা-রাত্রি আল্লাহ পাকের এবাদতে থাকে মশগুল, এরপরও আল্লাহ পাকের ভয়ে থাকে ভীত-সন্ত্রস্ত, তারাই আল্লাহ পাকের প্রকৃত এবং প্রিয় বন্দা। তাদের জন্যেই রয়েছে চির সুখ এবং শান্তির কেন্দ্র জান্নাত। আল্লাহ পাকের এমন বন্দাগণের কিছু নিদর্শন পূর্বোক্ত আয়াত সমূহে বর্ণিত হয়েছে। আর পরবর্তী আয়াতেও এ পর্যায়ের আরো কিছু বিবরণ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ اِذَآ اَنْفَقُوْا لَمْ يُسْرِفُوْا وَلَمْ يَقْتُرُوْا...

"আর তারা যখন ব্যয় করে তখন তারা অযথা ব্যয় করেনা এবং কার্পণ্যও করেনা; বরং তারা উভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় থাকে"।

অর্থনীতির দিক-নির্দেশনা

অর্থাৎ আল্লাহর প্রিয় বন্দাগণের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো, সাংসারিক জীবনেও তারা সকল অবস্থায় আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলে। কখনো অসংযত অথবা উচ্ছৃংখল হয় না, প্রয়োজনের আয়োজন করে কিন্তু প্রয়োজনের অতিরিক্ত ব্যয় করেনা, অর্থ-সম্পদ ব্যয়ের ব্যাপারে তারা মধ্য পন্থা অবলম্বন করে, অপচয়ও করেনা এবং কার্পণ্যও করেনা, প্রয়োজনীয় ব্যাপারে ব্যয় করতে কখনো সংকোচ বোধ করেনা তথা ভোগের নেশায় মেতে ওঠেনা। পক্ষান্তরে, ধন-সম্পদের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে কৃপণতাও করেনা; বরং সকল অবস্থায় সুশৃংখল এবং সংযত থাকে।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্টা-১৮

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), মুজাহেদ (রঃ), কাতাদা (রঃ) এবং এবনে জোরায়েয (রঃ) আলোচ্য আয়াতের لَمْ يُسْرِفُوْا বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, পাপ কার্যে ব্যয় করা তা যত অল্পই হোক না কেন, অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। আর কারো হক্ব প্রদানে বিরত থাকা এবং প্রয়োজনে ব্যয় না করা কৃপণতার অন্তর্ভুক্ত।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) এভাবে আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেনঃ আল্লাহর প্রকৃত বন্দা তারা, যারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কাজে ব্যয় করে না এবং আল্লাহ পাকের নির্ধারিত হক্ব আদায়েও কার্পণ্য করেনা।

কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اسراف শব্দটির ব্যাখ্যা হলো, অপচয়ের ব্যাপারে সীমালঙ্ঘন করা, আর কার্পণ্য হলো নিতান্ত প্রয়োজনেও ব্যয় না করা।

وَكَانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوَامًا

আর তারা উভয়ের মাঝে মধ্যম পন্থায় থাকে অর্থাৎ অপব্যয়ও করেনা এবং কার্পণ্যও করেনা।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের এই অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে অর্থনীতির এক গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।[১]

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, (অপচয় ও কার্পণ্যতার ক্ষেত্রে) মধ্য পন্থা অবলম্বন করা মানুষের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক। এ পর্যায়ে হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর একটি কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন, আল্লাহর রাহে যত ইচ্ছা দান কর তা অপব্যয় নয়।

হযরত ইয়াস এবনে মাবিয়া (রঃ) বলেছেন, যেখানে তুমি আল্লাহ পাকের হুকুমের সীমালঙ্ঘন করবে, সেখানেই এসরাফ বা অপব্যয় হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পাপাচারে ব্যয় অপব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত।[২]

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ

"আর যারা আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডাকেনা (শেরক করেনা), এবং আল্লাহ পাক যাকে হত্যা করা নিষেধ করেছেন, এমন কোন লোককে যথার্থ কারণ ব্যতীত যারা হত্যা করেনা এবং যারা ব্যভিচারে লিপ্ত হয়না"।

আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত গুণাবলী যাদের মধ্যে পাওয়া যাবে তারাই হবে প্রকৃত মোমেন এবং তারাই হবে আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা।

শানে নুযুল

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। তিনি বলেন, আমি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৮৯
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-১৯

নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা অথচ আল্লাহ পাকই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। আমি আরজ করলাম, এরপর সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? তিনি এরশাদ করলেন, এই ভয়ে নিজের সন্তানকে হত্যা করা যে সে তোমার সাথে খাবারে অংশীদার হবে। আমি আরজ করলাম, এরপর কোন্ গুনাহ সবচেয়ে বড়? তিনি এরশাদ করলেনঃ নিজের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়া। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের এ কথাগুলোর সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

এ আয়াতে সর্বশ্রেষ্ঠ গুনাহ সমূহের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এ সমস্ত জঘন্য অন্যায় আচরণ থেকে আত্মরক্ষা করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও যারা এসব জঘন্য কাজে লিপ্ত হবে, তাদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে পরবর্তী আয়াতেঃ

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

আর যে এসব কাজ করবে সে তার গুনাহর শাস্তি পাবে। আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের اثام শব্দটির অর্থ হলো শাস্তি।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, اثام দোযখের একটি স্থানের নাম। হান্নাদ এবং সুফিয়ানও একথাই বলেছেন।

এবনে জরীর, তেবরানী এবং বায়হাকী বর্ণনা করেছেন, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যদি কোন ভারী পাথর (দশ ওকিয়া ওজনের) দোযখের এক পার্শ্ব থেকে নিচের দিকে নিক্ষেপ করা হয়, তবে সত্তর বছরেও ঐ পাথর غ এবং اثام নামক স্থানে পৌঁছবে না। বর্ণনাকারী বলেন, আমি আরজ করলাম غ এবং اثام কি? তখন তিনি এরশাদ করেনঃ দোযখের তলদেশের দু'টি নহর যার মধ্যে দোযখীদের দেহের পূঁজ প্রবাহিত হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে উভয় স্থানের উল্লেখ করেছেন এভাবে–

فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا

وَمَنْ يَّفْعَلْ ذٰلِكَ يَلْقَ اَثَامًا

এ আয়াতের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এই বিস্তারিত হাদীসের উল্লেখ করার পর আরও কয়েকখানি হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। বিদায় হজ্জের দিন হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেনঃ তোমরা চারটি গুনাহ থেকে আত্মরক্ষা কর। (১) আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা (২) কোন মানুষকে হত্যা করা (৩) ব্যভিচার এবং (৪) চুরি।

মসনদে আহমদে সংকলিত হাদীসে রয়েছেঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবাগণকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা ব্যভিচার সম্পর্কে কি বল? তাঁরা জবাব দিলেন, তা হারাম এবং কেয়ামত পর্যন্ত হারাম। তিনি এরশাদ করলেন, "শোন, প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে ব্যভিচার করা অন্য দশটি স্ত্রীলোকের সাথে ব্যভিচার করার চেয়েও মন্দ"। এরপর এরশাদ করেছেন, "শোন, দশটি স্থানের চুরিও এত মন্দ নয়, নিজের

প্রতিবেশীর বাড়ীতে চুরি করা যত মন্দ"। তিনি আরও এরশাদ করেছেন, "শেরকের পর এর চেয়ে বড় কোন গুনাহ নেই যে, মানুষ তার নিজের শুক্র এমন স্থানে ফেলবে যা তার জন্যে হালাল নয়"।

বর্ণিত আছে যে, কোন কোন মুশরেক হুজর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট হাযির হয়ে আরজ করলো, আপনার কথা ভাল, কিন্তু আমরা যে শেরক করেছি, হত্যা করেছি, ব্যভিচারও করেছি, এসব কাজ অনেক করেছি এখন বলুন আমাদের জন্য কী আদেশ? তখন এ আয়াত নাযিল হয় এবং এ আয়াতও নাযিল হয়–

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا...

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক তোমাদের জন্যে নিষেধ করেছেন যে, তোমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে সৃষ্টির এবাদত কর আর এ বিষয়েও যে, তোমরা কুকুরকে তো লালন-পালন কর অথচ নিজেদের সন্তানকে হত্যা কর। আর এ কাজও নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছেন যে, তোমরা তোমাদের প্রতিবেশীর স্ত্রীর সঙ্গে মন্দ কাজ কর।

আলোচ্য আয়াতের اَثَامًا শব্দটি দোযখের একটি বিশেষ স্থানের নাম। এটি সেই স্থান যেখানে ব্যভিচারী লোকদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। এ শব্দটি আযাব এবং শাস্তির অর্থেও ব্যবহৃত হয়।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এবনে মরদবিয়ার সূত্রের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন, আসওয়াদ এবনে ইয়াজিদকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) কোন্ আমলকে অন্য আমলের উপর প্রাধান্য দিতেন? আসওয়াদ বললেন, আমি আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-কে একথাটিই জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি বললেন, অনুরূপ প্রশ্ন আমি হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করেছিলাম। আমি বলেছি, ইয়া রসূলাল্লাহ! কোন্ আমলটি আল্লাহ পাকের নিকট সর্বাধিক পছন্দনীয় এবং তাঁর নৈকট্য লাভের কারণ হয়? তিনি এরশাদ করলেন, সঠিক সময়ে নামায আদায় করা। আমি আরজ করলাম, এরপর কি? তিনি এরশাদ করলেন, পিতা মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা। আমি আরজ করলাম, এরপর কি? তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহর রাহে জেহাদ করা। এরপর আরজ করলাম, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সর্বাধিক অপছন্দনীয় কাজ কি? যা মানুষকে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করা, অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন। আর নিজের সন্তানকে হত্যা করা এই আশঙ্কায় যে, সে তোমার সাথে আহার করবে। আর প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আলোচ্য আয়াত তেলাওয়াত করেন।[২]

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৮৫
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৫

[২]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৫
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা

يُضٰعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَيَخْلُدْ فِيْهٖ مُهَانًا ﴿٦٩﴾ اِلَّا مَنْ
تَابَ وَاٰمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِهِمْ
حَسَنٰتٍ ۗ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ﴿٧٠﴾ وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا
فَاِنَّهٗ يَتُوْبُ اِلَى اللّٰهِ مَتَابًا ﴿٧١﴾ وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ ۙ وَ
اِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا ﴿٧٢﴾ وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ لَمْ
يَخِرُّوْا عَلَيْهَا صُمًّا وَّعُمْيَانًا ﴿٧٣﴾ وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا
مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا ﴿٧٤﴾
اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا ﴿٧٥﴾
خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ۗ حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّمُقَامًا ﴿٧٦﴾ قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ
رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ ۚ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا ﴿٧٧﴾

তরজমা

(৬৯) কেয়ামতের দিন তার আযাব দ্বিগুণ হবে এবং অপমানিত অবস্থায় তাতে পড়ে থাকবে।

(৭০) তবে যে তওবা করেছে এবং নেক আমল করেছে আল্লাহ পাক তাদের পাপকে পূণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

(৭১) আর যে তওবা করে এবং নেক আমল করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়।

(৭২) আর দয়াময় আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা তারাই যারা মিথ্যা কাজে অংশ গ্রহণ করে না এবং তারা যখন খেলা-ধূলার পাশ দিয়ে যায় তখন তারা ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে যায়।

(৭৩) আর যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বোঝানো হয় তখন তারা তাতে বধির এবং অন্ধ হয়ে থাকে না।

(৭৪) এবং যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন নয়ন জুড়ানো স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকদের অগ্রদূত করুন"।

(৭৫) তারাই সে সব লোক যারা তাদের সবরের ফলে লাভ করবে বেহেশতের বালাখানা এবং ফেরেশতাগণ সেখানে দোয়া ও সালাম বলে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাতে আসবে।

(৭৬) তারা সেখানে চিরদিন থাকবে, আর অবস্থান করার জন্যে তা অতি উত্তম স্থান।

(৭৭) (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালককে না-ও ডাক তবু তিনি আদৌ তোমাদের পরোয়া করেন না। তোমরা অস্বীকার করছো, পরিণামে অচিরেই নেমে আসবে অপরিহার্য শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আল্লাহ পাকের প্রকৃত বন্দা কখনও তাঁর সাথে শেরক করেনা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করে না এবং ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না। এরপর এসব মন্দ কাজের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে, কেয়ামতের দিন এসব গুরুতর পাপ কার্যের শাস্তি হবে দ্বিগুণ। যেহেতু এসবই মহাপাপ তাই শাস্তি হবে অনেক বেশী এবং লাঞ্ছিত অপমানিত হয়ে তারা কঠিন কঠোর শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।

আলোচ্য আয়াতে প্রথমতঃ কঠিন আযাবের কথা ঘোষণা করা হয়েছে, দ্বিতীয়তঃ দ্বিগুণ আযাবের কথা বলা হয়েছে। তৃতীয়তঃ স্থায়ী আযাবের কথা বলা হয়েছে এবং অপমানিত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় থাকার কথাও ঘোষণা করা হয়েছে। এর দ্বারা জানা যায় যে, এ শাস্তি কাফের ও মুশরেকদের জন্যেই হবে।

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا

"তবে যে তওবা করেছে এবং নেক আমল করেছে, আল্লাহ পাক তার পাপকে পূণ্যে পরিণত করে দেবেন"।

যারা তওবা করে

যারা আত্মসংশোধন করে, পাপাচার থেকে তওবা করে, আল্লাহ পাক এবং তাঁর প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনে আর সেই ঈমানের দাবী মোতাবেক নেক আমল করে, আল্লাহ পাক তাকে মাফ করেন এবং নেক আমলের তওফিক দান করেন। শুধু তাই নয়; বরং ইতিপূর্বে পাপাচারের প্রতি তার যে আকর্ষণ বা আসক্তি ছিল, তার স্থলে নেক আমলের প্রতি তার মনকে আকৃষ্ট করে দেন, কুফরী ও নাফরমানীর জীবনে যে সব পাপকার্য হয়েছিল, ঈমান ও নেক আমলের বরকতে তা ক্ষমা করেন তথা তার তওবা কবুল করেন। তার গুনাহ সমূহ মুছে দেন এবং তাকে সওয়াব দান করেন।

আলোচ্য আয়াতে যে তওবা করার কথা বলা হয়েছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো গুনাহ থেকে তওবা, আর ঈমান আনয়নের অর্থ আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন।

এখানে উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক পাপী-তাপী মানুষকে বিশুদ্ধ চিত্তে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থী হবার নির্দেশ দিয়েছেন যেমন এরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا

হে মোমেনগণ! তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে প্রকৃত তওবা কর, মনের পবিত্রতা অর্জন কর, আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হও।

তওবার তাৎপর্য

তওবার তাৎপর্য হলো কৃত পাপকার্যের জন্যে মনে মনে লজ্জিত হওয়া, মুখে তওবার কথা উচ্চারণ করা এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপাচার থেকে বিরত রাখা। তওবার এ তিনটি শর্ত পূর্ণ হতে হবে। যদি এর একটিরও ব্যতিক্রম হয় তবে সঠিক তওবা হয়না। যদি অপরাধ হক্কুল্লাহ বা আল্লাহ পাকের হক্ব সম্পর্কীয় হয় তবে এভাবে তওবা করতে হবে। যদি ফরজ বা ওয়াজিব এবাদত সম্পর্কীয় কোন অপরাধ হয়, তবে অবশ্যই তার কাযা আদায় করতে হবে।

পক্ষান্তরে, যদি অপরাধ হক্কুল এবাদ বা মানুষের হক্ব সম্পর্কীয় হয়, তবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হতে হবে। যদি অর্থনৈতিক লেনদেনের বিষয় হয় তবে পাওনাদারের প্রাপ্য অবশ্যই আদায় করতে হবে। তবে যদি পাওনাদার নিজে ক্ষমা করে দেয় তবে তা স্বতন্ত্র কথা। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের জন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَاسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْٓا اِلَيْهِ.....

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালকের নিকট ক্ষমাপ্রার্থী হও, তাঁর নিকট তওবা কর"।

আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যিনি আল্লাহ তাআলার সর্বশ্রেষ্ঠ রসূল, আল্লাহ পাকের দরবারে যাঁর মর্যাদা সবার উপরে, যিনি আল্লাহ পাকের সবচেয়ে প্রিয়, যিনি নিঃস্পাপ, যাঁর পূতঃ পবিত্র জীবনই সমগ্র বিশ্ব মানবের জন্যে একমাত্র আদর্শ, যাঁর কোন গুনাহ নেই, যিনি নবুওয়্যত লাভের পূর্বেও কোন প্রকার অন্যায় কাজের প্রতি ক্ষণিকের জন্যেও আকৃষ্ট হননি, তিনি এরশাদ করেছেনঃ হে লোক সকল! আল্লাহ পাকের দরবারে তোমরা তওবা করো, ক্ষমাপ্রার্থী হও, একথা জেনে রেখো যে, আমি প্রতিদিন ১০০শ' বার করে আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের পূর্বকালের উম্মতের এক ব্যক্তি ৯৯ জন লোককে হত্যা করে একজন ধর্মযাজকের নিকট হাযির হয়ে বললোঃ আমি এ অন্যায়

করে এসেছি, এখন আমি তওবা করতে পারি কি? পাদ্রী জবাব দিলঃ না, এত জঘন্য অপরাধের পর আর কিসের তওবা? লোকটি এই পাদ্রীকেও হত্যা করলো এবং অন্য একজন ধার্মিক ব্যক্তির নিকট তার ঘটনা বর্ণনার পর বললো আমার জন্যে তওবার কোন ব্যবস্থা আছে কি? লোকটি বললোঃ তুমি আল্লাহ্ পাকের দরবারে কৃত অন্যায়ের জন্য তওবা করবে— এই শুভ এবং সৎ কাজে কে তোমাকে বাধা দিতে পারে? এক কাজ করো, তুমি আল্লাহর দরবারে আন্তরিকভাবে তওবা কর এবং এদেশ থেকে চলে যাও, অমুক দেশে গমন কর সেখানে অনেক নেককার লোক রয়েছে, তাদের সাথে মিলে মিশে আল্লাহর এবাদতে মশগুল হও।

লোকটি আন্তরিকভাবে তওবা করলো এবং সঙ্গে সঙ্গে দেশ ছেড়ে তার নিদৃষ্ট মনজিলের দিকে অগ্রসর হলো।

কিন্তু পথিমধ্যেই সে মৃত্যুর সম্মুখীন হলো, সে আর চলতে পারছে না, চলার শক্তি তার ধীরে ধীরে রহিত হতে লাগলো, এমনকি অবশেষে সে ধরাশায়ী হলো, কিন্তু পাপ পংকিলতার স্থান থেকে দূরে-বহুদূরে চলে যাবার এবং নিজেকে পূতঃপবিত্র করার যে শপথ সে করেছিল এবং যে অভিযান সে শুরু করেছিল তাতে এতটুকু ভাটা পড়েনি। তাই সে ধরাশায়ী অবস্থায় নিজেকে সম্মুখের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সচেষ্ট রইল।

কিন্তু সে আর কতক্ষণ! মানুষের সময় শক্তি সামর্থ তথা-সর্বস্ব সীমাবদ্ধ, সীমিত, অসীম তার কিছুই নেই, তাই মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান জারী হলো-তার জন্যে নির্দিষ্ট সময়ে, লোকটি যাত্রী হলো পরপারের, তার সাধনার অবসান ঘটলো।

কিন্তু ঐ মুহূর্তে আরও একটি ঘটনা ঘটছিল। এই ব্যক্তির রূহ বা আত্মা নিয়ে যাবার জন্য আগমন করেছেন আল্লাহর দু' দল ফেরেশতা। রহমতের ফেরেশতাদের বক্তব্য হলো লোকটি তওবা করেছে, সে তওবা ছিল প্রকৃত এবং খাঁটি। মনে প্রাণে সে কৃত অন্যায়ের জন্য লজ্জিত হয়েছে, স্রষ্টা ও পালনকর্তার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে, সে সত্য ও ন্যায়কে আঁকড়ে ধরেছে, অন্যায় অবিচারের স্থান থেকে দূরে সরে যাবার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছে।

আর গজবের ফেরেশতাদের বক্তব্য হলো লোকটি জঘন্য অপরাধী, সে তওবা করেছে ঠিকই কিন্তু অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌছার পূর্বেই তাকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে, তার তওবা সম্পূর্ণ হয়নি। এমন অবস্থায় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে নির্দেশ এলো, তোমরা জমি পরিমাপ করে দেখো, যদি সে পবিত্র স্থানের নিকটবর্তী হয়ে থাকে, তবে রহমতের ফেরেশতাদের দায়িত্ব হবে তার রূহ কবজ করা, আর যদি সে অপবিত্র স্থানেরই নিকটবর্তী থাকে, তবে এ দায়িত্ব পালন করবে গজবের ফেরেশতারা।

আল্লাহ পাকের দরবারে আন্তরিক এবং প্রকৃত তওবার মূল্য ও গুরুত্ব অনেক বেশী, এই ব্যক্তির তওবা ছিল সম্পূর্ণ সঠিক ও আন্তরিক, ফলে তা কবুল হলো আল্লাহ্ পাকের দরবারে, তাই তিনি জমিনকে আদেশ দিলেন যেন তার লক্ষ্যস্থল নিকটবর্তী হয়ে যায়। আর এভাবে আল্লাহর রহমতের ফেরেশতারা তার রূহকে অভ্যর্থনা জানায়। তার আন্তরিক ও অন্তিম সাধনা সার্থক হয়।

বস্তুতঃ মানুষ যখন অবনতি এবং অধঃপতনের পথ পরিত্যাগ করে, মানুষ যখন পাপ-পঙ্কিলতার শোচনীয় পরিণতি সম্পর্কে ভীত-সন্ত্রস্ত হয় এবং পরিত্রাণের জন্যে সচেষ্ট হয়, মনে প্রাণে তওবা করে, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে তওবা গ্রহণযোগ্য হয়। তাঁর রহমতের দ্বার তখন অবারিত কেননা, ইসলামের আদর্শ যদি রূপায়িত হয়, পবিত্র কোরআনের শিক্ষা বাস্তবায়িত হয়; তবে আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম রহমতও অবতীর্ণ হয়। এটিই পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট ঘোষণা, আর এটিই স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের শাশ্বতঃ বিধান।

এ আয়াত সম্পর্কে আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আমাদের নিকট হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাসের (রাঃ) একথা পৌঁছেছেঃ তিনি বলেছেন, আমরা দু' বছর যাবত وَالَّذِيْنَ لَايَدْعُوْنَ مَعَ اللهِ اِلٰهًا اٰخَرَ.... পাঠ করছিলাম, এরপর যখন আলোচ্য اِلَّا مَنْ تَابَ আয়াতখানি নাযিল হয়, এভাবে সূরা ফাতহের আয়াত اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا لِّيَغْفِرَ لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এত খুশি হতে দেখেছি, যা কখনো দেখিনি।[১]

فَاُولٰٓئِكَ يُبَدِّلُ اللهُ سَيِّاٰتِهِمْ حَسَنٰتٍ

"তারাই সে সব লোক, যাদের পাপকে আল্লাহ পাক পূণ্যে পরিবর্তন করে দেবেন"। তফসীরকারগণ এ আয়াতাংশের দু'টি ব্যাখ্যা করেছেন।

১. তওবা করার কারণে আল্লাহ পাক তাদের কৃত গুনাহগুলো দূরীভূত করে দেবেন, আর সে স্থলে নেকী দান করবেন।

২. আল্লাহ পাক তাদের গুনাহ করার শক্তির পরিবর্তে আল্লাহ পাকের বন্দেগীর শক্তি দান করবেন এবং তাদেরকে নেক আমল করার তওফিক দান করবেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ), হযরত হাসান বসরী (রঃ), সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ), মুজাহেদ (রঃ), যাহ্যাক (রঃ) এবং সুদ্দী (রঃ) প্রমুখ তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো মুশরেক অবস্থায় যে সব অন্যায় কাজ মানুষের দ্বারা হয়, ইসলাম গ্রহণের পর তার মোকাবেলায় আল্লাহ পাক নেক আমল করার তওফিক দান করেন। অর্থাৎ শেরক পরিবর্তন হবে তৌহিদ দ্বারা, পূর্বে মুশরেক অবস্থায় যে মোমেনর সাথে জেহাদ করত, ইসলাম গ্রহণের পর সে স্থলে কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদ করবে।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হলো, আল্লাহ পাক দয়া করে মুসলমানদের মন্দ কাজকে কেয়ামতের দিন নেক আমলে পরিবর্তন করে দেবেন। এ মতই ব্যক্ত করেছেন সাঈদ এবনে মুসায়্যেব (রঃ), মকহুল (রঃ), উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ), হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) এবং হযরত সালমান ফারসী (রাঃ)। তাঁরা এ বক্তব্যের সমর্থনে হযরত আবু জর (রাঃ) বর্ণিত হাদীস পেশ করেছেন। হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কেয়ামতের দিন এক ব্যক্তিকে

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৯০

হিসাবের জন্যে হাযির করা হবে। হুকুম করা হবে, এ ব্যক্তির ছোট ছোট গুনাহগুলো হাযির করা হোক। তখন ছোট ছোট গুনাহ তাকে দেখানো হবে। আর বড় বড় গুনাহকে গোপন রাখা হবে। সে ঐ ছোট ছোট গুনাহগুলো স্বীকার করবে এবং বড় গুনাহগুলোর ভয়ে ভীত থাকবে। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আদেশ হবে, প্রত্যেক গুনাহর বদলে তাকে নেকী দিয়ে দেয়া হোক। তখন সে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমার তো আরো কিছু গুনাহ রয়েছে যা এখানে দেখা যায় না। একথা বলার পর হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হাসলেন, এমনকি তাঁর দাঁতের মাড়ি পর্যন্ত দেখা গেল। (মুসলিম শরীফ)

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, ইসলাম কবুল করার কারণে মানুষ পাপাচার পরিহার করে এবং নেক আমল করে, অর্থাৎ আল্লাহ পাক গুনাহর স্থলে তাকে নেক আমলের তৌফিক দান করেন।

আতা এবনে আবি রবাহ (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো, আল্লাহ পাক মানুষের মন্দ চরিত্রকে পরিহার করিয়ে চরিত্র মাধুর্য অর্জনের তওফিক দান করেন।

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, কাফের অবস্থায় যারা মূর্তি পূজা করত ঈমান লাভের পর আল্লাহ পাক তাদেরকে তাঁর বন্দেগীর তওফিক দান করেন। যারা ইতিপূর্বে মোমেনদের বিরুদ্ধে জেহাদ করত, ঈমান লাভের পর তারাই কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। হযরত হাসান বসরী (রঃ)-ও অনুরূপ মত পোষণ করেছেন।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ এ আয়াতটির আরো ব্যাখ্যা করেছেন। যারা বিশুদ্ধ চিত্তে, পূর্ণ এখলাস বা আন্তরিকতার সঙ্গে তওবা করে, আল্লাহ পাক তাদের তওবায় এত সন্তুষ্ট হন যে তাদের গুনাহগুলোকে নেকী দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। এর কারণ এই যে, তওবা করার পর যখন পূর্বে কৃত পাপাচারের কথা তাঁদের স্মরণ হতো, তখন তাঁরা লজ্জিত হতেন এবং পরিণাম সম্পর্কে চিন্তিত হয়ে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করতেন। এজন্যে তাদের গুনাহগুলো নেকীতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। যদিও আমলনামায় তা গুনাহ বলে লিপিবদ্ধ থাকে, কিন্তু কেয়ামতের দিন (তওবা এস্তেগফারের কারণে) তা নেক আমলে রূপান্তরিত হবে।

হযরত সালমান (রাঃ) বর্ণনা করেন, মানুষকে যখন কেয়ামতের দিন আমলনামা দেয়া হবে, সে তা পাঠ করতে আরম্ভ করবে, শুরুতেই তার পাপাচারের কথা বর্ণিত থাকবে, যা দেখে সে নিরাশ হয়ে যাবে। এরপরই সে নিচের দিকে দৃষ্টিপাত করবে এবং তার নেক আমলের ফিরিস্তি দেখে কিছুটা আশ্বস্ত হবে। এরপর দ্বিতীয়বার উপরের দিকে দৃষ্টিপাত করে দেখবে যে, তার বদ আমলগুলো নেক আমলে রূপান্তরিত হয়ে গেছে।

হযরত মাআজ এবনে জবল (রাঃ) বর্ণনা করেন, চার প্রকার লোক জান্নাতে যাবে। (এক) মুত্তাকী পরহেযগার (দুই) আল্লাহ পাকের নেয়ামতের শোকর গুজার (তিন) আল্লাহ পাকের প্রতি ভয় পোষণকারী এবং (চার) আসহাবে ইয়ামীন অর্থাৎ যাদের ডান হাতে আমলনামা দেয়া হবে।

জিজ্ঞাসা করা হয়, তাদেরকে আসহাবে ইয়াসমীন কেন বলা হয়েছে? তিনি বললেন, এজন্যে যে তাদের দ্বারা নেক আমল বদ আমল সবই হয়েছিল, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদের ডান হাতে আমলনামা দান করেছেন। তারা তাদের বদ আমলের ফিরিস্তি দেখে বলবে, হে পরওয়ারদেগার! আমাদের নেকী কোথায়, এখানে তো সবই বদ আমল লিপিবদ্ধ রয়েছে। তখন আল্লাহ পাক তাদের মন্দ আমলগুলো দূর করে দেবেন এবং তার স্থলে নেক আমল লিখে দেবেন। তখন সে অত্যন্ত খুশী হয়ে নিজের আমলনামা অন্যদেরকে দেখাবে এবং বলবে, দেখ আমার আমলনামা।

ইমাম জয়নুল আবেদীন (রঃ) বলেছেন, পাপাচারগুলো নেক আমলে পরিণত হবে আখেরাতে। হযরত মকহুল (রঃ) একখানি হাদীস বর্ণনা করেছেন, একজন বৃদ্ধ ব্যক্তি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে হাযির হলো, সে আরজ করল, ইয়া রসূলাল্লাহ! আমি এমন এক ব্যক্তি, আমার দ্বারা সর্ব প্রকার গুনাহ হয়েছে। আমার গুনাহগুলো যদি সকল মানুষের মধ্যে বিতরণ করা হয়, তবে সকলেই আল্লাহর গজবে গ্রেফতার হয়ে যাবে। এখন আমার তওবার কোন ব্যবস্থা হতে পারে কি? তিনি এরশাদ করলেন, তুমি মুসলমান হয়ে যাও। সে সঙ্গে সঙ্গে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে ইসলাম কবুল করল। তখন তিনি এরশাদ করলেন, আল্লাহ পাক তোমার সমস্ত গুনাহ মাফ করে দেবেন, শুধু তাই নয়; বরং তোমার মন্দ কাজগুলো নেক আমলে পরিণত করে দেবেন। সে পুনরায় জিজ্ঞাসা করল, আমার সমস্ত গুনাহ মাফ হয়ে যাবে? তিনি এরশাদ করলেন, হ্যাঁ। তখন সে কলেমায়ে তৈয়্যেবা পাঠ করতে করতে বিদায় গ্রহণ করল।[১]

বর্ণিত আছে একজন স্ত্রীলোক হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর নিকট হাযির হয়ে বললো, আমার দ্বারা মন্দ কাজ হয়ে গেছে এবং একটি সন্তানও জন্মগ্রহণ করেছে, আমি তাকে মেরে ফেলেছি, এখন কি আমার তওবা কবুল হবে?

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বললেনঃ এখন আর তোমায় নয়ন মনের শান্তি আসবে না, আর আল্লাহ পাকের দরবারে তোমার তওবাও কবুল হবেনা, একথা শ্রবণ করে ঐ মহিলা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেল।

আমি ফজরের নামায প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাথে আদায় করেছি, এরপর তাঁর সমীপে এ ঘটনা বর্ণনা করি, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেনঃ তুমি অত্যন্ত মন্দ কথা বলেছ, তুমি কি কোরআনে করীমের এ আয়াত পাঠ করনি?

وَالَّذِيْنَ لَا يَدْعُوْنَ.....اِلَّا مَنْ تَابَ

আমি তখন অত্যন্ত দুঃখিত হলাম এবং উক্ত মহিলার নিকট গমন করে এ আয়াত সমূহ পাঠ করলাম, সে এ আয়াত শ্রবণ করে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে সেজদায় রত হলো। এরপর বললো, আল্লাহ পাকের শোকর, তিনি আমার নাজাতের একটা ব্যবস্থা করেছেন। (তিবরানী)

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৯১

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ)-এর প্রথম জবাব শ্রবণ করে আক্ষেপ করে সে বলেছিল এ সুন্দর আকৃতি কি দোযখের জন্যে বানানো হয়েছে? এখানে উল্লেখ্য, হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) যখন তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন, তখন তিনি উক্ত মহিলাকে সমগ্র মদীনা ও তার উপকণ্ঠে খুঁজলেন, কিন্তু কোথাও পাওয়া গেলনা। ঘটনাক্রমে সে ঐ রাতে পুনরায় হাযির হল, তখন তিনি তাঁকে সঠিক মাসআলা বর্ণনা করলেন এবং ঐ মহিলা আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে বলল যে তিনি আমার তওবা কবুল করার ব্যবস্থা করেছেন, একথা বলে সে তার বাঁদীটি আযাদ করে দিল। আল্লাহ্ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَنْ يَّعْمَلْ سُوْٓءًا اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهٗ

অর্থাৎ যে মন্দ কাজ করে অথবা নিজের প্রতি জুলুম করে, এরপর আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, তবে সে আল্লাহ্ পাককে অত্যন্ত ক্ষমাশীল এবং অতীব দয়াবান পাবে। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ يَعْلَمُوْٓا اَنَّ هُوَ اللّٰهَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ

"তারা কি জানেনা যে, নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক তওবা কবুল করেন"। আরো এরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ يٰعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

"যারা নিজেদের প্রতি জুলুম করেছে, (হে রসূল!) আমার সেই বন্দাদেরকে আপনি বলে দিন যে তারা যেন আমার রহমত থেকে নিরাশ না হয়"।

অর্থাৎ যে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করে, সে মাহরুম হয়না।[১]

একটি প্রশ্ন

প্রশ্ন হতে পারে গুনাহ বা পাপাচার আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বাধিক অপছন্দনীয় কাজ, এমন অবস্থায় কিভাবে গুনাহ সওয়াবে পরিণত হবে?

জবাব

আল্লাহ্ পাকের নেক বন্দাদের দ্বারা যদি তকদীরে এলাহী মোতাবেক কোন গুনাহ হয়ে যায় তবে তাঁরা অত্যন্ত লজ্জিত, অনুতপ্ত হন, নিজেদেরকে একান্ত অপমানিত মনে করেন এবং অনতিবিলম্বে আল্লাহ্ পাকের মহান দরবারে তওবা এস্তেগফার করে, কান্নাকাটি করতে থাকেন এবং আল্লাহ্ পাকের আযাবকে ভয় করেন, আর ক্ষমাপ্রার্থী হতে থাকেন, তখন তাদের প্রতি আল্লাহ্ পাকের রহমত ও করুণা-বৃষ্টি হতে থাকে, আর তা

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-২০-২২
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮১

এতো বেশী হয় যে, যদি তাদের দ্বারা ওই গুনাহ না হতো আর তারা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়ে এমন কান্নাকাটা না করতেন, তবে তাঁদের প্রতি এমন রহমত নাযিল হতো না এবং এ উচ্চ মর্তবায়ও তারা পৌঁছতে পারতেন না।

মূলতঃ গুনাহ হলো আযাবের কারণ। কিন্তু অনুতাপ ও ক্ষমা প্রার্থনার কারণে অবশেষে তা সওয়াবের কারণ হয়ে যায়। আর এ অর্থেই হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যদি তোমাদের দ্বারা গুনাহ না হয় তবে আল্লাহ পাক তোমাদের স্থলে এমন লোক নিয়ে আসবেন যাদের দ্বারা গুনাহ হবে এবং তারা বিশুদ্ধ অন্তরে তওবা করবে, এরপর আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করবেন। (মুসলিম শরীফ)

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছিলেন, তোমরা মায়েজ এবনে মালেকের জন্যে মাগফেরাতের দোয়া করো, সে এমন তওবা করেছে যদি তা একটি দলের মধ্যে বিতরণ করা হয় তবে ঐ তওবা সকলকে পরিবেষ্টন করে ফেলবে অর্থাৎ সকলের মাগফেরাতের জন্যে যথেষ্ট হবে।

হযরত মায়েজ (রাঃ) একজন সাহাবী ছিলেন। তাঁর দ্বারা ব্যভিচারের অপরাধ হয়ে গেছে। তিনি নিজে হাযির হয়ে অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর প্রতি শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি বিধানের দরখাস্ত করেছেন। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিভিন্নভাবে কথাটি জিজ্ঞাসা করেছেন, তারপরও তিনি চারবার নিজের অপরাধ স্বীকার করেছেন এবং তাঁর শাস্তি বিধানের জন্য আরজী পেশ করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদেশক্রমে তাঁকে শরীয়ত মোতাবেক শাস্তি প্রদান করা হয়।

وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

আর আল্লাহ পাক অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান, যেহেতু তিনি দয়াবান, যেহেতু তিনি করুণাময় তাই বন্দাগণকে তিনি দয়া করে ক্ষমা করে থাকেন।

وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا

"যে কেউ তওবা করে এবং নেক আমল করে সে সম্পূর্ণরূপে আল্লাহর অভিমুখী হয়"।

যারা কাফের ছিল, পরে ইসলাম গ্রহণ করেছে তাদের কুফরী জীবনের পাপাচার সম্পর্কেই পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে। আর আলোচ্য আয়াতে সে সব লোকদের গুনাহ থেকে তওবা করার কথা বলা হয়েছে যারা মুসলমান অবস্থায় পাপকার্যে লিপ্ত হয়েছে, এক কথায় বলা যায়, পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরের তওবার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে মোমেনের তওবার উল্লেখ রয়েছে। মোমেন বন্দার দ্বারা কোন গুনাহ হলে সঙ্গে সঙ্গে সে যদি আল্লাহ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে এবং কৃত অন্যায়ের জন্যে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হয়, আর বদ আমল ছেড়ে দিয়ে নেক আমল করে, তবে সে আল্লাহ পাকের দিকেই ফিরে আসে, আর যে আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসে, তাঁর দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়, আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করেন। আল্লাহ পাকের দিকে ফিরে আসার তাৎপর্য হলো পাপাচার পরিহার করে নেক আমলে মশগুল হওয়া।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পূর্ববর্তী আয়াতে যে সব গুনাহ থেকে তওবা করার কথা ছিল, আলোচ্য আয়াতে তা ব্যতীত অন্য গুনাহ থেকে তওবা করার কথা রয়েছে।

কিন্তু অন্য এক দল তত্ত্বজ্ঞানীর মতে, এ আয়াতে সর্ব প্রকার গুনাহ থেকেই তওবা করার কথা বলা হয়েছে। একথার অর্থ হলো যে ব্যক্তি তওবা করার ইচ্ছা করে তার কর্তব্য হলো, শুধু আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সর্ব প্রকার গুনাহ থেকে তওবা করা। যে এভাবে তওবা করবে, তার তওবা আল্লাহ পাকের দরবারে কবুল হবে।

وَالَّذِيْنَ لَا يَشْهَدُوْنَ الزُّوْرَ

আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাগণ কখনো মিথ্যা কথা বলে না, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না, পাপকার্যে লিপ্ত হয়না, গান-বাজনা সহ যাবতীয় পাপের আসর থেকে দূরে থাকে, অহেতুক কাজে মনযোগ দেয়না।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে زور শব্দটি দ্বারা শেরক উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যারা শেরক করেনা। আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে মরদবিয়া হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, মদীনা মোনাওয়্যারায় 'জুর' নামক একটি মূর্তি ছিল, কাফের মুশরেকরা তার সম্মুখে খেলা-ধুলা করত, সাহাবায়ে কেরাম যখন ঐ স্থানটি অতিক্রম করতেন, তখন তাঁরা ঐ খেলা-ধূলার আসরের দিকে দৃষ্টিপাতও করতেন না, তাই পরবর্তী আয়াতাংশে এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَا مَرُّوْا بِاللَّغْوِ مَرُّوْا كِرَامًا

অর্থাৎ তারা ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে যায়, ঐ মূর্তির দিকে বা খেলা-ধূলা, গান-বাজনার আসরের দিকে ভ্রুক্ষেপও করতো না।

ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য বাক্যটির অর্থ হলো, প্রকৃত মোমেনগণ বাতিলপন্থীদের সঙ্গে কোন প্রকার সহযোগিতা করেনা। তাদের দিকে কখনো আকৃষ্ট হয়না। আর এবনে আবি হাতেম তফসীরকার একরামা (রঃ)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে, 'জুর' শব্দের অর্থ হলো, অজ্ঞতার যুগের খেলা-ধূলা। এবনে আবি হাতেম হযরত হাসান বসরী (রঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে এর অর্থ হলো, তারা গান-বাজনার আসরের কাছেও যেতো না।

মুজাহেদ (রঃ) আলোচ্য বাক্যটির ব্যাখ্যায় বলেছেন, এর অর্থ হলো গান-বাজনার আসর। প্রকৃত মুসলমান গান-বাজনার আসরে যায় না।[১]

ইমাম তাবারী (রঃ) যাহ্যাক (রঃ), এবনে যায়েদ (রঃ) সহ অন্যান্য তফসীরকারগণের কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তাঁর মতে 'জুর' অর্থ মিথ্যা, অর্থাৎ প্রকৃত মোমেন মিথ্যা কথা বলেনা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়না। ইমাম তাবারী (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু

[১]। তফসীরে আদদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৮৮

এ শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করা হয়েছে, তাই আলোচ্য আয়াতের অর্থ হলো প্রকৃত মোমেন কখনো কোন প্রকার অসত্য কাজে অংশ গ্রহণ করে না, কোন শেরকী কাজের কাছেও যায় না। গান-বাজনা, খেলা-ধূলায় অংশ গ্রহণ করে না, মিথ্যা কথা বলেনা, মিথ্যা স্বাক্ষ্য দেয়না। যারা এসব কাজে লিপ্ত হয়, তাদেরকে পাশ কাটিয়ে চলে।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেনঃ আলী এবনে তালহা (রঃ)-এর মতে, 'জুর' শব্দটির অর্থ হলো মানুষের বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত ওমর (রাঃ) বলেছেন, মিথ্যা স্বাক্ষ্য দাতাকে চল্লিশটি বেত্রাঘাত কর এবং মুখে চুন-কালি মেখে বাজার প্রদক্ষিণ করাও। হযরত ওমর (রাঃ) সিরিয়ার সরকারী কর্মকর্তাদেরকে এ আদেশ লিখে পাঠিয়েছিলেন।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর এ আদেশের কারণেই ইমাম মালেক (রঃ), ইমাম শাফেয়ী (রঃ), ইমাম আবু ইউসুফ (রঃ), ইমাম মোহাম্মদ (রঃ) বলেছেন, মিথ্যা স্বাক্ষ্য দাতাকে বেত্রাঘাত করা হোক এবং জনগণের সম্মুখে হাযির করা হোক, যাতে করে লোকেরা যেন মিথ্যা স্বাক্ষী হিসেবে তার পরিচয় পায়।

এ পর্যায়ে ইমাম মালেক (রঃ) এ বাক্যটি সংযোজন করেছেন যে, মিথ্যা সাক্ষ্য দাতাকে মসজিদে এবং বাজারে যেন হাযির করা হয়।

ইমামগণ বলেছেন, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ। বোখারী শরীফে হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি কি তোমাদেরকে বলবো সবচেয়ে বড় গুনাহ কোন্‌টি? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি এরশাদ কররেন, আল্লাহর সাথে শেরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হেলান দিয়ে বসেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন এবং এরশাদ করলেনঃ শোন মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এ কথাটিকে এতবার বললেন যে, আমরা মনে মনে বলতে লাগলাম যদি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আর এ সম্পর্কে তাগিদ না করেন, তবে ভাল হয়।

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

"আর তারা যখন খেলাধূলার পার্শ্ব দিয়ে যায়, তখন তারা ভদ্রভাবে পাশ কাটিয়ে যায়"।

হাসান বসরী (রঃ) এবং কালবী (রঃ) বলেছেন, প্রকৃত মোমেনগণ কখনো পাপকার্যের আসরে যাতায়াত করেনা, কিন্তু যদি কখনো ঘটনাচক্রে এমন স্থান অতিক্রম করতে হয়, তবে সেদিক থেকে বিমুখ হয়ে দ্রুতবেগে সে স্থান পরিত্যাগ করে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, কাফেররা যখন মুসলমানদেরকে কষ্টদায়ক কথা বলতো, তখন তারা তাদের থেকে বিমুখ হয়ে চলে

যেতেন, তাদের সঙ্গে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতেন না। মুজাহেদ (রঃ)-ও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

وَالَّذِيْنَ اِذَا ذُكِّرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ

"আর যখন তাদেরকে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শন সমূহ সম্পর্কে বোঝানো হয়, তখন তারা তাতে বধির এবং অন্ধ হয়ে থাকে না"।

অর্থাৎ যখন তাদেরকে উপদেশ দেয়া হয় এবং পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন তারা বধির এবং অন্ধের মত হয়ে থাকে না; বরং সত্য কথা শ্রবণ করে, গ্রহণ করে, সত্য উপলব্ধি করে। তারা পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ শ্রবণ করে চিন্তা-চর্চা করে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে সেজদারত হয়। অন্ধ এবং বধিরকে কোন ভাল কথা বললে যেমন তার প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, ঠিক তেমনি কাফেরদের উপরও কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ শ্রবণের কোন প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়না, ক্ষেত্র বিশেষে তাদের কুফরী ও নাফরমানী বৃদ্ধি পায়। কেননা, কাফেররা প্রকৃতপক্ষে অন্ধ এবং বধিরদের মতই, তারা সত্যকে দেখেও না এবং শ্রবণও করেনা অর্থাৎ তাদেরকে যখন কোরআনে করীমের আয়াত পাঠ করে শোনানো হয়, তখন কাফের মুশরেকরা অন্ধ, বধিরের মত হয়ে থাকে, অথচ আল্লাহর প্রকৃত বন্দাগণ কোরআনে করীমের আয়াত সমূহ গভীর মনোযোগের সাথে শ্রবণ করে, কখনও এ ব্যাপারে উদাসীন হয় না।

وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ

আর যারা বলে, "হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দান করুন নয়ন জুড়ানো স্ত্রী এবং সন্তান-সন্ততি"।

অর্থাৎ মোমেনগণ শুধু যে নিজেরা উন্নত আদর্শের অধিকারী হয় তাই নয়; বরং তাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা এবং চেষ্টা থাকে যেন তাদের স্ত্রী পুত্র, পরিবারবর্গও আল্লাহ পাকের প্রিয় এবং পছন্দনীয় হয় তথা-নেককার পরহেযগার হয়, তারাও যেন আল্লাহ পাকের এবাদত বন্দেগীতে মশগুল হয়, তাহলেই তারা মনের শান্তি পায়।

وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

"এবং আমাদেরকে পরহেযগার লোকেদের অগ্রদূত করুন"।

বস্তুতঃ যখন সন্তানরা তাকওয়া পরহেযগারীর গুণ অর্জন করবে তখন মোমেনদের ইমাম এবং অগ্রনায়ক হবে, তাদের পথ প্রদর্শক হবে, এভাবে তারা জীবনে উন্নতি ও অগ্রগতি লাভ করবে।

اُولٰٓئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوْا وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا

(তারাই সে সব লোক যারা নিজেদের সবরের ফলে লাভ করবে বেহেশতের বালাখানা এবং ফেরেশতাগণ সেখানে দোয়া ও সালাম বলে তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাবে)

যেহেতু তারা দুনিয়ার জীবনে সবর অবলম্বন করেছে, ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে কঠোর পরিশ্রম করেছে, তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে আখেরাতে জান্নাতের উচ্চ মর্তবা দান করবেন।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতবাসীগণ তাদের নিজেদের চেয়ে উচ্চ মর্তবায় আসীন লোকদেরকে এভাবে দেখবেন, যেভাবে তোমরা আসমানে মেঘে ঢাকা তারকারাজিকে দেখ। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করেন, ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ অবস্থাতো আম্বিয়ায়ে কেরামের হবে, অন্য মানুষতো সেখানে পৌঁছতে পারবেনা। তিনি এরশাদ করলেনঃ কেন নয়? শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার, যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, যারা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনবে এবং নবী রসূলগণকে সত্য জানবে, তারা এ মর্তবায় পৌঁছতে পারবে।

আহমদ, হাকেম এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে, তিরমিজি হযরত আলী (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ জান্নাতের ভেতর এমন বালাখানাও থাকবে যেগুলোর ভেতরের অবস্থা বাইরে থেকে এবং বাইরের অবস্থা ভেতর থেকে দেখা যাবে।

সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেনঃ ইয়া রসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম! এ বালাখানাগুলো কাদের জন্যে? তখন তিনি এরশাদ করেনঃ যাদের কথা-বার্তা হয় পবিত্র, যারা দারিদ্র্য-প্রপীড়িত মানুষকে আহার করায়, আর যখন অন্য লোকেরা থাকে ঘুমের ঘোরে, তখন তারা থাকে নামাযে দন্ডায়মান (তাদের জন্যে এসব বালাখানা)।

অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের দরবারে আরজ করা হয়, পবিত্র কথাবার্তা দ্বারা কি উদ্দেশ্য? তিনি এরশাদ করেনঃ সুবহানাল্লাহ, ওয়ালহামদুলিল্লাহ, ওয়া লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, ওয়াল্লাহু আকবর। এ পবিত্র বাক্যগুলোর পাঠকগণ যখন কেয়ামতের দিন হাযির হবে, তখন এ বাক্যগুলো তাদের অগ্র পশ্চাতে থাকবে এবং তাদের নাজাতের কারণ হবে।

হযরত যাবের এবনে আবদুল্লাহ (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের বালাখানাগুলো সম্পর্কে কিছু বলবো না? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, অবশ্যই। তখন তিনি এরশাদ করলেনঃ জান্নাতের মধ্যে কিছু বালাখানা এমনও রয়েছে যা হীরা পান্না দ্বারা সুসজ্জিত। তা এত স্বচ্ছ হবে যে বাইর থেকে ভেতরের এবং ভেতর থেকে বাইরের নেয়ামত সমূহ দেখা যাবে। এ স্বাদ, সম্মান এবং এর অসাধারণ নেয়ামত সমূহ এমন হবে যা কোন চক্ষু কখনো দেখেনি, আর কোন কর্ণ কখনো শ্রবণ করেনি। আমরা আরজ করলাম ইয়া রসূলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! এ ইমারত সমূহ কাদের জন্যে হবে? তিনি এরশাদ করলেন, যারা সালামের প্রসার ঘটায়, মানুষকে আহার করায়, সর্বদা রোজা রাখে, রাত্রিকালে এমন সময় নামায আদায় করে যখন অন্য লোকেরা নিদ্রিত থাকে। আমরা আরজ করলাম, এমন কাজ করার শক্তি কার আছে? আল্লাহর রসূল বললেনঃ আমার উম্মতের সে শক্তি আছে। আমি তার বিস্তারিত বিবরণ তোমাদেরকে দিচ্ছি, "যে

নিজের ভাই মুসলমানের সঙ্গে মোলাকাত করে এবং তাকে সালাম দেয় আর সে সালামের জবাব দেয়, ঐ ব্যক্তি সালামের প্রসার ঘটায়। আর যে ব্যক্তি তার নিজের পরিবারবর্গের উদর পূর্ণ আহার করায়, সে মানুষকে আহার করায়, আর যে রমজানে রোযা রাখে এবং এরপর প্রত্যেক মাসে তিনদিন অর্থাৎ চান্দ্র মাসের তের চৌদ্দ পনের তারিখ রোজা রাখে, সে যেন সর্বদা রোজা রাখে। আর যে এশা এবং ফজরের নামায জামাতের সঙ্গে আদায় করে, সে যেন রাত্রির এমন সময় নামায আদায় করে, যখন ইহুদী, খৃষ্টান এবং অগ্নি পূজকরা নিদ্রিত থাকে।

وَيُلَقَّوْنَ فِيْهَا تَحِيَّةً وَّسَلٰمًا

"আর ফেরেশতাগণ সেখানে দোয়া ও সালাম বলে তাদের সম্বর্ধনা জানাতে আসবে"।

অর্থাৎ ঐ ইমারত সমূহে ফেরেশতাগণ তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাবে এবং তাদের শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করবে। অথবা এর অর্থ হলো, সর্বদা শান্তি এবং নিরাপত্তা লাভের ব্যাপারে ফেরেশতাগণ তাদেরকে সুসংবাদ জানাবে।

তফসীরকার কালবী (রঃ) বলেছেন। এ আয়াতাংশের অর্ধ হলো জান্নাতবাসীগণ পরস্পর একে অন্যকে সালাম দেবে। আর আল্লাহ পাকের তরফ থেকেও তাদেরকে সালাম পৌঁছানো হবে। আহমদ, বাজ্জার এবং এবনে হাব্বান হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, আল্লাহ পাকের সৃষ্টির মধ্যে জান্নাতে সেই মোহাজেরগণ প্রবেশ করবে যাদের মাধ্যমে (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্তের হেফাজত করা হয়। আর তাদেরই কারণে মুসলিম সমাজ দুশমনের আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে, তাদের নিজেদের অনেক প্রয়োজনের কথা এবং আকাঙ্ক্ষা মনে রেখেই তারা মৃত্যুবরণ করে, আর সমগ্র জীবন তাদের ঐ আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করতে পারেনা। আল্লাহ পাক ফেরেশতাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা আদেশ দেবেন, যাও, তাদেরকে সালাম কর (তাদেরকে সম্বর্ধনা জানাও)। ফেরেশতাগণ আরজ করবে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তোমার আসমানের অধিবাসী এবং তোমার সৃষ্টির মধ্যে আমরা বিশেষভাবে সম্মানিত। এরপরও তুমি আমাদেরকে আদেশ দাও যে আমরা তাদের নিকট হাযির হই এবং তাদেরকে সালাম দেই। আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন, এরা সে সব লোক যারা শুধু আমারই এবাদত করত, আমার সাথে কোন কিছুকে শরীক করত না এবং তাদের দ্বারাই (ইসলামী রাষ্ট্রের) সীমান্তের হেফাজত করা হতো আর তাদের কারণেই বিপদাপদ থেকে আত্মরক্ষা করা যেত, কিন্তু এমন অবস্থায় তারা মৃত্যুবরণ করত যে, তাদের মনের আকাঙ্ক্ষা মনেই থেকে যেত। তখন ফেরেশতাগণ বেহেস্তে প্রবেশ করে বলবে,

سَلٰمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ

দুনিয়ার জীবনে তোমরা যে সবর অবলম্বন করেছ, তার বিনিময়ে তোমাদের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, কত উত্তম এ শুভ পরিণতি! خٰلِدِيْنَ فِيْهَا আর এ আনন্দ, শান্তি, নিরাপত্তা সাময়িক হবে না; বরং জান্নাতবাসীগণ চিরদিন সেখানে বাস করবে।

حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا

"আর অবস্থান করার জন্যে তা অতি উত্তম স্থান"।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) এবং হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীস মুসলিম শরীফে সংকলিত হয়েছে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ (জান্নাতবাসীগণের উদ্দেশ্যে) একজন ঘোষক ঘোষণা করবে, তোমরা চিরদিন সুস্থ থাকবে, কখনও অসুস্থ হবেনা, তোমাদের জীবন চিরস্থায়ী, আর কখনও মৃত্যু আসবেনা, তোমরা চির যৌবন লাভ করবে, কখনও বৃদ্ধ হবেনা, তোমরা সর্বদা সুখে শান্তিতে থাকবে, কখনও দুঃখী হবে না।[১]

قُلْ مَا يَعْبَؤُا بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَآؤُكُمْ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, যদি তোমরা আমার প্রতিপালককে না-ও ডাক, তবু তিনি আদৌ তোমাদের পরোয়া করেন না, তোমরা অস্বীকার করেছ, পরিণামে অচিরেই নেমে আসবে তোমাদের উপর অপরিহার্য শাস্তি"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দাদের বৈশিষ্ট্য এবং গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে এবং তাদের শুভ পরিণতির ঘোষণাও দেয়া হয়েছে যে, তারা চিরদিন জান্নাতে বাস করবে এবং আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করতে থাকবে। ফেরেশতাগণ তাদেরকে অভিবাদন জানাবে।

আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক তাঁর রসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়নি; বরং প্রতি পদক্ষেপে আপনার বিরোধিতা করেছে এবং মুসলমানদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করেছে, তাদেরকে আপনি সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিন যে তোমরা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন বা না আন, তাঁর এবাদত কর বা না কর, তাঁর অনুগত হও বা অবাধ্য, তাতে আল্লাহ পাকের কিছুই যায় আসেনা। তিনি আদৌ তোমাদের কোন পরোয়া করেন না। যেহেতু তোমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদকে অস্বীকার করেছ, তাঁর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ, তাই তোমাদের শাস্তি অনিবার্য, তোমাদের পরিণাম ভয়াবহ।

এরশাদ হয়েছেঃ قل (হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, আমার প্রতিপালক তোমাদের এতটুকু পরোয়া করেন না, যদি তোমরা তাঁর প্রতি ঈমান না আন, অথবা তাঁর এবাদত না কর।

আলোচ্য আয়াতের دُعَآء (দোয়া) শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

১. ঈমান অর্থাৎ যদি তোমরা ঈমান না আন।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০১-০৩

২. এবাদত, অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের এবাদত না কর।

৩. দোয়া, যদি তোমরা বিপদগ্রস্ত অবস্থায় দোয়া না কর তথা কাকুতি-মিনতি না কর।

৪. শোকর গুজারী অর্থাৎ যদি তোমরা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ না হও, তবে আল্লাহ পাক তোমাদের এতটুকু পরোয়া করেন না। অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَذَابِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ وَاٰمَنْتُمْ

"আল্লাহ পাক তোমাদের শাস্তি দিয়ে কি করবেন যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও এবং ঈমান আন"।

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَامًا

"যেহেতু তোমরা সত্যের আহবানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, তাই অদূর ভবিষ্যতে তোমরা তার ভয়াবহ পরিণতি অবশ্যই ভোগ করবে"।

তফসীরকারগণ এ বাক্যটির একাধিক ব্যাখ্যা করেছেন। অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে তোমাদেরকে তাঁর তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের এবং তাঁর এবাদতের আহ্বান জানিয়েছেন, কিন্তু তোমরা সেই আহ্বানে সাড়া দিতে অস্বীকৃতি জানিয়েছ এবং আমার রসূলকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। অতএব, তোমাদের শাস্তি অনিবার্য।

অথবা এর অর্থ হলো, এ অবস্থায় তোমাদেরকে শাস্তি দিতে তিনি আদৌ কোন পরোয়া করবেন না। অথবা এর অর্থ হলো, যেহেতু তোমরা আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করেছ, তাই এর অনিবার্য শাস্তি থেকে কোন প্রকারেই তোমাদের অব্যাহতি হবে না।

অথবা এর অর্থ হলো, এই শাস্তি তোমাদেরকে পরিবেষ্টন করে রাখবে। অথবা এর অর্থ হলো, তোমরা যেহেতু তৌহিদ এবং রেসালতকে অস্বীকার করেছ, তাই তোমাদের শাস্তি অবধারিত, তোমাদের অপরাধ তোমাদের দোযখে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণে হবে।

আলোচ্য আয়াতের لزاما শব্দটির একাধিক ব্যাখ্যা বর্ণিত হয়েছে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যা করেছেন 'মৃত্যু'।

আবু ওবায়দা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো 'ধ্বংস'। এবনে যায়েদ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হত্যা।

এবনে জরীর (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো 'এমন শাস্তি যা কখনো শেষ হবে না'।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ), হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো 'বদরের দিনের শাস্তি'। এ জেহাদে ৭০ জন কাফের নিহত হয়, সম সংখ্যক বন্দী হয়, আর নিহত হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদেরকে আখেরাতের আযাব পাকড়াও করে।

ইমাম বোখারী (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, পাঁচটি জিনিস হয়ে গেছে।

(এক) ধুম্র যা আসমানে দেখা গেছে।

(দুই) চন্দ্র যা দ্বিখন্ডিত (হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অঙ্গুলির ইশরায়) হয়েছে।

(তিন) রুম ভূলুণ্ঠিত হয়েছে।

(চার) কাফেরদেরকে শক্তভাবে ধরা।

(পাঁচ) لزام অর্থাৎ বদরের যুদ্ধে কাফেরদের নেতারা নিহত হয়েছে। কোন কোন তফীরকার বলেছেন, لزام শব্দটি দ্বারা আখেরাতের শাস্তিকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, দুনিয়াতে তোমাদের শাস্তি তো হবেই, অধিকন্তু তোমাদের আখেরাতের শাস্তি হবে চিরস্থায়ী।[১]

আ'মালুল কোরআন

যদি কেউ এ আয়াত

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

পর্যন্ত প্রত্যেক নামাযের পর একবার পাঠ করে তবে তার স্ত্রী পুত্র পরিবার দ্বীনদার হবে। বলেছেনঃ হযরত মওলানা থানবী (রঃ)।

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ১৭/১/৯৪ইং তারিখ মোতাবেক ৪ শা'বান, ১৪১৪ হিজরী রোজ সোমবার আল্লাহ পাকের রহমতে সূরা ফোরকানের তফসীর সুসম্পন্ন হলো। হে আল্লাহ! এ সাধনাকে কবুল কর এবং এ তফসীরকে পরিপূর্ণ করার তওফিক দান কর, আমীন।

وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০৩-০৪
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১১৬-১৭
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩৫-৩৬
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা শুআরা

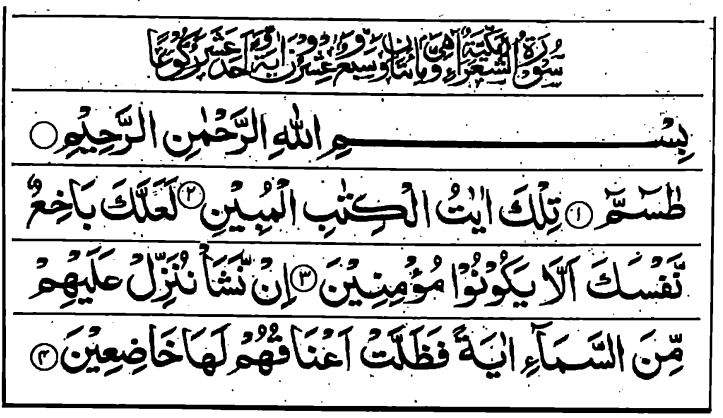
سُوْرَةُ الشُّعَرَاءِ مَكِّيَّةٌ وَهِيَ مِائَتَانِ وَسَبْعٌ وَعِشْرُوْنَ اٰيَةً وَاَحَدَ عَشَرَ رُكُوْعًا

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰسٓمٓ ① تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ ② لَعَلَّكَ بَاخِعٌ
نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ ③ اِنْ نَّشَاْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ
مِّنَ السَّمَآءِ اٰيَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خٰضِعِيْنَ ④

সূরা শুআরা প্রসঙ্গে

সূরা শুআরা মক্কায় অবতীর্ণ (৪খানি আয়াত ব্যতীত), রুকু-১১ আয়াত ঃ ২৭৭।

নামকরণ

যেহেতু এ সূরায় কবিদের সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে, তাই আলোচ্য সূরার এ নামকরণ করা হয়েছে। তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, কবিদের আলোচনা এজন্যে করা হয়েছে যেন তাদের মধ্যে এবং আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে তা প্রকাশ করা যায়। আম্বিয়ায়ে কেরাম মানব জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত হন, পক্ষান্তরে কবিরা শুধু সাময়িকভাবে কোন কোন মানুষকে আনন্দ দিতে পারে।

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরায় কাফের মুশরেকদের তরফ থেকে উত্থাপিত প্রশ্ন সমূহের জবাব দেয়া হয়েছে। যেহেতু কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতকে অস্বীকার করত, তাই তিনি আন্তরিকভাবে ব্যথিত হতেন। তাঁর এ আকাঙ্ক্ষা হতো, যদি তারা ঈমান আনতো তবে কত ভাল হতো! তাই এ সূরার শুরুতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে একথা বলে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) যদি এ কাফের মুশরেকরা ঈমান না আনে, তবে কি আপনি তাদের চিন্তায় নিজেকে ধ্বংস করে দেবেন? এরপর কয়েকজন বিখ্যাত নবী রসূলের বর্ণনা রয়েছে এবং তাঁদের উম্মতীরা তাঁদের সাথে কী আচরণ করেছে তার উল্লেখ করে এরশাদ হয়েছে যে, অবাধ্য কাফেরদের অন্যায় আচরণ নতুন কোন বিষয় নয়; পূর্বকালের আম্বিয়ায়ে কেরামের সাথেও এমন অন্যায় আচরণ করা হয়েছে যা তাদের ধ্বংসের কারণ হয়েছে।

এ সূরার শুরুতে আল্লাহ্ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যত ও রেসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ পবিত্র কোরআনের উল্লেখ করেছেন। কেননা, পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের সুস্পষ্ট দলিল এবং জ্বলন্ত প্রমাণ। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সান্ত্বনার জন্যে এবং তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকারকারীদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে সাত জন পয়গম্বরের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এরপর পবিত্র কোরআনের সত্যতার কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোবারক ক্বলবে নাযিল করা হয়েছে। এরপর একথাও এরশাদ হয়েছে যে, এ মহান গ্রন্থ সম্পর্কে আহলে কেতাবের জ্ঞানী ব্যক্তিরা সম্পূর্ণ অবগত, তারা খুব ভাল করেই জানে যে এটি আল্লাহ্ পাকের ওহী, কাব্য নয়, যাদু নয়, বরং স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ্ পাকের মহান বাণী যা দ্বারা সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পায় এবং যাতে রয়েছে মানব জাতির সার্বিক কল্যাণ। কাব্য এবং যাদূর সঙ্গে এর কোন সম্পর্কই নেই।[১]

এ সূরার ফজিলত

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

طٰسٓمٓ طٰهٰ حٰمٓ

দ্বারা যে সব সূরা শুরু করা হয়েছে, তা আমাকে হযরত মূসা (আঃ)-এর তখতি থেকে দেয়া হয়েছে।[২]

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্নে দেখে যে সে এ সূরা তেলাওয়াত করছে তবে তার তাৎপর্য হবে এই, যদিও তার আর্থিক সংকট থাকবে, কিন্তু তাকে সর্বদা মিথ্যা এবং অহেতুক কথা থেকে হেফাজত করা হবে।

তরজমা

পরম করুণাময় অসীম দয়ালু আল্লাহ্ পাকের নামে (শুরু করছি)।

(১) তোয়া-সীন-মীম।

(২) এ আয়াত সমূহ সুস্পষ্ট কিতাবের।

(৩) (হে রসূল!) তারা মোমেন হয়না বলে আপনি কি নিজেকে শ্বাসরুদ্ধ করে মেরে ফেলবেন?

(৪) আমি ইচ্ছা করলে তাদের উপর আসমান থেকে এমন এক নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার ফলে তার সম্মুখে তাদের গ্রীবা নত হয়ে পড়বে।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৬
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০৫

তফসীরুল কোরআন

শানে নুযুল

মক্কাবাসীরা যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মিথ্যাজ্ঞান করে এবং তাঁকে আল্লাহর রসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানায়, তখন তাদের এ আচরণ তাঁর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের একান্ত আকাঙ্ক্ষা ছিল যেন মক্কাবাসী ঈমানদার হয়ে যায়। সম্ভবতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মক্কাবাসীর ঈমান না আনার কারণে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন এজন্যে যে, হয়তো আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন। তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে সান্ত্বনা দিয়েছেন যে, তারা ঈমান আনেনা দেখে আপনি দুঃখিত হবেন না, আপনি কি তাদের দুশ্চিন্তায় নিজেকে শেষ করে দেবেন?

طسم আল্লামা বগভী একরামা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেনঃ ওলামায়ে কেরাম এ অক্ষরগুলোর ব্যাখ্যা করতে অপারগ।

আলী এবনে তালহা (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণিত আছে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এটি হল শপথ, আল্লাহ পাকের নাম দ্বারা তিনি শপথ করেছেন কেননা, এ শব্দটি আল্লাহ পাকের নাম সমূহের অন্যতম। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, এটি হলো পবিত্র কোরআনের অন্যতম নাম। মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) বলেছেন, ط এর অর্থ হল কুদরত বা শক্তি। আর س অর্থাৎ নূর এবং م অর্থাৎ مجد বা শ্রেষ্ঠত্ব।

অতএব, এ অক্ষরগুলোর দ্বারা আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম ক্ষমতা, তাঁর নূর এবং তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অক্ষরগুলো অন্যান্য 'মোকাত্তাআতের' ন্যায় আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মধ্যে একটি রহস্য ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

تِلْكَ অর্থাৎ এই সূরা বা কোরআনের

اٰيٰتُ الْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ

এ আয়াত সমূহ অলৌকিক গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের, যা দিবালোকের মত সুস্পষ্ট, সকলের নিকট উন্মুক্ত, যা হক্ব ও বাতিলের বিধি-নিষেধ বর্ণনাকারী।

لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ اَلَّا يَكُوْنُوْا مُؤْمِنِيْنَ

"(হে রসূল!) মক্কাবাসী কাফেররা কেন ঈমান লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে না, এ দুঃখে কি আপনি নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবেন"?

মূলতঃ কোন আপন লোককে যদি কেউ জ্বলন্ত অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হতে দেখে, তখন স্বাভাবিকভাবেই তার মন অত্যন্ত ব্যথিত হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যখন দেখতেন যে মক্কাবাসীরা দোযখের ইন্ধনে পরিণত হতে যাচ্ছে, তাদের জীবন-ধারা তাদেরকে

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্টা-৫০৫
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৩৭

ভয়াবহ পরিণতির দিকে নিয়ে যাচ্ছে, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের ব্যাপারে অত্যন্ত ব্যথিত হতেন, বিশেষতঃ যেহেতু আল্লাহ পাক তাঁকে রহমতুললিল আলামীন রূপে প্রেরণ করেছেন, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্যে তিনি রহমত তথা দয়া মায়ার প্রতীক রূপে আগমন করেছেন, তাই হতভাগা কাফেরদের ভবিষ্যত চিন্তা করে তিনি ব্যথিত হতেন, তাঁর অন্তর মানুষের প্রতি দয়ামায়ায় পরিপূর্ণ ছিল, তাদের শোচনীয় পরিণামের প্রতি লক্ষ্য করে তিনি অত্যধিক দুঃখবোধ করতেন।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়েছেন এভাবে (হে রসূল!) তাদের প্রতি আপনার স্নেহ মায়া রয়েছে অত্যধিক, কিন্তু এর একটি সীমাও রয়েছে, আপনি সস্নেহে তাদেরকে সত্য গ্রহণের জন্যে আহ্বান জানিয়েছেন, সত্য-অসত্যের মধ্যকার পার্থক্য হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ দিয়েছেন, সত্য গ্রহণের শুভ পরিণতি এবং বাতিলপন্থী হওয়ার ভয়াবহ পরিণতি উভয়টিই তাদের নিকট ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু এটি তাদের দুর্ভাগ্য যে কাফেররা আপনার আহ্বানে সাড়া দেয়নি, তারা সরল সঠিক পথ গ্রহণ করেনি এমন অবস্থায় তাদের জন্যে ব্যথিত হয়ে আপনি প্রাণ দিতে পারেন না, তাদের জন্যে এখন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়া বৃথা, কেননা কোন লোককে হেদায়েতের জন্যে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় নয়, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

إِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ

"আমি ইচ্ছা করলে তাদের উপর এমন নিদর্শন নাযিল করতে পারি যার ফলে তার সম্মুখে তাদের গ্রীবা নত হয়ে পড়বে"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন, তবে আসমান থেকে এমন কোন নিদর্শন প্রেরণ করতেন, যার কারণে এ কাফেররা ঈমান আনতে বাধ্য হতো।

এ আয়াতের তফসীরে ইমাম কাতাদা (রঃ) বলেছেন, যদি আল্লাহ পাকের মর্জি হতো, তবে তিনি এমন নিদর্শন নাযিল করতেন যে, কোন পাষন্ডও অবাধ্য থাকতে পারত না; বরং সকলেই মাথানত করতে বাধ্য হতো।

এবনে জোরায়েয (রঃ)-ও আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন। আলোচ্য আয়াতে اعناق শব্দটি عنق এর বহুবচন, এর অর্থ গ্রীবা। আর عنق বা গ্রীবা বলে ঐ ব্যক্তির পুরো দেহকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ আল্লাহ পাক ইচ্ছা করলে সকলকে ঈমান আনয়নের জন্যে বাধ্য করতে পারতেন, কিন্তু কাউকে হেদায়েত কবুল করার জন্যে বাধ্য করা তাঁর নীতি বিরুদ্ধ কাজ। তাই তিনি তা করেন না।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে اَعْنَاق শব্দটি তার প্রকৃত অর্থে ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা সর্দার বা নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি উদ্দেশ্য করা হয়েছে। এর তাৎপর্য হলো, যদি আল্লাহ পাক ইচ্ছা করতেন, মক্কার কোরায়শ সর্দারদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনে বাধ্য করতেন। কিন্তু কাউকে ঈমান আনয়নে বাধ্য করা আল্লাহ পাকের অভিপ্রায় নয়।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০৭

আল্লামা কান্দলভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, যদি আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হতো, তবে তিনি এমন নিদর্শন নাযিল করতেন, যা দেখে কাফেররা ঈমান আনতে বাধ্য হতো। কিন্তু সিদ্ধান্ত হয়ে আছে যে এমন নিদর্শন নাযিল করা হবেনা, যার কারণে তারা ঈমান আনতে বাধ্য হয়।

অতএব, তাদের ঈমান আনয়নের আশা করা বৃথা।[১]

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যেহেতু কাউকে ঈমানের জন্যে বাধ্য করার কোন ইচ্ছা আল্লাহ পাকের নেই, তাই তিনি এরশাদ করেছেন,

إِنْ نَّشَأْ

যদি আমি ইচ্ছা করতাম, তবে আসমান থেকে এমন নিদর্শন নাযিল করতাম যার কারণে তারা ঈমান আনয়নে বাধ্য হতো। এজন্যেই অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ شَآءَ رَبُّكَ لَاٰمَنَ مَنْ فِي الْاَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيْعًا.

"যদি আপনার প্রতিপালক ইচ্ছা করতেন, তবে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ ঈমান নিয়ে আসত"। আল্লাহ পাক মানুষকে এ সম্পর্কে হেদায়েত করার জন্যে যুগে যুগে নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন, তাঁদের নিকট আসমানী গ্রন্থ নাযিল করেছেন, যাতে করে মানুষ স্বীয় বিবেক-বুদ্ধি ব্যবহার করে সত্য গ্রহণ করতে পারে, তথা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতে পারে, কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, তারা আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূলগণের প্রতি ঈমান আনতে ব্যর্থ হয়। যেহেতু মক্কাবাসী ঈমান আনতে রাজী হয়নি, তাই তাদের জন্যে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হওয়ার কোন কারণ নেই।[২]

আল্লামা আবদুল হক মোহাদ্দেস দেহলভী (রঃ) এ আয়াত সমূহের তফসীরে লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের মোকাত্তাআত অক্ষরগুলোর মধ্যে ط অর্থ আনন্দ, আর س অর্থ স্থায়ী আনন্দ, আর م অক্ষর দ্বারা হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে স্থায়ী আনন্দ মোবারক হোক। বর্তমানে তাঁর যে দুশ্চিন্তা রয়েছে তা নিতান্ত সাময়িক। এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআনের আয়াত সমূহ অত্যন্ত সুস্পষ্ট, এর মর্মে কোন আড়ষ্টতা, অস্পষ্টতা নেই। যারা বিবেকবান, যারা বুদ্ধিমান তাদের অন্তরে এ গ্রন্থের সত্যতার ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ নেই, যেহেতু কাফেররা ঈমান আনবেনা, তাই তাদেরকে কোন প্রকার বিশেষ নিদর্শন দেখিয়ে ঈমান আনয়নে বাধ্য করার অভিপ্রায় আল্লাহ পাকের নেই। তাই তাদের ব্যাপারে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত থাকারও কোন যুক্তি নেই।[৩]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২০৮

[২] তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-২৪

[৩] তফসীরে হাক্কানী পারা-২১, পৃষ্ঠা-১৪

وَمَا يَأْتِيهِم مِّن ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَٰنِ مُحْدَثٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ
مُعْرِضِينَ ﴿٥﴾ فَقَدْ كَذَّبُوا فَسَيَأْتِيهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ
يَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦﴾ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ
زَوْجٍ كَرِيمٍ ﴿٧﴾ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٨﴾
وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٩﴾ وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ
ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴿١٠﴾ قَوْمَ فِرْعَوْنَ ۚ أَلَا يَتَّقُونَ ﴿١١﴾ قَالَ رَبِّ
إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ ﴿١٢﴾ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي
فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ ﴿١٣﴾ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ ﴿١٤﴾
قَالَ كَلَّا ۖ فَاذْهَبَا بِآيَاتِنَا ۖ إِنَّا مَعَكُم مُّسْتَمِعُونَ

তরজমা

(৫) এবং যখনই দয়াময়ের নিকট থেকে তাদের কাছে কোন নতুন উপদেশ আসে, তখনই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

(৬) তারা তো মিথ্যাজ্ঞান করেছে, অতএব তারা যে বিষয় নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতো, তার সঠিক তথ্য তাদের নিকট অচিরেই এসে পৌঁছবে।

(৭) তারা কি পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করে না? যে আমি তাতে সর্ব প্রকার উত্তম বস্তু উৎপন্ন করেছি।

(৮) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, তবে অধিকাংশ লোকই মোমেন নয়।

(৯) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক পরম শক্তিশালী, অতীব দয়াবান।

(১০) স্মরণ করুন সে সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, এ পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়ের নিকট যাও।

(১১) ফেরাউনের জাতির নিকট, তারা কি ভয় করে না?

(১২) তখন মূসা বলেছিলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা হয় যে তারা আমাকে মিথ্যাবাদী বলবে।

(১৩) তদুপরি আমার মন দমে যায়, আর আমার জিহ্বা সাবলীল নয়, অতএব হারুনের প্রতিও ওহী প্রেরণ করুন।

(১৪) (এতদ্ব্যতীত) আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও রয়েছে, আমার ভয় হয় যে তারা আমাকে হত্যা করবে।

(১৫) আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন, কখনো নয়, তোমরা উভয়ে আমার নিদর্শন নিয়ে যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, শ্রবণ করছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ কারণে যে, তিনি কাফেরদের হেদায়েত কবুল না করায় অত্যন্ত মর্মাহত থাকতেন, এ আয়াত থেকে এরশাদ হয়েছে যে, (হে রসূল!) যাদের হেদায়েতের জন্যে আপনি অত্যন্ত আগ্রহী এবং যাদের ভয়াবহ পরিণামের কথা চিন্তা করে আপনার দুশ্চিন্তার অন্ত নেই তাদের অবস্থা এই যে, করুণাময় আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে যখনই কোন নতুন উপদেশ দেয়া হয় তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে মুখ ফিরিয়ে নেয়, মহান আল্লাহ্ পাকের বাণীকে তারা উপেক্ষা করে চলে, কখনও সেদিকে মনযোগই দেয়না, এমন অবস্থায় তাদের হেদায়েত কিভাবে হবে? আলোচ্য আয়াতে ذِكْر শব্দটির অর্থ উপদেশ, নছিহত। এর দ্বারা পবিত্র কোরআনের কোন অংশ উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ

"এ-তো (পবিত্র কোরআন) সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টির জন্যে উপদেশ ব্যতীত আর কিছুই নয়"। আর مُحْدَثٍ শব্দের অর্থ হলো নতুন। যদিও কোরআনে করীম অস্তিত্বের ব্যাপারে অতি প্রাচীন, কিন্তু নাযিল হওয়ার ব্যাপারে নতুন অর্থাৎ পবিত্র কোরআনের কোন নতুন আয়াত যখনই নাযিল হতো এবং তাতে কোন উপদেশ থাকতো তখনই এ হতভাগা কাফেররা তা গ্রহণে অস্বীকৃত জানাত।

মূলতঃ পবিত্র কোরআনের মধ্যে হয়তো তৌহিদ বা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদের কথা রয়েছে, তাঁর কোন গুণ বা বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ রয়েছে, অথবা ফেরেশতাদের কথা বা নবুওয়্যত ও রেসালতের বিষয়ে উল্লেখিত হয়েছে, এমনিভাবে কেয়ামতের দিন যা ঘটবে তার বিবরণ রয়েছে এসব কিছুই চির নির্ধারিত এবং চিরস্থায়ী সত্য। তবে অবতরণের ব্যাপারে সময়ের ব্যবধান থাকতে পারে। যেমন, সর্বপ্রথম হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি সহীফা নাযিল হয়েছে, আর সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ নাযিল হয়েছে। অন্যান্য আসমানী গ্রন্থ এক সঙ্গেই নাযিল হয়েছে কিন্তু পবিত্র কোরআন ২৩ বছরের বিভিন্ন সময়ে, প্রয়োজনের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন আয়াত নাযিল হয়েছে, আর যখনই কোন নূতন আয়াত নাযিল হয়েছে তখনই কাফেররা তার বিরোধিতা করেছে, তাকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে শুধু তাই নয়; তারা পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষা সম্পর্কে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করতেও কসুর করেনি।

কাফেরদের উদ্দেশ্য সতর্কবাণী

فَسَيَأْتِيْهِمْ أَنْبٰٓؤُا مَا كَانُوْا بِهٖ يَسْتَهْزِءُوْنَ

কাফেররা যে বিষয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত, অদূর ভবিষ্যতে তার সঠিক তথ্য তাদের নিকট এসে পৌঁছবে, অর্থাৎ অচিরেই তারা তাদের বিদ্রুপের অবশ্যম্ভাবী ভয়াবহ পরিণতি দেখতে পাবে।

তফসীরকারগণ এর দু'টি ব্যাখ্যা করেছেনঃ

১. দুনিয়াতেই তারা শাস্তি ভোগ করবে, যেমন মক্কাবাসী বদরের যুদ্ধের দিন তাদের অপকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে। তাদের নেতৃস্থানীয় ৭০ ব্যক্তি এ জেহাদে নিহত হয়েছে আর সমান সংখ্যক লোক বন্দী হয়েছে।

২. এ কাফেররা তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি কেয়ামতের দিন দেখতে পাবে, তখন তারা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তারা জানতে পারবে, তাদের কর্মের পরিণতি কত ভয়াবহ, যে নসিহতের প্রতি তারা বিদ্রুপ করতো তা হক্ব ছিল নাকি বাতিল? একান্ত অনুসরণীয় ছিল? নাকি বর্জনীয় তা সেদিন ভালভাবেই তারা বুঝতে পারবে। যখন এ জীবনের মর্মার্থ তাদের সম্মুখে মহা সত্যরূপে হাযির হবে তখন তারা টের পাবে।

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَمْ أَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ

"তারা কি ধরণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে না? যে আমি তাতে সর্ব প্রকার উত্তম বস্তু উৎপন্ন করেছি"।

এ কাফেররা যদি পৃথিবীর প্রতি লক্ষ্য করত যে, কিভাবে আল্লাহ পাক মৃত শুষ্ক জমীনকে পুনর্জীবন দান করেন, গতকাল পর্যন্ত যা ছিল লতা-পাতা বিহীন, প্রাণহীন, আল্লাহ পাক বারিপাত করলেন, ফলে বৃষ্টির পানির স্পর্শ পেয়ে জমীন নবরূপ ধারণ করল, সবুজের মেলা দেখা দিল, কাফেররা যদি এসব কথা চিন্তা করে দেখত, তবে কখনও তারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করতে পারতো না, তারা নিঃসন্দেহে এ সত্য উপলব্ধি করতো যে, যিনি সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান যিনি মৃত ও শুষ্ক জমীনে নব প্রাণ সঞ্চার করতে পারেন, তিনি মৃত মানুষকেও অতি সহজেই জীবিত করে উত্থিত করতে পারেন। অতএব, আল্লাহ পাকের এ ঘোষণাকে কোনভাবে অস্বীকার করা যায়না, তবে যারা কোন অবস্থাতেই সত্যকে গ্রহণ করতে চায়না তাদের জন্যে কোন নিদর্শনই উপকারী হয়না, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ

তারা কি জমীনের দিকে লক্ষ্য করে না? যে আমি কত উত্তম বস্তু তাতে উৎপন্ন করেছি, বিশাল বিস্তৃত পৃথিবীর নানা প্রকার বৃক্ষ-তরুলতা, রকমারী উদ্ভিদ, শস্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ভূমি, নানা প্রকার ফল-ফলারীতে ভরপুর উদ্যান সমূহের প্রতি লক্ষ্য করেও বিবেকবান মানুষ মহান স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস করতে পারে।

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্টির মাঝে স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের সৃষ্টি-নৈপূণ্যের যে অপূর্ব সুন্দর ও বিস্ময়কর নিদর্শন সমূহ রয়েছে তাতে তাঁর একত্ববাদের অগণিত এবং অকাট্য দলিল প্রমাণ বিদ্যমান রয়েছে।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ

কিন্তু অধিকাংশ লোক তা মানে না, তারা এ সত্যে বিশ্বাস করেনা। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের এলমে রয়েছে যে অধিকাংশ লোক ঈমান আনবেনা। যেমন সূরা ইয়াসীনে এরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلٰى اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُوْنَ (সূরা ইয়াসীন)

"অধিকাংশ লোক সম্পর্কে এ বাণী অবধারিত হয়েছে যে, তারা ঈমান আনবেনা"।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

"নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি যখন ইচ্ছা কাফেরদের শাস্তি বিধানে সক্ষম"।

الرحيم

তিনি অত্যন্ত দয়াবান। এ কারণেই তিনি তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, তাৎক্ষণিকভাবে শাস্তি দেন না। অথবা এর অর্থ হলো, তিনি অত্যন্ত পরাক্রশালী, কাফেরদেরকে যে কোন সময় তিনি শাস্তি দিতে পারেন। আর যারা তওবা করে ঈমান আনয়ন করে, তাদের জন্যে তিনি অত্যন্ত দয়াবান।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আল্লাহ পাক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, সৃষ্টি মাত্রই তাঁর নিকট অত্যন্ত অসহায় কিন্তু তিনি পরম করুণাময়, অবাধ্য বন্দাদের শাস্তি বিধানে তিনি তাড়াহুড়া করেন না; বরং বিলম্ব করেন ও অবকাশ দিয়ে থাকেন। যাতে করে তারা অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও যদি তারা সঠিক পথে না আসে, তবে আল্লাহ পাক তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করেন। তবে যারা তওবা করে ঈমানদার হয়, অনুগত ও ফরমাবরদার থাকে, তারা ভোগ করে আল্লাহ পাকের অন্তহীন দয়ামায়া।

প্রিয়নবী (সা.)-কে সান্ত্বনা

আলোচ্য আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে وَاِنَّ رَبَّكَ (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান, একথা বলে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, যদিও মক্কার কাফেররা আপনার এবং আপনার সঙ্গীদের প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছে, তবে সকলেরই জানা উচিৎ আল্লাহ পাক সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলে এ মুহূর্তে তাদের অন্যায়-অনাচারের শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু তিনি তা করেন না কেননা, তিনি অত্যন্ত দয়ামায়, তাঁর দয়ামায়া অনন্ত অসীম, তাই তিনি দয়া পরবশ হয়েই তাদেরকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ দান করে থাকেন। তবে যেদিন তাদেরকে তিনি পাকড়াও করবেন সেদিন তাদের আর নিস্তার নেই। পৃথিবীর ইতিহাসে তার বিস্তর দৃষ্টান্ত রয়েছে।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে العزيز (পরাক্রমশালী) শব্দটি الرحيم (অত্যন্ত দয়াবান) শব্দের পূর্বে ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা যদি তা পরে ব্যবহার করা হতো, তাহলে এ ভুল করা হতো যে কাফেরদের শাস্তি বিধানের শক্তি না থাকার কারণেই কাফেরদের

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫০৯

প্রতি দয়া করা হয়, তাই العزيز শব্দটি পূর্বে ব্যবহার করা হয়েছে যাতে করে এমন ভুল ধারণা কেউ না করে। এ আয়াতে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে যে, যদিও আল্লাহ পাক কাফেরদেরকে যে কোন সময় তাদের নাফরমানীর শাস্তি দিতে সম্পূর্ণ সক্ষম, কিন্তু যেহেতু তিনি অত্যন্ত দয়াবান, তাই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করেন না, তাদেরকে আত্ম সংশোধনের সুযোগ হিসেবে অবকাশ দিয়ে থাকেন।[১]

আল্লামা সয়ুতী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ এবনে জরীর এবনে জোরায়েযের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, সূরা শুআরার আলোচ্য আয়াতের العزيز الرحيم শব্দ দ্বয়ের মধ্যে সব কিছু রয়েছে কেননা, ইতিপূর্বে যে সব অবাধ্য, নাফরমান জাতি তাদের নাফরমানীর কারণে আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয়েছে, তাদের ব্যাপারে العزيز শব্দটির মর্ম বাস্তবায়িত হয়েছে। যেমন ফেরাউন, নমরূদ, শাদ্দাদ এবং আদ, সামুদ জাতি গয়রহকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর তিনি الرحيم বা দয়াবান কেননা, তিনি ইসলামের শত্রুদেরকে নিশ্চিহ্ন করে মোমেনদের প্রতি দয়া করেছেন তথা কাফেরদের জুলুম থেকে মুসলমানদেরকে নাজাত দিয়েছেন। আর এভাবে الرحيم শব্দটির মর্ম বাস্তবায়িত হয়েছে।[২]

وَاِذْ نَادٰى رَبُّكَ مُوْسٰٓى اَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ

"আর স্মরণ করুন সেই সময়কে, যখন আপনার প্রতিপালক মূসাকে ডেকে বললেন, এ পাপীষ্ঠ জাতির নিকট যাও, ফেরাউনের জাতির নিকট তারা কি ভয় করে না"?

হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা

এ আয়াত থেকে আম্বিয়ায়ে কেরামের ঘটনাবলীর বিবরণ শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম হযরত মূসা (আঃ) এবং ফেরাউনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে বিভিন্ন বিষয় সন্নিবেশিত হয়েছে, যেমন আল্লাহ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদ, নবুওয়্যত ও রেসালত এবং এরপর মোমেনদের নাজাত ও কাফেরদের ধ্বংসের ঘটনাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে।

যদিও এ ঘটনা সূরা আরাফে এবং সূরা তোয়াহায় বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু এ সূরায় এ ঘটনাটিকে বিশেষ আঙ্গিকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

وَاِذْ نَادٰى....

এ আয়াতে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে এরশাদ করেছেন, (হে নবী!) কাফেরদেরকে সতর্ক করার লক্ষ্যে আপনি মূসা (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করুন। যখন আল্লাহ পাক তাঁকে ফেরাউনের নিকট গমন করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, ফেরাউন ও তার সম্প্রদায় ছিল কাফের, তারা ছিল জালেম, বনী ইসরাঈলের শিশু সন্তানদেরকে ফেরাউনের নির্দেশে হত্যা করা হতো এবং তাদেরকে বেগার খাটানো হতো। তাই হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১২০
[২]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৯০-৯১
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-৪০

দিয়েছিলেন, ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায়কে আল্লাহকে ভয় করার নির্দেশ প্রদান কর, হযরত মূসা (আঃ) তখন তাঁর নিজের কিছু আরজী পেশ করলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়–

قَالَ رَبِّ إِنِّيٓ أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, তারা আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, আমাকে রসূল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকৃতি জানাবে, তদুপরি আমার মনও দমে যায়, আর তোতলানো হেতু স্বচ্ছন্দে সাবলীলভাবে আমি কথাও বলতে পারিনা, এরশাদ হয়েছেঃ

وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنطَلِقُ لِسَانِي

অর্থাৎ যেহেতু আমি স্বচ্ছন্দে কথা বলতে পারিনা, বিশেষতঃ উত্তেজিত অবস্থায় এ কষ্ট আরো বেড়ে যায়, আর সাবলীলভাবে মনোভাব প্রকাশ করতে না পারার কারণে আমার মনও দমে যায়।

আল্লামা বগভী (রঃ) এর ব্যাখ্যায় রিখেছেন, যেহেতু ফেরাউন ও তার দলবল আমাকে মিথ্যাজ্ঞান করবে, তাই আমার মনও দমে যাবে, এ অবস্থায় রেসালতের মহান দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করা আমার জন্যে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়বে। তাই যদি আমার ভাই হারুন আমার সাথে সহযোগিতা করে, তবে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

فَأَرْسِلْ إِلَىٰ هَارُونَ

অতএব, হারুনকে পয়গম্বরী দান করুন, তার নিকট ওহী প্রেরণ করুন, তাকে আমার সাহায্যকারী মনোনীত করুন।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের নিকট রেসালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে যে আরজী পেশ করেছেন, তার তিনটি কারণ ছিল।

এক. কাফেরদের পক্ষ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করার আশঙ্কা,

দুই. কাফেরদের বিরোধিতার আশঙ্কায় মন খারাপ হওয়া,

তিন. মন খারাপ হবার কারণে রসনার কষ্ট কারো বেড়ে যায়। যখন এ তিনটি বিষয় একত্রিত হয়, তখন কোন সাহায্যকারীর প্রয়োজন হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। মূলতঃ হযরত মূসা (আঃ) তাঁর প্রতি অর্পিত রেসালতের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালনের উদ্দেশ্যেই হযরত হারুন (আঃ)-কে সাহায্যকারী হিসেবে পেতে চেয়েছিলেন।

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنبٌ

"(এতদ্ব্যতীত) আমার উপর তাদের একটি অপরাধের অভিযোগও রয়েছে, আমার ভয় হয় যে তারা আমাকে হত্যা করবে"।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাতে কিবতী সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি নিহত হয়েছিল, ফেরাউন সম্প্রদায়ের ধারণায় এটি ছিল অপরাধ। তাই তারা এখন আমাকে হাতের কাছে পেয়ে অতীতের কার্যের প্রতিশোধ নিতে পারে এবং আমাকে হত্যা করতে পারে, এ অবস্থায় আমি

রেসালতের দায়িত্ব কিভাবে পালন করব? যদিও ঐ ব্যক্তিকে হত্যা করা নাজায়েয ছিল না, কেননা সে কাফের ছিল, কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টির বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে এজন্যে আরজী পেশ করেছেন যেন আল্লাহ পাক এ আসন্ন বিপদ থেকে তাঁকে রক্ষা করেন। যেহেতু, এ আশঙ্কা করার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, আল্লাহ পাকের পয়গাম পৌঁছাবার পূর্বেই কাফেররা হযরত মূসা (আঃ)-কে হত্যা করে ফেলবে, এজন্যে রেসালতের মহান দায়িত্ব পালন করা সম্ভব হবেনা, قَالَ হযরত মূসা (আঃ)-এর একথার জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ كَلَّا অবশ্যই নয়, তারা কখনো তোমাকে হত্যা করতে পারবেনা। এভাবে আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে অভয় দান করে বলেছেন, অতএব তুমি নিশ্চিন্ত মনে আমার বিধান নিয়ে ফেরাউন ও তার দলবলের নিকট যাও, নিশ্চয় আমি তোমাদের কথাবার্তা শ্রবণ করছি।

তফসীরকারগণ বলেছেন, كَلَّا শব্দ দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-কে তাঁর হেফাজতের নিশ্চয়তা বিধান করা হয়েছে, কাফেররা যে তাঁর কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবেনা সে সম্পর্কে তাঁকে নিশ্চয়তা দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়; তাঁর দ্বিতীয় আরজীও কবুল করা হয়েছে। কেননা আল্লাহ পাক হযরত হারুন (আঃ)-কে তাঁর সাহায্যকারী হিসেবে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, আল্লাহ পাক যেন মূসা (আঃ)-কে একথা বলেছেন, হে মূসা! ভয় করোনা, তোমাকে হত্যা করার সাধ্য কারো হবেনা।

দ্বিতীয়তঃ তোমরা আরজী মোতাবেক হারুনকেও তোমার সঙ্গী ও সাহায্যকারী রূপে প্রেরণ করলাম।

তৃতীয়তঃ নিশ্চয় আমি তোমাদের সাথেই রয়েছি, অর্থাৎ আমার সর্ব প্রকার সাহায্য তোমরা লাভ করবে।

এতদ্ব্যতীত, তোমাদের কথা-বার্তা আমি শ্রবণ করছি, আর তোমাদের দুশমনদের অবস্থা সম্পর্কে আমি অবগত অতএব, ভয়ের কোন কারণ নেই, আমি সবই দেখছি, সবই শ্রবণ করছি, সব কিছুই রয়েছে আমার নখদর্পণে।[১]

তফসীরকারগণ লিখেছেন, এ আয়াত দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে অভয় দান করেছেন, إِنَّا مَعَكُمْ নিশ্চয় আমি তোমাদের সঙ্গে রয়েছি। বিশ্ব প্রতিপালক যদি কারো সঙ্গে থাকেন বলে ঘোষণা করেন, এরপর আর কোন কিছুর প্রয়োজন হতে পারেনা। এর তাৎপর্য হলো, হে মূসা! তোমার ভয়ের কোন কারণই নেই, কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন, ঠিক এভাবেই হিজরতের রাতে যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর একমাত্র সাথী হযরত আবু বকর (রাঃ)-কে নিয়ে সওর নামক গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, দুশমন তখন ঐ গুহার উপরে এসে দাঁড়িয়েছিল। হযরত আবু বকর (রাঃ) ঐ মুহূর্তে শংকিত হয়ে পড়েছিলেন, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫১১

"চিন্তিত হয়োনা, আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন"। আর আল্লাহ পাক সঙ্গে থাকার তাৎপর্য হলো, আল্লাহ পাকের সর্বপ্রকার সাহায্য আমাদের সঙ্গে রয়েছে।

অতএব, ভয়ের কোন কারণ নেই।[১]

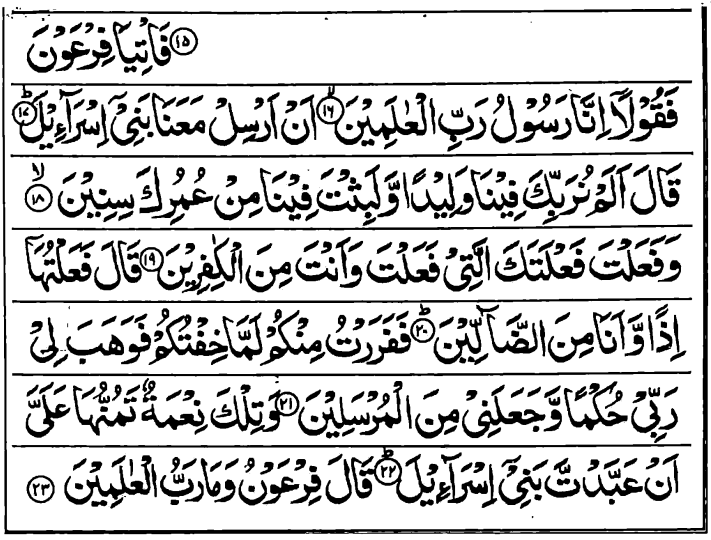
فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ ﴿١٥﴾
فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٧﴾
قَالَ أَلَمْ نُرَبِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَبِثْتَ فِينَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ﴿١٨﴾
وَفَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِي فَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿١٩﴾ قَالَ فَعَلْتُهَا
إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴿٢٠﴾ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي
رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ ﴿٢١﴾ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
أَنْ عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿٢٢﴾ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٣﴾

তরজমা

(১৬) অতএব, তোমরা ফেরাউনের নিকট যাও এবং বল, আমরা বিশ্ব প্রতিপালকের বার্তা নিয়ে তোমার নিকট এসেছি।

(১৭) তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও।

(১৮) ফেরাউন বলল, আমি কি তোমাকে আমাদের মাঝে ছেলের ন্যায় লালন-পালন করিনি? এবং তোমার জীবনের কয়েকটি বছর কি আমাদের মাঝে অতিবাহিত করনি?

(১৯) এবং তুমি যা করার তা করেছ, প্রকৃতপক্ষে তুমি যে অকৃতজ্ঞ।

(২০) মূসা বললেন, আমি যা করেছি তা ভুল করেই করেছি।

(২১) এরপর আমি যখন তোমাদের ভয়ে ভীত হলাম তখন পলায়ন করলাম। পরে আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দান করলেন এবং আমাকে রসূল নিযুক্ত করলেন।

(২২) আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করছো, তাতো এই যে তুমি বণী ইসরাঈলকে দাসে পরিণত করেছ।

(২৩) ফেরাউন বলল, বিশ্ব প্রতিপালক আবার কি?

তফসীরুল কোরআন

আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তোমরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাকে বল যে, আমরা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হয়েছি। তাঁর মহান বাণী নিয়ে তোমার নিকট এসেছি, তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা। অতএব, তুমি তাঁর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর নবী রসূলগণের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন কর।

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৪১

বনী ইসরাঈল জাতি যারা বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে এবং তাঁর রসূলগণের রেসালতের প্রতিও বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তাদের প্রতি তুমি জুলুম অত্যাচার করছো। তুমি এ জুলুমবাজী থেকে বিরত হও, তাদেরকে আমার সঙ্গে তাদের পূর্ব পুরুষের স্থান সিরিয়ায় যেতে দাও, তুমি তাদেরকে অন্যায়ভাবে গোলাম-বাঁদী বানিয়ে রেখেছ, তোমার এ অন্যায় আচরণ বন্ধ কর, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

أَنْ أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيٓ إِسْرَآءِيلَ

"তুমি বনী ইসরাঈলকে আমাদের সঙ্গে যেতে দাও"।

উল্লেখ্য, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সময় থেকেই বনী ইসরাঈল জাতি সিরিয়ায় বসবাস করত, হযরত ইউসুফ (আঃ) যখন মিশরে অবস্থান করেন তখন তারা মিশরে আসে এবং সেখানে বসবাস করে, পরবর্তীতে ফেরাউন যখন আসে তখন তাদেরকে গোলাম-বাঁদীতে পরিণত করে এবং তাদের প্রতি চরম জুলুম করে। হযরত মূসা (আঃ) তাদের প্রতি ফেরাউনের জুলুমের অবসান ঘটাতে চান, তিনি তাদের স্বাধীনতা দাবী করেন, কিন্তু ফেরাউন তাতে আপত্তি জানায়।

ইমাম কুরতবী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক যথাসময়ে পৌছে যান, কিন্তু এক বছর পর্যন্ত ফেরাউনের সঙ্গে দেখা করার জন্যে অপেক্ষা করতে হয়, প্রহরী ফেরাউনের নিকট গমন করে বলে যে এখানে এমন লোক এসেছেন যিনি বলেন, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত হয়ে এসেছেন, ফেরাউন বলল, ঠিক আছে, তাকে আসতে দাও। তখন প্রহরী তাদেরকে ফেরাউনের নিকট যেতে অনুমতি দেয়। তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট গমন করলেন এবং তাকে আল্লাহ্ পাকের বাণী পৌঁছে দিলেন।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, ফেরাউন বনী ইসরাঈলকে চারশ' বছর যাবত গোলাম-বাঁদী বানিয়ে রেখেছিল। তাদের সংখ্যা ছিল ৬ লক্ষ, আর কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে ৬ লক্ষ ৮০ হাজার। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের আদেশ পেয়ে মিশরের দিকে রওয়ানা হলেন। হারুন (আঃ) পূর্বেই সেখানে ছিলেন। তাই মূসা (আঃ) হারুন (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাকের আদেশ সম্পর্কে অবহিত করলেন। বর্ণিত আছে যে মূসা (আঃ) যখন মিশরে প্রবেশ করেন তখন তাঁর গায়ে ছিল গরম জুব্বা, হাতে ছিল লাঠি, যার মাথায় তাঁর খাবার ছিল। মিশরে প্রবেশ করে তিনি সর্ব প্রথম নিজের গৃহে আসেন এবং হারুন (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাকের আদেশ সম্পর্কে অবহিত করেন। একথা শ্রবণ করে তাঁর মাতা বের হয়ে আসেন এবং বলেন, ফেরাউন তোমার অনুসন্ধানে রয়েছে, যদি তোমাকে সে পায় তবে হত্যা করে ফেলবে। হযরত মূসা (আঃ) তবুও আল্লাহ্ পাকের আদেশ পালনার্থে হারুন (আঃ)-কে নিয়ে ফেরাউনের আবাস-স্থলে পৌঁছে গেলেন। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, ফেরাউনের প্রহরীরা তার বাড়ীর ফটকের উপর দিয়ে তাঁদেরকে জিজ্ঞাসা করল, তোমরা কে? হযরত মূসা (আঃ) বললেন, আমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের বাণী বাহক। প্রহরী ফেরাউনের নিকট তাদের খবর দিল, কিন্তু ফেরাউন বলল, সকাল পর্যন্ত তাদেরকে সেখানেই থাকতে দাও, সকালে তাদের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্যে তাঁদেরকে সে ডাকল।

---

[১]। তফসীরে কুরতবী খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৯৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১১

আরেকটি বর্ণনায় রয়েছে, এক বছর পর ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত করে।

যাহোক, তাঁরা উভয়ে ফেরাউনের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দিলেন। ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে চিনে ফেলল, কেননা তিনি তাঁর জীবনের শৈশব এবং কৈশোর কাল তার বাড়ীতেই অতিবাহিত করেন। তাই ফেরাউন বলল,

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِيْنَا وَلِيْدًا وَّ لَبِثْتَ فِيْنَا مِنْ عُمُرِكَ سِنِيْنَ

"আমি কি তোমাকে আমাদের মাঝে ছেলের ন্যায় লালন-পালন করিনি"?

যেহেতু হযরত মূসা (আঃ)-এর শৈশব কাল তার গৃহেই অতিবাহিত হয়েছে তাই সে বলেছে তুমি কি সেই মূসা নও, যার জীবনের একটা বিরাট অংশ আমাদের মাঝে অতিবাহিত হয়েছে, যাকে আমি ছেলের ন্যায় লালন-পালন করেছি।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) ত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত ফেরাউনের নিকটই ছিলেন, এরপর তিনি মাদায়েন গমন করেন, সেখানে তিনি দশ বছর অতিবাহিত করেছেন, এরপর তিনি মিশর প্রত্যাবর্তন করেন। ফেরাউন এবং তার দলবলকে তিনি আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের ও তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশের আহ্বান জানান, কিন্তু ফেরাউন তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি, সে বনী ইসরাঈলের প্রতি চরম অত্যাচার করতে থাকে, ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে থাকে। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে যাদুকরদের দ্বারা মোকাবেলা করার ব্যবস্থা করে, যাদুকররা মোকাবেলায় হেরে যায় এবং তারা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের প্রতি এবং তাঁর নবী হযরত মূসা আঃ-এর প্রতি ঈমান আনে। কিন্তু ফেরাউন সত্যের বিরোধিতায় অটল থাকে। ফলে তারা আল্লাহ পাকের কোপগ্রস্ত হয় এবং লোহিত সাগরে তার সলিল সমাধি ঘটে। আল্লাহ পাক কোরআনে করীমে ঘোষণা করেছেনঃ

فَالْيَوْمَ نُنَجِّيْكَ بِبَدَنِكَ

আজ আমি তোর দেহকে সংরক্ষণ করবো, যাতে করে অনাগত ভবিষ্যতের মানুষের জন্য তা হয় শিক্ষণীয়। তাই পবিত্র কোরআনের বর্ণনার সত্যতার জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ আজও ফেরাউনের লাশ কায়রো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত রয়েছে।[১]

হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনের নিমজ্জিত হওয়ার পরও ৫০ বছর জীবিত ছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ১২০ বছর।

وَ فَعَلْتَ فَعْلَتَكَ الَّتِيْ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكٰفِرِيْنَ

"আর তুমি যা করার তা করে গেছে, আসলে তুমি বড় অকৃতজ্ঞ"।

অর্থাৎ তুমি সেই মূসা যে একদিন আমার সম্প্রদায়ের এক কিবতীকে হত্যা করে পলায়ন করেছিল।

আলোচ্য আয়াতে كافر অর্থ অকৃতজ্ঞ। অর্থাৎ তুমি আমাদের এহসানের কথা ভুলে গিয়েছ, আমাদের বিশেষ লোককে তুমি হত্যা করেছ। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য বাক্যটির এ ব্যাখ্যাই করেছেন এবং অধিকাংশ তফসীরকারগণও এ মতই প্রকাশ করেছেন।

---

[১]। এই লেখক স্বচক্ষে তো দেখে এসেছে।

অর্থাৎ আলোচ্য আয়াতের "কুফর" শব্দটির অর্থ অকৃতজ্ঞতা, কারো দানকে অস্বীকার করা। কেননা, ফেরাউন আল্লাহ পাকের সাথে নাফরমানীর তাৎপর্য সম্পর্কে অবগতই ছিলনা।

তফসীরকার হাসান ও সুদ্দী (রঃ) বলেছেন, এ বাক্যটি ছিল এভাবে, انت كنت من الكافرين। অর্থাৎ তুমি আজ যে মা'বুদ বা উপাস্যের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছো, ইতোপূর্বে নিজেও তার প্রতি অবিশ্বাসী ছিলে। অথবা এর অর্থ হল তুমি আমার এহসানকে ভুলে গেছ, আমার বাড়ীতে লালিত-পালিত হওয়া সত্বেও আমার বিরোধিতা করছো। অথবা এর অর্থ হল, তুমি সে সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত, যাদেরকে ফেরাউন এবং তার সম্প্রদায় তাদের ধর্ম বিরোধী মনে করতো।[১]

قَالَ فَعَلْتُهَآ إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّآلِّيْنَ

"মূসা বললেন, আমি যা করেছি, তা ভুল ক্রমেই করেছি"।

অর্থাৎ কিবতীকে হত্যা করেছি সত্য কিন্তু তা আদৌ ইচ্ছা করে করিনি কেননা, আমি ঐ কিবতীকে একটি সামান্য চাপড়ই মেরেছি। কিন্তু আমি জানতাম না যে ঐ ব্যক্তি একটি চপেটাঘাতও সইতে পারবেনা এবং মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অর্থাৎ ঐ কিবতীকে হত্যা করার কোন ইচ্ছা হযরত মূসা (আঃ)-এর ছিল না। কিন্তু ঘটনাক্রমে তার মৃত্যু হয়ে গেছে। আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যায় আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এর অর্থ হল, কিবতী হত্যার ঘটনাটা তখন ঘটেছে যখন এ সম্পর্কে আমি অবগত ছিলাম না, অর্থাৎ আমার নিকট তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে কোন হেদায়েত আসেনি, অথবা এর অর্থ হল, আমি জানতাম না যে আমার চপেটাঘাতে ঐ ব্যক্তির মৃত্যু হবে, আর তাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে আমি চপেটাঘাত করিনি। অথবা এর অর্থ হল অনিচ্ছাকৃতভাবেই আমি ঐ মুহূর্তের জন্যে সঠিক পথ থেকে সরে পড়েছিলাম। আর এভাবে এমন একটি কাজ একান্ত অনিচ্ছা সত্বেও আমার দ্বারা সংঘটিত হয়েছে।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الضَّآلِّيْنَ ضلالة থেকে, অর্থ হল ভুলে যাওয়া, অর্থাৎ ভুলবশতঃ আমার দ্বারা এ কাজটি হয়েছিল।[২]

পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি যে এহসান করেছিল তার কথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে, যাতে করে তিনি লজ্জিত হন এবং তার এহসানের কথা তিনি স্মরণ করেন। তফসীরকারগণ তার একথার ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, প্রকৃত অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ফেরাউনে কোন এহসান ছিলনা। কেননা, ফেরাউন বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, তাদেরকে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল, তাদের পুত্র সন্তানদেরকে সে জবেহ করার আদেশ দিয়েছিল, যেন বনী ইসরাঈলে তার কোন প্রতিদ্বন্দ্বী সৃষ্টি না হয়। তার এ কর্মসূচী বাস্তবায়নে বনী ইসরাঈলের ৯০ হাজার শিশুকে হত্যা করা হয়। এমনি অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ)-এর মাতা ফেরাউনের লোকদের হাত থেকে রক্ষা করার জন্যে নবজাত শিশু মূসা (আঃ)-কে কাষ্ঠ নির্মিত বাক্সে আবদ্ধ করে তাঁকে নীল দরিয়ায় ফেলে দিয়েছিলেন, যা আল্লাহ পাকের কুদরতে ফেরাউনের মহলের সম্মুখে পৌঁছে যায়। তার স্ত্রী

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫১৩
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫১৩

দেখতে পেয়ে তাঁকে তুলে নেয় এবং তিনি নিঃসন্তান ছিলেন বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে নিজের সন্তান হিসাবে গ্রহণ করেন। ফেরাউন প্রথমতঃ এতে নারাজ থাকলেও পরে তার স্ত্রীর সাথে একমত হয়। এভাবে হযরত মূসা (আঃ) তার বাড়ীতে লালিত-পালিত হন। এটি ছিল আল্লাহ পাকের কুদরতের বিস্ময়কর নমুনা। আল্লাহ পাক যা ইচ্ছা তা করতে পারেন, যে প্রতিদ্বন্দ্বীর ভয়ে ফেরাউন হাজার হাজার বনী ইসরাঈলী শিশুকে জবেহ করেছে তাকে আল্লাহ পাক ফেরাউনের বাড়ীতেই লালন-পালন করিয়েছেন। এটি নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরতের অদ্বিতীয় দৃষ্টান্ত। অতএব, হযরত মূসা (আঃ)-এর ফেরাউনের বাড়ীতে লালিত-পালিত হওয়া তার কোন এহসান নয়। হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক তার দ্বারা লালন-পালন করিয়েছেন, অথচ সে বনী ইসরাঈল জাতিকে চারশ' বছর ধরে গোলাম বানিয়ে রেখেছিল। যিনি সর্বশক্তিমান, যিনি সর্বত্র বিরাজমান সেই আল্লাহ পাক আমাকে তোমার দ্বারা লালন-পালন করিয়েছেন, তিনি আমাকে তাঁর রসূল মনোনীত করে তোমার নিকট প্রেরণ করেছেন, যাতে করে আমি তোমাকে হেদায়েত গ্রহণের আহ্বান জানাই। তুমি আমাকে পুত্র হিসাবে গ্রহণ করে আমাকে লালন-পালন করেছ, কিন্তু আমার সমগ্র জাতিকে নিজের গোলাম বানিয়ে রেখেছ। তুমি কয়েকদিন আমার লালন-পালন করেছ বলে আজ আমাকে তোমার অকৃতজ্ঞ মনে করছো, অথচ তুমিই সেই আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয়ে আছ, যিনি তোমাকে এবং সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টিকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি আমাকে রসূল মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, যিনি বিশ্ব স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তুমি তাঁকেই অস্বীকার করছো, তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অকৃতজ্ঞ রয়েছ, অথচ তাঁর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা তোমার প্রধানতম কর্তব্য, আর এ কর্তব্য পালনের জন্যে আমি তোমাকে আহ্বান করছি। মহান আল্লাহ পাকের রসূল হিসেবে এটি আমার একান্ত করণীয়।[১]

فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ

এরপর যখন আমি তোমাদেরকে ভয় করি, তখন পলায়ন করি। অর্থাৎ এতে কোন সন্দেহ নেই যে আমি পলায়ন করেছি, আর পলায়নের কারণ ছিল তোমাদের ভয়, আমার অনিচ্ছাকৃত ভুলের জন্যে তোমরা আমার নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করবে, এ আশঙ্কা থেকেই আমি মিশর থেকে পলায়ন করে মাদায়েন চলে যাই।

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাকের ইচ্ছা ছিল হযরত মূসা (আঃ)-কে নবুওয়্যত দান করা, আর সেই ইচ্ছাকে কে ঠেকাতে পারে? তাই আল্লাহ পাক আমাকে নবুওয়্যত দান করেছেন এবং তোমাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে আমাকে প্রেরণ করেছেন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَّ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ

"পরে আমার প্রতিপালক আমাকে আদেশ দান করেন এবং আমাকে রসূলগণের অন্তর্ভুক্ত করেন"।

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَّدْتَّ بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১২-১৩
ফেরাউন সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খণ্ড-১, পৃষ্ঠা-২৯৭-৩০৩

"আর আমার প্রতি তোমার যে অনুগ্রহের কথা উল্লেখ করেছ, তাতো এই যে তুমি বনী ইসরাঈলকে গোলামে পরিণত করেছ"।

অর্থাৎ আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছ বলে তুমি যে বড়াই করছো তা আদৌ শোভনীয় নয়। কেননা, তুমি যুগ যুগ ধরে আমাদের বনী ইসরাঈলকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে রেখেছে, তাদের প্রতি অবর্ণনীয় জুলুম করেছ, তার বিনিময়ে একটি বনী ইসরাঈলী শিশুকে যদি তুমি লালন-পালন করেও থাক, তবে তাকে অনুগ্রহ বলা যাবে কোন্ যুক্তিতে? যদি তুমি বনী ইসরাঈলের সন্তানদেরকে হত্যা না করতে, তবে আমার মা এমনভাবে আমাকে নীল নদে ভাসিয়ে দিতেন না।

অতএব, আমার লালন-পালনের জন্যে গর্ব করার কোন যুক্তি নেই; বরং তোমার কৃতকর্মের জন্যে লজ্জিত হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

এতদ্ব্যতীত, এ সত্যও তোমার উপলব্ধি করা উচিত যে, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক আমাকে সুকৌশলে তোমার গৃহে লালন-পালন করিয়েছেন, তিনিই আজ আমাকে তাঁর রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন এবং তোমার হেদায়েতের দায়িত্ব আমার প্রতি অর্পণ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) যখন ফেরাউনকে এ দাঁতভাঙ্গা জবাব দিলেন, তখন ফেরাউন উপলব্ধি করলো যে হযরত মূসা (আঃ) যে দায়িত্ব নিয়ে আগমন করেছেন, সে সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণ অবিচল। তখন সে তাঁর নবুওয়্যত ও রেসালত সম্পর্কেই প্রশ্ন করল, পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ

ফেরাউন বলল, বিশ্ব প্রতিপালক আবার কে? অর্থাৎ তুমি যে বিশ্ব প্রতিপালকের রসূল হয়ে এসেছ বলে দাবী করছো তিনি কে? সর্বপ্রথম তাঁর পরিচয় দাও, ফেরাউন ইতিপূর্বে (اَنَا رَبُّكُمُ الْاَعْلٰى) নিজেকে মহাপ্রভু বলে ঘোষণা করতো, নির্বোধ লোকেরা বুদ্ধির অভাবে এবং দুর্বল লোকেরা তাদের দুর্বলতার কারণে তার পূজা অর্চনা করতে অস্বীকার করতো না।

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন প্রকাশ্যে আল্লাহর অস্তিত্ব স্বীকার না করলেও মনে মনে তা স্বীকার করত। আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, ফেরাউন যখন জিজ্ঞাসা করল, বিশ্ব প্রতিপালক আবার কে? তখন হযরত মূসা (আঃ) তাকে বললেন,

رَبُّنَا الَّذِيْٓ اَعْطٰى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهٗ ثُمَّ هَدٰى

(আমার প্রতিপালক তিনিই, যিনি সব কিছুকে অস্তিত্ব দান করেছেন, এরপর হেদায়েত করেছেন) তখন ফেরাউন বলল, তোমার নবুওয়্যতের দাবীর পক্ষে তোমার নিকট যদি কোন নিদর্শন থাকে, তবে তা দেখাও। হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিটি মাটিতে ফেললেন, সঙ্গে সঙ্গে তা এক বিরাটকায় অজগরে পরিণত হয়, সে তার মুখ যখন খুলল, তখন তার একটি ঠোট জমিনের উপর ছিল, অপরটি ছিল সুউচ্চ ইমারতের উপর। সে ফেরাউনের দিকে আসতে লাগল, ফেরাউন ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করতে লাগল এবং পলায়নপর হলো। সে মূসা (আঃ)-কে ডাক দিয়ে বলল, তুমি তাকে ধর। আমি তোমার প্রতি বিশ্বাস করব এবং বনী ইসরাঈলকে তোমার সঙ্গে যেতে দেব। তখন মূসা (আঃ) ঐ অজগরটিকে ধরে ফেললেন। ফলে তা আবার লাঠিতে পরিণত হল। ফেরাউন তার লোকেদের বলল, এ দু'জন (হযরত মুসা (আঃ) ও হারুন (আঃ) হলো যাদুকর। তারা চায় তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে।

এরপর ফেরাউন সারা দেশের যাদুকরদেরকে একত্রিত করল এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করার চেষ্টা করল। আর এ চেষ্টায় ব্যর্থ যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনল।[১]

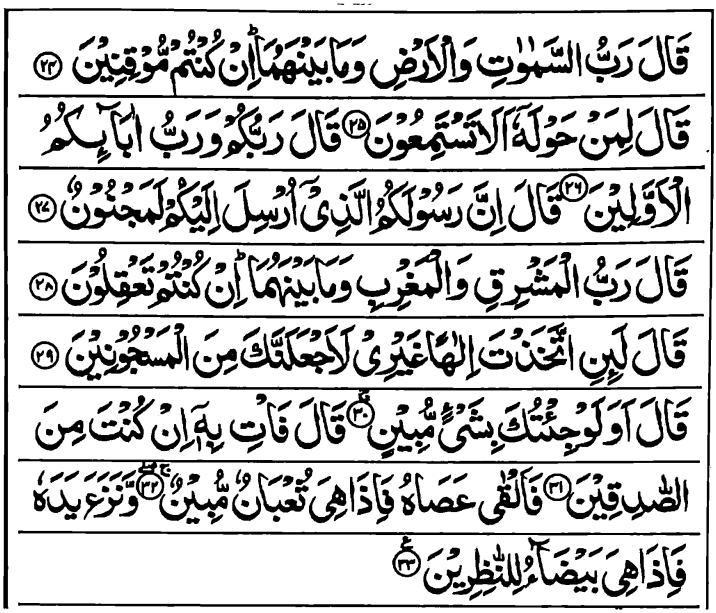
قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ ﴿٢٤﴾
قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ ﴿٢٥﴾ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ
الْاَوَّلِيْنَ ﴿٢٦﴾ قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِيْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ ﴿٢٧﴾
قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۗ اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٢٨﴾
قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِيْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ ﴿٢٩﴾
قَالَ اَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِيْنٍ ﴿٣٠﴾ قَالَ فَاْتِ بِهٖٓ اِنْ كُنْتَ مِنَ
الصّٰدِقِيْنَ ﴿٣١﴾ فَاَلْقٰى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِيْنٌ ﴿٣٢﴾ وَّنَزَعَ يَدَهٗ
فَاِذَا هِيَ بَيْضَآءُ لِلنّٰظِرِيْنَ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(২৪) মূসা (আঃ) বলেন, আসমান জমীন এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক তিনি, যদি তোমরা বিশ্বাস কর।

(২৫) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বলল, তোমরা কি শ্রবণ করছো না?

(২৬) মূসা বলেন, তিনি তোমাদের প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রতিপালক।

(২৭) ফেরাউন বলে, তোমাদের নিকট প্রেরিত পয়গম্বর নিঃসন্দেহে পাগল।

(২৮) মূসা বলেন, তিনি পূর্ব ও পশ্চিমের এবং তাদের মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, যদি তোমরা বুঝতে পার।

(২৯) ফেরাউন বলে, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক গ্রহণ করে থাক তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করব।

(৩০) মূসা বলেন, আমি যদি এমন একটি জিনিষ উপস্থিত করি যা স্পষ্ট বলে দেয়।

(৩১) ফেরাউন বলে, তুমি যদি সত্য হও, তবে তা উপস্থিত কর।

(৩২) তখন মূসা (আঃ) তার লাঠি ফেলে দেন, সঙ্গে সঙ্গে তা এক বিরাটকায় অজগরে পরিণত হয়।

(৩৩) এবং বগল থেকে হাত বের করেন, দর্শকরা তখন তা শুভ্র সমুজ্জ্বল দেখতে পায়।

---

[১]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১৯

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেছে, এ আয়াতে ফেরাউনের প্রশ্নের জবাবে মূসা (আঃ) যা বলেছিলেন, তার উল্লেখ রয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

অর্থাৎ যিনি আমাকে রসূল মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন, তিনিই বিশ্ব প্রতিপালক, তিনিই আসমান জমীন এবং তার মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রতিপালক, তিনিই সৃষ্টি করেছেন আসমান জমীন, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ-তারা প্রভৃতি। সৃষ্টি মাত্রই তার স্রষ্টার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাই অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِي الْاَلْبَابِ

(সূরা আলে এমরান)

(নিশ্চয় আসমান ও জমীনের সৃজণের মধ্যে এবং রাত ও দিনের পরিবর্তনে বুদ্ধিজীবী মহলের জন্যে আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের এবং তাঁর একত্ববাদের বহু নিদর্শন রয়েছে) হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউনকে একথাই বলেছেন যে, তুমি বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর? তুমি বিশ্ব সৃষ্টির রহস্য সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা কর, আল্লাহ পাকের অস্তিত্বের অগণিত প্রমাণ দেখতে পাবে, বস্তু জগতের প্রতিটি অণু পরমাণু তার স্রষ্টা ও পালনকর্তার অস্তিত্বের স্বাক্ষর বহন করছে, দিন ও রাতের পরিবর্তন, সকাল-সন্ধ্যার আগমন, বিশাল বিস্তৃত নীলাভ আকাশ এবং বিশাল জমীন ও তার মধ্যে পাহাড়-পর্বত এবং নদ-নদীর সৃজনে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত হেকমত, তাঁর সৃষ্টি-নৈপূণ্যের অগণিত নিদর্শন বিদ্যমান রয়েছে।

اِنْ كُنْتُمْ مُّوْقِنِيْنَ

যদি তোমরা বিশ্বাস কর, তবে দেখবে যা আমি বলেছি তাই সত্য।

বস্তুতঃ যে সত্য-সন্ধানী, যে কল্যাণকামী সে অবশ্যই বিশ্ব-সৃষ্টির এই সমস্ত নিদর্শন প্রত্যক্ষ করে আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করে। কিন্তু যারা ভাগ্যাহত, যারা বিবেক-বুদ্ধির সদ্ব্যবহার না করার সংকল্প গ্রহণ করে, অথবা যারা আদতেই নির্বোধ শুধু তারাই আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে না।

قَالَ لِمَنْ حَوْلَهٗٓ اَلَا تَسْتَمِعُوْنَ

"ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, তোমরা কি শ্রবণ করছো না"?

হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাব শ্রবণ করে ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে লক্ষ্য করে বিদ্রুপের সুরে বলল, তোমরা কি শ্রবণ করছো না যে মূসা কেমন জবাব দিচ্ছে! এ ব্যক্তি মনে করে যে আমি ব্যতীত তোমাদের কোন প্রতিপালক আছে, আর এ ব্যক্তি এ ধারণাও পোষণ করে যে, আসমান জমীনেরও কোন প্রতিপালক আছে, এসব তো আবহমান কাল ধরেই আছে, এগুলোর জন্যে কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই, আর পৃথিবীতে যা কিছু পরিবর্তন হয়, তাতো শুধু

তারকারাজির বিভিন্ন অবস্থার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ হয়। এভাবে ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিভ্রান্তির বেড়াজালে আবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছে, অথচ আল্লাহ্ পাক পবিত্র কোরআনে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেনঃ

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ (সূরা যুমার)

"আল্লাহ্ পাকই সব কিছু স্রষ্টা"। পবিত্র কোরআনে আরো এরশাদ হয়েছেঃ

بَدِيْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরা বাকারা)

"তিনিই আসমান ও জমিনের স্রষ্টা"।

لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরা হাদীদ)

"আসমান ও জমীনের রাজত্ব একমাত্র আল্লাহ্ পাকেরই"।

لَهٗ مَقَالِيْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (সূরা যুমার)

"আসমান ও জমীনের ক্ষমতার চাবিকাঠি একমাত্র তাঁরই হাতের মুঠোয়"।

اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (সূরা বাকারা)

"নিশ্চয় আল্লাহ্ পাক সর্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ ক্ষমাবান"।

لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَيْءٌ (সূরা শুরা)

"আল্লাহ্ পাক নিরাকার, তাঁর কোন স্বরূপ বা দৃষ্টান্ত নেই, তিনি অদ্বিতীয়"।

এসব কথার প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করার মাধ্যমেই একজন মানুষ তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনকারী হতে পারে, ফেরাউন শুধু নিজেই মূর্খতার ঘনান্ধকারে আচ্ছন্ন ছিলনা; বরং তার সমগ্র জাতিকেও সে গোমরাহীর গোলক ধাঁধায় ফেলে রেখেছিল। আসমান জমীন, চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-তারা তথা বিশ্ব সৃষ্টির স্রষ্টা সম্পর্কে তার কোন ধারণাই নেই, তাই হযরত মূসা (আঃ) তাকে আরেকটি জবাব দিলেন, যাতে করে তার ভ্রান্ত ধারণার অবসান ঘটে। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ اٰبَآئِكُمُ الْاَوَّلِيْنَ

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, বিশ্ব প্রতিপালক তিনিই, যিনি তোমাদেরও প্রতিপালক এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষদেরও প্রতিপালক। ফেরাউন মনে করতো আসমান ও জমীন আবহমান কাল ধরে আছে, এর কোন স্রষ্টার প্রয়োজন নেই।

ইতিপূর্বে হযরত মূসা (আঃ) তার প্রথম কথার প্রতি উত্তর দিয়েছিলেন, কিন্তু একথা সবারই জানা যে এক সময় এমনও ছিল যখন ফেরাউন ছিলনা, তার দলবলও ছিলনা, আর এমনও সময় আসবে যখন এদের কেউ থাকবেনা, এ আগমন এবং গমন আর এ উত্থান এবং পতন কার হুকুমে হয়? এ বিষয়টি সকলেরই মনে জিজ্ঞাসা হিসেবে আসতে পারে। কেননা,

মানব জীবন আসমান জমীনের ন্যায় স্থায়ী থাকেনা, অতএব, হযরত মূসা (আঃ)-এর এ জবাব প্রত্যেকের মনে রেখাপাত করে। হে ফেরাউন! যিনি তোকে সৃষ্টি করেছেন, লালন-পালন করছেন, দুনিয়ার অনেক নেয়ামত দান করেছেন, তিনিই বিশ্ব প্রতিপালক, আর আমি তাঁরই রসূল, তিনিই সমগ্র মানব জাতির স্রষ্টা, তিনিই প্রত্যেককে দান করেন জীবন ও মৃত্যু। অতএব, তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা প্রতিটি মানুষের একান্ত কর্তব্য।

হযরত মূসা (আঃ)-এর জবাব শ্রবণ করে ফেরাউন অত্যন্ত বিহবল হলো এবং তার ভয় হলো এ দলিল শ্রবণ করে হয়তো তার জাতির মূর্খতার অন্ধকার কেটে যাবে এবং তার প্রতি তাদের যে আনুগত্য রয়েছে, তা দূরীভূত হবে। তাই সে বলল,

قَالَ اِنَّ رَسُوْلَكُمُ الَّذِىْٓ اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجْنُوْنٌ

"ফেরাউন তার পারিষদকে লক্ষ্য করে বলল, যাকে তোমাদের নিকট রসূল করে পাঠানো হয়েছে, তিনি প্রকৃত অবস্থায় একজন পাগল"। তার কথায় কর্ণপাত করোনা, কেননা মানুষকে মৃত্যুদণ্ড আমরাই দিয়ে থাকি আর মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিয়ে তার জীবন আমরাই রক্ষা করি অতএব, জীবন ও মৃত্যু তো আমাদেরই হাতে।

ফেরাউন একথা বলে মানুষকে পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে চাইল। তখন হযরত মূসা (আঃ) তার তৃতীয় জবাব পেশ করলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا

হযরত মূসা (আঃ) বললেন, বিশ্ব প্রতিপালক তিনিই, যিনি প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য এবং তার মাঝের সবকিছুর মালিক, স্রষ্টা ও পালনকর্তা, সূর্যোদয় এবং অস্ত তাঁর হুকুমেই হয়, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন, সকাল সন্ধ্যার পরিবর্তন, রাত ও দিনের আগমন ও নির্গমন-সবই এক আল্লাহ পাকের হুকুমেই হয়ে থাকে, এ ফেরাউন যে তোমাদের উপর বসে আছে, এসব বিষয়ে তার কোন ক্ষমতাই নেই।

اِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ

যদি তোমরা বুঝতে পার। অর্থাৎ আমি যে জবাব দিয়েছি তা অনুধাবন করার মত শক্তি যদি থাকে তবে আমার কথার সত্যতা তোমরা উপলব্ধি করবে।

হযরত মূসা (আঃ) সর্বপ্রথম বিনম্র ভাষায় কথা বলেন। কিন্তু যখন তিনি লক্ষ্য করলেন যে ফেরাউন কঠোর ভাষায় কথা বলছে তখন তিনিও অনুরূপ বর্ণনা-শৈলী অবলম্বন করলেন। সাধারণতঃ মূর্খ লোকেরা যখন কথাবার্তায় অপারগ হয় তখন হুমকি ধমকির পথ অবলম্বন করে। ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর কথার জবাব দিতে অক্ষম হল, সেও অনুরূপ পথ অবলম্বন করলো। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ لَئِنِ اتَّخَذْتَ اِلٰهًا غَيْرِىْ لَاَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُوْنِيْنَ

(ফেরাউন বলে, যদি তুমি আমাকে ব্যতীত অন্য কোন প্রতিপালক গ্রহণ করে থাক তবে আমি অবশ্যই তোমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করবো) ফেরাউন যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর সুস্পষ্ট এবং অকাট্য দলিল-প্রমাণের প্রতি-উত্তর দিতে অক্ষম হল তখন সে বললো, তুমি যদি

আমাকে ব্যতীত অন্য কোন প্রভু মান তবে আমি তোমাকে বন্দীদের অন্তর্ভুক্ত করবো অর্থাৎ তোমাকে জেলখানায় পাঠিয়ে দেব।

কালবী (রঃ) বলেছেন যে, ফেরাউনের জেলখানা মৃত্যুর চেয়েও কষ্টকর ছিল। যাকে জেলখানায় প্রেরণ করা হত, তার মৃত্যু অনিবার্য হত। গভীর এবং অন্ধকার কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করে উপর দিয়ে বন্ধ করে দেয়া হত। অবশেষে সেখানেই বন্দীর মৃত্যু হত।[১]

قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُّبِينٍ

মূসা (আঃ) বলেন, (তুমি কি আমাকে এমন অবস্থায়ও বন্দী করবে?) যখন আমি তোমার সম্মুখে আমার সত্যতার এবং তোমার পথভ্রষ্টতার কোন সুস্পষ্ট নিদর্শন উপস্থাপন করি।

قَالَ فَأْتِ بِهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

"ফেরাউন বলল, এমন কোন সুস্পষ্ট কিছু থাকলে হাযির কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও"।

فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ

তখন মূসা (আঃ) তার লাঠি মাটিতে ফেলে দেন যা সঙ্গে সঙ্গে এক বিরাটকায় অজগরে পরিণত হয়। যখন ঐ অজগর আত্মপ্রকাশ করল, তখন ফেরাউন আর তার পারিষদবর্গ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পলায়নপর হলো এবং আত্মরক্ষার চেষ্টায় রত হলো। খোদায়ী দাবীদারের প্রকৃত অবস্থা উন্মোচিত হলো।

হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠিটিকে জমীন থেকে তুলে নিলেন, তখন তা পুনরায় লাঠিতে রূপান্তরিত হলো। এরপর ফেরাউন এবং তার লোকদের ভয়-ভীতি কমল, তারা যেন চেতনা ফিরে পেল, তখন ফেরাউন বলল, এতদ্ব্যতীত আরো কোন মোজেযা আছে কি? হযরত মূসা (আঃ) তখন তাঁর দ্বিতীয় মোজেযা দেখালেন।

وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاءُ لِلنَّاظِرِينَ

"আর মূসা তার হাত বের করেন, দর্শকরা তখন তা শুভ্র সমুজ্জ্বল দেখতে পায়"।

হযরত মূসা (আঃ) যখন তাঁর হাত বের করলেন, সঙ্গে সঙ্গে তার আলোর কিরণগুলো বিচ্ছুরিত হতে লাগলো, তখন ফেরাউন বিহবল হয়ে গেল।

হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযার তাৎপর্য

তফসীরকারগণ বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে দু'টি মোজেযা দান করেছেন। একটি হলো লাঠি, এর দ্বারা কাফের মুশরেক তথা পাপীষ্ঠদেরকে সতর্ক করা হয়েছে, মৃত্যুর পর কবরে অজগর সর্প তাদেরকে লাগাতার দংশন করতে থাকবে, যতদিন লোকটি কবরে থাকবে, ততদিন বিষাক্ত সর্পের দংশন অব্যাহত থাকবে। আর হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বিতীয় মোযেজা হল, তাঁর শুভ্র সমুজ্জ্বল হাত। এর তাৎপর্য হলো এর মাধ্যমে নূরের নমুনা পেশ করা হয়েছে যা মানুষের অন্তরকে আলোকিত করে দেয়। কিন্তু যাদের অন্তর অন্ধ হয়ে থাকে

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৮
তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫১৭

তারা সূর্যের আলো কখনো দেখেনা। লাঠির মোজেযা ছিল আযাবের প্রতীক, আর সমুজ্জ্বল হাতের মোজেযা হলো আলোর প্রতীক। আল্লাহ পাক যাকে হেদায়েতের নূর দান করেন, তার জীবনই হয় সার্থক এবং সুন্দর।[১]

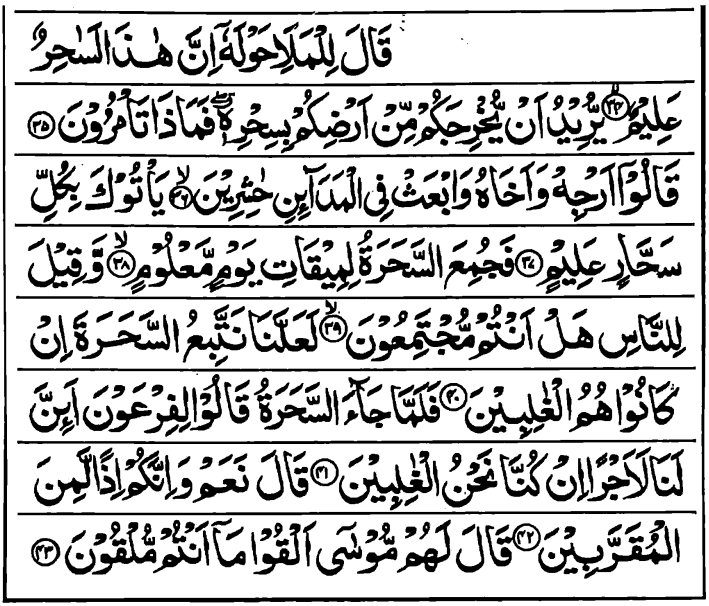
قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُۥٓ إِنَّ هَٰذَا لَسَٰحِرٌ
عَلِيمٌ ﴿٣٤﴾ يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِۦ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ ﴿٣٥﴾
قَالُوٓا۟ أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَٱبْعَثْ فِى ٱلْمَدَآئِنِ حَٰشِرِينَ ﴿٣٦﴾ يَأْتُوكَ بِكُلِّ
سَحَّارٍ عَلِيمٍ ﴿٣٧﴾ فَجُمِعَ ٱلسَّحَرَةُ لِمِيقَٰتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ ﴿٣٨﴾ وَقِيلَ
لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ ٱلسَّحَرَةَ إِن
كَانُوا۟ هُمُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤٠﴾ فَلَمَّا جَآءَ ٱلسَّحَرَةُ قَالُوا۟ لِفِرْعَوْنَ أَئِنَّ
لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ ٱلْغَٰلِبِينَ ﴿٤١﴾ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ
ٱلْمُقَرَّبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ لَهُم مُّوسَىٰٓ أَلْقُوا۟ مَآ أَنتُم مُّلْقُونَ ﴿٤٣﴾

তরজমা

(৩৪) ফেরাউন তার পারিষদবর্গকে বলল, নিশ্চয় এ এক অত্যন্ত সুদক্ষ যাদুকর।

(৩৪) সে তোমাদেরকে তার যাদু বলে দেশ থেকে বের করে দিতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা কি করতে বলো?

(৩৬) তারা বললো, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর।

(৩৭) তারা যেন তোমার নিকট প্রত্যেকটি বড় বড় অভিজ্ঞ যাদুকর উপস্থিত করে।

(৩৮) এরপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হলো।

(৩৯) আর জনসাধারণকে বলা হয় তোমরাও কি সমবেত হবে?

(৪০) যাদুকররা যদি জয়লাভ করে তবে হয়তো আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি।

(৪১) এরপর যাদুকররা ফেরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয় লাভ করি, তবে কি আমাদের জন্যে পুরষ্কার থাকবে?

(৪২) ফেরাউন বলে অবশ্যই, অধিকন্তু তোমরা আমার ঘনিষ্ঠ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(৪৩) মূসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর।

---

[১] তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২১৮-১৯

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর দু'টি মোজেযা দেখে ভীত হলো যে, হয়তো তার পারিষদবর্গ হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান না এনে ফেলে, তাই তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার লক্ষ্যে বলল, এ হলো একজন সুদক্ষ যাদুকর, যাদুকরী বিদ্যায় সে নিঃসন্দেহে পারদর্শী। হযরত মূসা (আঃ)-এর ব্যাপারে তাদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টির লক্ষ্যে সে বলল, এ ব্যক্তি তার যাদুবিদ্যা বলে তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করতে চায়, এমন অবস্থায় তোমরা আমাকে কি পরামর্শ দাও?

তফসীরকারগণ লিখেছেন, যে ব্যক্তি ইতিপূর্বে খোদায়ী দাবী করেছিল এবং একদল লোককে বশীভূত করে রেখেছিল, সে এখন হযরত মূসা (আঃ)-এর দু'টি মোজেযা দেখে নিজেকে এত অসহায় মনে করছে যে, আত্মরক্ষার জন্যে তার পারিষদবর্গের নিকট পরামর্শ চাইছে। ফেরাউনের অন্তরে এ ভয় সৃষ্টি হয়েছে যে মূসা (আঃ) অবশেষে বিজয় লাভ করবেন, এবং তার সকল জারি-জুরি ফাঁস হয়ে যাবে, তাই সে তাদেরকে বলেছে, মুসা (আঃ) যাদু বলে তোমাদের উপর কর্তৃত্ব করতে চায় এবং নিজে তোমাদের বাদশাহ হতে চায়।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, মানুষ অন্যের সম্পর্কে ধারণা করে নিজের উপর বিচার করে, অর্থাৎ যে যেমন অন্যকেও তেমনই মনে করে। ফেরাউন মানুষের উপর কর্তৃত্ব কায়েম করে রেখেছিল। বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, সর্বত্র তার ক্ষমতা এবং প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। হযরত মূসা (আঃ)-কে দেখে সে প্রথম এ ধারণাই করেছে যে, হয়তো তিনি এসেছেন তার রাজত্ব ছিনিয়ে নিতে এবং নিজের রাজত্ব কায়েম করতে। অথচ তাঁকে প্রেরণ করা হয়েছে তার হেদায়েতের উদ্দেশ্যে, তাকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসতে, তাকে চিরশান্তি প্রদান করতে। কিন্তু ফেরাউন ছিল হতভাগা, হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্পর্কে সে ভুল ধারণা করেছে।

আর সেজন্যে সে তার আপন লোকদের সঙ্গে পরামর্শ করল।

قَالُوْٓا اَرْجِهْ وَاَخَاهُ وَابْعَثْ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

"তারা বলল, তাকে ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দাও এবং শহরে শহরে নকীব প্রেরণ কর"।

ফেরাউনের মোসাহেবরা তাকে এ পরামর্শ দিল যে, আপাততঃ মূসা ও তার ভাইকে কিছু অবকাশ দিয়ে সারা দেশ থেকে বড় বড় যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হোক।

এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে ফেরাউন শুধু যে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়েছিল তাই নয়; বরং ঐ মুহূর্তে তার পূর্বের আত্মম্ভরিতা কর্পূরের মত উড়ে যায় এবং সে তার মোসাহেবদের সাহায্য প্রার্থনা করে। তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হক্ব বা সত্যের একটা নিজস্ব শক্তি থাকে, বাতিল যত শক্তিশালীই হোক না কেন হক্বের মুখোমুখি হওয়া বাতিলের পক্ষে সম্ভব হয় না। হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে তাঁর একমাত্র সাথী ছিলেন হযরত হারুন (আঃ), তাঁর কোন সৈন্যবাহিনী ছিলনা, কোন প্রকার জাগতিক শক্তি তাঁর ছিলনা, কিন্তু তিনি ছিলেন সত্য-সাধক, তিনি ছিলেন সত্যের দিকে আহবায়ক, আর তিনি ছিলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী রসূল। তাঁর নিকট রুহানী বা আধ্যাত্মিক শক্তি ছিল, দোর্দণ্ড প্রতাপের অধিকারী ফেরাউন তাই তাঁর মোকাবেলা করতে সাহস করেনি; সে তাঁকে

যাদুকর মনে করেছে এবং দেশের সমস্ত বড় বড় যাদুকরদেরকে তাঁর মোকাবেলা করার জন্যে একত্রিত করেছে।

فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ

(এরপর এক নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট সময়ে যাদুকরদেরকে একত্রিত করা হলো) বর্ণিত আছে, মোসাহেবদের পরামর্শের পর ফেরাউন সারা দেশে তার লোকদেরকে প্রেরণ করল এবং দেশের আনাচে-কানাচে ঘুরে বড় বড় যাদুকরদের একত্রিত করার ব্যবস্থা করল।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, সেদিন ছিল শনিবার, তাদের জাতীয় উৎসবের দিন সকাল বেলা চতুর্দিকে আলো হলে যাদুকর এবং জনসাধারণ একত্রিত হলো–

وَّقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنتُم مُّجْتَمِعُونَ

"আর জনসাধারণকে বলা হয় তোমরাও কি সমবেত হবে"?

অর্থাৎ ফেরাউন শুধু যাদুকরদেরকেই একত্রিত করেনি; বরং তাদের পাশাপাশি জনসাধারণের ব্যাপক সমাবেশেরও ব্যবস্থা করে, উন্মুক্ত ময়দানে অতি উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে সকলে একত্রিত হলো–

لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِن كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ

যাদুকররা যদি জয়লাভ করে তবে হয়তো আমরা তাদের অনুসরণ করতে পারি, আর যাদুকরদের পথই যে সত্য পথ-এতেও কারো কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবেনা।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যাদুকর বলতে উদ্দেশ্যে করা হয়েছে হযরত মূসা (আঃ) ও হারুন (আঃ)-কে। কেননা, ফেরাউন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখে তাঁকে সুদক্ষ যাদুকর বলেছিল। যদি এ অর্থ গ্রহণ করা হয়, তবে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এমন, যদি যাদুকরদের মোকাবেলায় মূসা ও হারুন (আঃ) বিজয়ী হন, তবে হয়তো আমরা তাঁদের অনুসরণ করব।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) আলোচ্য আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেনঃ ইতোপূর্বে ফেরাউনের সঙ্গে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছে, এখন কার্যতঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ফেরাউনের যাদুকরদের মোকাবেলা হবে, তাদের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ পাকের নূরকে নিস্প্রভ করা, আর আল্লাহ পাকের ইচ্ছা হলো ঐ নূরকে উদ্ভাসিত করা। তাই আল্লাহ পাকের ইচ্ছাই বিজয় লাভ করল, আর কাফেরদের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হলো। একথা সর্বজন-বিদিত যখনই ঈমান এবং কুফরীর মোকাবেলা হয়েছে তখন ঈমানই বিজয় লাভ করেছে। কেননা, আল্লাহ পাক সর্বদা বাতিলের মোকাবেলায় হক্বকে বিজয় দান করে থাকেন। হক্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, বাতিল নিশ্চিহ্ন হয়, এক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। প্রত্যেক শহরে ফেরাউন তার প্রতিনিধি প্রেরণ করেছে। সারা দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে দক্ষ যাদুকরদের একত্রিত করা হয়েছে।

যাদুকরদের সংখ্যা

যাদুকরদেরদের সংখ্যার ব্যাপারে একাধিক বর্ণনা রয়েছে। ১২ অথবা ১৫ অথবা ১৭ অথবা ১৯ অথবা ৩০ অথবা ৮০,০০০ অথবা তার চেয়ে কম বা বেশী। তাদের সঠিক সংখ্যা আল্লাহ পাকই জানেন। তাদের সকলের ওস্তাদ বা নেতা ছিল চারজন। সাবুর, আজুর, হতহত এবং মাসহাফী।

যেহেতু এ ঘটনা সারা দেশে এক বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল তাই চতুর্দিক থেকে নিদৃষ্ট সময়ের পূর্বেই বহু লোক একত্রিত হয়, সকলের মুখে একই কথা যাদুকরদের বিজয় হলে আমরা তাদের অনুসারী হবো। কারো মুখে একথা ছিলনা যে, আমরা সত্যের অনুসারী হবো, বাতিল বা অসত্যের অনুসারী হবোনা,

فَلَمَّا جَآءَ السَّحَرَةُ قَالُوْا لِفِرْعَوْنَ اَئِنَّ لَنَا لَاَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغٰلِبِيْنَ

"এরপর যাদুকররা যখন আসল তখন ফেরাউনকে বলল, যদি আমরা বিজয় লাভ করি তবে কি আমাদের জন্যে পুরস্কার থাকবে"?

অর্থাৎ যাদুকররা ফেরাউনের নিকট তাদের পুরস্কারের দাবী পেশ করল, যদি তারা বিজয়ী হয় তবে তাদের পুরস্কার পাওয়া উচিত। ফেরাউন তাদের এ দাবীর প্রতি-উত্তরে বলল,

قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ

"ফেরাউন বলল অবশ্যই, অধিকন্তু তোমরা আমার ঘনিষ্ট লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

অর্থাৎ তোমাদের পুরস্কার তো অবশ্যই পাবে তদুপরি তোমাদেরকে শুধু পুরস্কারই দেবনা, বরং তোমাদেরকে আমার নিকট উচ্চ স্থান দেব এবং আমার সভাসদ হওয়ার মর্যাদা দান করব।

قَالَ لَهُمْ مُّوْسٰٓى اَلْقُوْا مَآ اَنْتُمْ مُّلْقُوْنَ

"মূসা তাদেরকে বললেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা নিক্ষেপ কর"।

অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে তাদের যাদুকরী প্রদর্শন করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু এতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, যাদুকরি হারাম হওয়া সত্বেও আল্লাহর নবী মূসা (আঃ) কিভাবে এর আদেশ দিলেন? তত্ত্বজ্ঞানীগণ এর জবাবে এক্ষেত্রে বলেছেনঃ যাদুকরির জন্যে আদেশ দেয়া উদ্দেশ্য নয়; বরং এর অনুমতি প্রদান করা হয়েছে। আর তা এজন্যে যে যাদু প্রদর্শনীর পরই হযরত মূসা (আঃ) তাঁর মোজেযা প্রকাশ করতে পারবেন।

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেন, হযরত মূসা (আঃ)-কে হয়তো এলহামের মাধ্যমে জানানো হয়েছিল কি হবে? তাই তিনি তাদেরকে যাদু প্রদর্শনের অনুমতি দিয়েছেন।

فَأَلْقُوا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ
الْغَالِبُونَ ﴿٤٤﴾ فَأَلْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ ﴿٤٥﴾
فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ ﴿٤٦﴾ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٤٧﴾ رَبِّ مُوسَىٰ
وَهَارُونَ ﴿٤٨﴾ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ ۖ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي
عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُم
مِّنْ خِلَافٍ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٤٩﴾ قَالُوا لَا ضَيْرَ ۖ إِنَّا إِلَىٰ
رَبِّنَا مُنقَلِبُونَ ﴿٥٠﴾ إِنَّا نَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا أَن كُنَّا أَوَّلَ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿٥١﴾

তরজমা

(৪৪) ফলে তারা তাদের দড়ি এবং লাঠি নিক্ষেপ করে, আর তারা বলে, ফেরাউনের সম্মানের শপথ! আমরাই বিজয়ী হবো।

(৪৫) এরপর মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি নিক্ষেপ করেন, দেখতে দেখতে তা তাদের অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে।

(৪৬) ফলে যাদুকররা সেজদায় পতিত হয়।

(৪৭) তারা বলে, আমরা ঈমান আনলাম বিশ্ব প্রতিপালকের উপর।

(৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের প্রতিপালক।

(৪৯) ফেরাউন বলে, তোমরা কি আমার অনুমতি লাভের পূর্বেই তাতে বিশ্বাস করলে? এতো হলো তোমাদের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদুবিদ্যা শিখিয়েছে। তোমরা অতি শীঘ্র টের পাবে। আমি তোমাদের একদিকের হাত এবং অন্যদিকের পা কেটে দেব এবং তোমাদের সকলকে অবশ্যই ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাবো।

(৫০) যাদুকররা বলে কোন ক্ষতি নেই, আমরা আমাদের প্রতিপালকের নিকটই প্রত্যাবর্তন করব।

(৫১) নিশ্চয় আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কারণ আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, মূসা (আঃ) ফেরাউনের ডাকে সমবেত যাদুকরদেরকে বলেছেন, তোমাদের যা নিক্ষেপ করার তা কর, তথা তোমাদের যাদু বিদ্যা প্রদর্শন কর, যেমন মক্কার কাফেরদেরকে বলা হয়েছে,

فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ.....إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ

"যদি তোমরা সত্যবাদী হও, তবে কোরআনে করীমের অনুরূপ কোন সূরা উপস্থাপন কর"। ঠিক এভাবে হযরত মূসা (আঃ) যাদুকরদেরকে বলেছেনঃ যা তোমাদের কাছে আছে তা প্রকাশ কর।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর আহ্বানে সাড়া দিয়ে তাদের দড়ি এবং লাঠি মাটিতে ফেলে যা সর্পে রূপান্তরিত হয়ে হযরত মূসা (আঃ)-এর দিকে এগিয়ে আসতে থাকে, এ অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) তাঁর লাঠি ফেললেন যা এক বিরাট অজগর হয়ে যাদুকরদের সর্পরূপী অলীক সৃষ্টিগুলোকে গ্রাস করতে শুরু করে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, যখন যাদুকররা তাদের লাঠি এবং দড়ি নিক্ষেপ করেছিল, তখন এক বিরাট ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে হযরত মূসা (আঃ)-কে বলা হয়, তোমার লাঠি নিক্ষেপ কর যা সঙ্গে সঙ্গে অজগরের রূপ ধারণ করে এবং যাদুকরদের ছেড়ে দেয়া সর্পগুলোকে গ্রাস করতে আরম্ভ করে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجِدِينَ. قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَلَمِينَ.

"ফলে যাদুকররা সেজদায় পতিত হয়, তারা বলে আমরা ঈমান আনলাম বিশ্ব প্রতিপালকের প্রতি"।

অর্থাৎ যাদুকররা যখন দেখলো যে, তাদের যাদুবিদ্যার যা কিছু তেলেসমাতি ছিল তা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে এবং এ সত্যও তারা উপলব্ধি করলো যে, হযরত মূসা (আঃ) যাদুকর নন, আর তাঁর কর্মও যাদুকরী নয়; বরং তার চেয়ে ঊর্ধ্বে অন্য কিছু, নিশ্চয় এটি আল্লাহ পাক প্রদত্ত মোজেযা, তারা নিজেদেরকে আর নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলো না। তাই সঙ্গে সঙ্গে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের উদ্দেশ্যে তারা সেজদায় পড়ে গেলো, আল্লাহ পাক তাদেরকে তওবা করার তওফিক দান করলেন এবং তাদের তওবা কবুল করলেন।

যাদুকররা যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযার নিকট হেরে গেল, তখনই তারা উপলব্ধি করলো যে, যদি এটি যাদুকরীর ব্যাপার হতো তবে আমাদের সাফল্যই ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু যেহেতু আমাদের যাদুকরী বিদ্যার সকল শক্তি খতম হয়ে গেছে তাই এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে এটি যাদুকরের যাদু নয়; বরং সত্য নবীর মোজেযা। তাই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যত ও রেসালতে বিশ্বাস করলো এবং আল্লাহ রব্বুল আলামীনের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান আনলো।

رَبِّ مُوسَىٰ وَهَٰرُونَ

"মূসা ও হারুনের প্রতিপালক"। এ কথাটি বলার উদ্দেশ্য হলো আমাদের ঈমান আনয়নের কারণ হলো সেই মোজেযা যা হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে।

قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ

ফেরাউন বলে তোমরা কি আমার অনুমতি লাভের পূর্বেই তা বিশ্বাস করলে? অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-এর বিরুদ্ধে যে যাদুকরদেরকে ফেরাউন ডেকে এনেছিলো, তারাই যখন হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি বিশ্বাস করলো তখন ফেরাউন ক্রোধে ফেটে পড়লো এবং যাদুকরদেরকে ধমক দিয়ে বললো, তোমরা আমার অনুমতি লাভের পূর্বেই তাঁর প্রতি ঈমান আনলে? আমার নির্দেশের অপেক্ষাও করলে না?

নিশ্চয় এটি হলো তোমাদের ষড়যন্ত্র। আর এ ষড়যন্ত্র হলো তোমাদের পূর্ব পরিকল্পিত। আর মূসাই হলো তোমাদের গুরু। সে-ই তোমাদেরকে যাদু বিদ্যা শিক্ষা দিয়েছে। তোমরা যে মূসার নিকট এভাবে পরাজয় স্বীকার করে নেবে তা ছিল তোমাদের পূর্বের সিদ্ধান্ত।

ফেরাউন শঙ্কিত হলো যে, যাদুকররা যখন ঈমান এনে ফেলেছে তখন তার জাতিও হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপনের কথা চিন্তা করবে। তাই সে তার জাতিকে প্রতারণা করার জন্যে যাদুকরদেরকে হুমকি-ধমকি দিতে লাগলো। সে বললো, فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ তোমরা অচিরেই টের পাবে, তোমাদের এ অন্যায়ের শাস্তি কি হয়?

لَاُقَطِّعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ

আমি তোমাদের হাত পা বিপরীতভাবে কেটে দেব এবং তোমাদেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে এর শাস্তি দেব। বর্ণিত আছে যে, অপরাধীদের এ ধরণের শাস্তির প্রথা তদানীন্তন মিশরে প্রচলিত ছিল।[১]

قَالُوْا لَا ضَيْرَ اِنَّآ اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ

ঈমানের দৃঢ়তার অপূর্ব দৃষ্টান্ত

যাদুকররা ফেরাউনের হুমকি-ধমকিতে এতোটুকু ভীত-সন্ত্রস্ত হয়নি এমনকি, বিচলিতও হয়নি। প্রকৃত ঈমানদারের ন্যায় তারা জালেম ফেরাউনকে জবাব দিয়েছে তুমি যত শাস্তির ব্যবস্থাই কর না কেন, কোন পরোয়া নেই। অবশেষে একদিন তো অবশ্যই আমাদেরকে আমাদের প্রতিপালকের দরবারে হাযির হতে হবে, যে কোনভাবে মৃত্যু আমাদের নিকট পৌঁছবেই। অতএব, তোমাদের হাতেই শাহাদাতের মৃত্যুবরণ করবো, এতে আমাদের কোন ভয় নেই। নিঃসন্দেহে এটি ছিল ঈমানের দৃঢ়তার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত।

সুবহানাল্লাহ! কত মজবুত এবং সুদৃঢ় ছিল তাঁদের ঈমান! কিছুক্ষন আগেই ঈমান নসীব হয়েছে আর এরই মধ্যে এতো সুদৃঢ় হয়েছে যে, জালেম ফেরাউনের সম্মুখে দাঁড়িয়ে নির্ভীক চিত্তে তার কথার দাঁতভাঙ্গা জবাব দিয়েছেন। মূলতঃ যখন অন্তর থেকে গোমরাহীর অন্ধকার দূরীভূত হয়, যখন ঈমান অন্তরের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সুদৃঢ় হয় তখন জাগতিক শক্তির প্রতি মানুষের নজর থাকেনা এবং এমন অবস্থায় দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি। এ বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস যতো সুদৃঢ় হয় ততই মঙ্গলজনক।

اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطٰيٰنَآ اَنْ كُنَّآ اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৪৮

"নিশ্চয় আমরা আশা করি যে, আমাদের প্রতিপালক আমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন, কেননা আমরা সকলের আগে ঈমান এনেছি"।

ফেরাউনের মত একজন নিষ্ঠুর, অত্যাচারী রাজার বিদ্রোহী হয়ে সর্বপ্রথম এক আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছে যাদুকরগণ, তাই তাদের আশা এবং বিশ্বাস যে আল্লাহ পাক দয়া করে তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

যাদুকরদের কথায় একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের প্রতি তাদের ঈমান ও বিশ্বাস এত সুদৃঢ় হয়েছে যে, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের কোন গুরুত্ব আর তাদের অন্তরে রয়নি। আখেরাতের চিরস্থায়ী জিন্দেগীর সাফল্যের জন্যে যদি এ জীবনের অবসানও ঘটে তাতেও তাদের কোন আপত্তি নেই। ফেরাউনের সম্প্রদায়ের মধ্যে সর্বপ্রথম তারাই ঈমান আনার তওফিক পেয়েছে আর এ কারণে তারা বিশেষ ফজিলত ও মর্যাদার আশা করে, যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি যারা প্রথম ঈমান এনেছেন তাদের ফজিলত ও মর্তবা সর্বজনস্বীকৃত, পবিত্র কোরআনেই রয়েছে তার ঘোষণাঃ

وَالسَّابِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

যাদুকরদের পরিণতি

যাদুকরদের ঈমান আনার পর তাদের পরিণতি কি হয়েছে পবিত্র কোরআনে সে সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ঘোষণা নেই, তবে আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, ফেরাউন তাদের সকলকে হত্যা করেছে, তারা সকলেই শাহাদাতের উচ্চ মর্তবা লাভ করেছেন। এবনে কাসীরের ভাষায়ঃ

فَقَتَلَهُمْ كُلَّهُمْ

"অতঃপর ফেরাউন তাদের সকলকে হত্যা করেছে"।[১]

যাদুকরদের এখলাস

ইমান রাজী (রহঃ) লিখেছেন, আলোচ্য ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে যাদুকরগণ ঈমানের পাশাপাশি এখলাসের উচ্চ মর্তবাও লাভ করেছিলেন। কেননা তারা সওয়াবের আশায় বা আযাবের ভয়ে ঈমান আনেননি, বরং তাঁরা ঈমান এনেছেন এক আল্লাহ পাকের মহব্বতে। আল্লাহ পাকের মা'রেফাতের নূর তারা লাভ করেছিলেন। এজন্যে তারা বলেছেন, ফেরাউন তুমি যত শাস্তির ব্যবস্থাই কর না কেন আমাদের কোন পরোয়া নেই কেননা, অবশেষে আমাদেরকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারেই হাযির হতে হবে। সে হাযিরী যেভাবেই হোক না কেন। এর দ্বারা আল্লাহ পাকের প্রতি পরিপূর্ণ ঈমান, কামেল ইয়াকীন এবং সুদৃঢ় বিশ্বাসের বহিঃপ্রকাশ হয়েছে।[২]

১। তফসীরে এবনে কাসীর (আরবী) খন্ড-৩, পৃষ্ঠা-৩৩৫
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৩৫-৩৬

وَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْۤ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ ۝٥٢
فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ۝٥٣ اِنَّ هٰۤؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ
قَلِيْلُوْنَ ۝٥٤ وَاِنَّهُمْ لَنَا لَغَآئِظُوْنَ ۝٥٥ وَاِنَّا لَجَمِيْعٌ حٰذِرُوْنَ ۝٥٦
فَاَخْرَجْنٰهُمْ مِّنْ جَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ۝٥٧ وَّكُنُوْزٍ وَّمَقَامٍ كَرِيْمٍ ۝٥٨ كَذٰلِكَ
وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِىْۤ اِسْرَآءِيْلَ ۝٥٩ فَاَتْبَعُوْهُمْ مُّشْرِقِيْنَ ۝٦٠ فَلَمَّا تَرَآءَ
الْجَمْعٰنِ قَالَ اَصْحٰبُ مُوْسٰۤى اِنَّا لَمُدْرَكُوْنَ ۝٦١ قَالَ كَلَّا ۚ اِنَّ مَعِىَ
رَبِّىْ سَيَهْدِيْنِ ۝٦٢ فَاَوْحَيْنَاۤ اِلٰى مُوْسٰۤى اَنِ اضْرِبْ بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ؕ
فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيْمِ ۝٦٣ وَاَزْلَفْنَا ثَمَّ الْاٰخَرِيْنَ ۝٦٤

তরজমা

(৫২) এবং আমি মূসাকে এই নির্দেশ প্রদান করি যেন আমার বন্দাদেরকে নিয়ে রাতারাতি বের হয়ে যায়। নিশ্চয় তোমাদেরকে পেছন থেকে ধাওয়া করা হবে।

(৫৩) এরপর ফেরাউন শহরে শহরে লোক পাঠায়।

(৫৪) এই বলে যে তারা তো একটি ক্ষুদ্র দল।

(৫৫) অথচ তারা আমাদের ক্রোধের উদ্রেক করেছে।

(৫৬) এবং আমরা নিশ্চয় সকলে সর্বদা সতর্ক।

(৫৭) ফলে আমি তাদেরকে (ফেরাউন ও তার দলকে) তাদের বাগান এবং ঝর্ণা থেকে বহিস্কার করলাম।

(৫৮) এবং তাদের অর্থ ভান্ডার ও উত্তম সুরম্য প্রাসাদগুলো থেকেও।

(৫৯) এভাবেই ঘটেছিলো এবং আমি বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম সবকিছুর অধিকারী।

(৬০) এরপর সূর্যোদয়কালে ফেরাউন ও তার দল তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে।

(৬১) অবশেষে যখন উভয় দল একে অন্যকে দেখলো তখন মূসার লোকেরা বললো, নিশ্চয় আমরা ধরা পড়ে গেলাম।

(৬২) মূসা বললেন কখনও নয়, আমার প্রতিপালক যে আমার সঙ্গেই রয়েছেন, তিনি অতি সত্বর আমাকে পথ দেখাবেন।

(৬৩) এরপর আমি মূসার প্রতি ওহী প্রেরণ করলাম, তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর। ফলে তা বিভক্ত হয়ে পড়ে। আর তার প্রতিটি খন্ড বিশাল পর্বতের মত হয়ে যায়।

(৬৪) আমি সেখানে উপনীত করলাম অপর দলটিকে।

তফসীরুল কোরআন

ফেরাউন যাদুকরদের দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-এর মোকাবেলা করেছিলো। কিন্তু তার এ প্রয়াস সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। যাদুকররা হযরত মূসা (আঃ)-এর রেসালতের সত্যতায় বিশ্বাস করেছে। এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান এনেছে আর ফেরাউন হয়েছে অপমানিত। এতদসত্ত্বেও ফেরাউন এবং তার দলবল সত্যপথ গ্রহণ করেনি; বরং মোমেনদের প্রতি তার জুলুম অত্যাচার বাড়িয়ে দিয়েছে। যাদুকরগণ যখন আল্লাহ্ পাকের প্রতি তাদের ঈমানের কথা প্রকাশ করেছে তখনই সে তাদেরকে হত্যা করেছে।

সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত হযরত মূসা (আঃ) তাকে ঈমানের দাওয়াত দিয়েছেন, কিন্তু সে কর্ণপাত করেনি। তাই আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে তার শাস্তি বিধানের সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে আদেশ দিলেন, রাতের অন্ধকারে তুমি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে মিশর ত্যাগ কর। তবে একথা মনে রেখো যে, ফেরাউন ও তার দল তোমাদের পেছনে ধাওয়া করবে। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَوْحَيْنَآ اِلٰى مُوْسٰٓى اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِىْٓ اِنَّكُمْ مُّتَّبَعُوْنَ

"আর আমি মূসাকে আদেশ দিলাম, আমার বন্দাদেরকে নিয়ে রাত্রিকারে বের হয়ে পড়, তবে মনে রেখো তোমাদের পেছনে ধাওয়া করা হবে"।

আল্লাহ্ পাকের মর্জি হলো যেন মোমেনগণ ফেরাউনের জুলুম থেকে নাজাত পায় এবং ফেরাউন ও তার দলবল ধ্বংস হয়। তাই আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে উপরোক্ত নির্দেশ প্রদান করেন। আল্লাহ্ পাক যাকে ইচ্ছা তাকে রক্ষা করেন আর যাকে ইচ্ছা তাকে ধ্বংস করেন।

আল্লাহ্ পাকের হুকুম মোতাবেক হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বের হয়ে পড়লেন এবং লোহিত সাগরের দিকে যাত্রা করলেন, সকাল হওয়ার পরই ফেরাউনের লোকেরা জানতে পারে যে, হযরত মূসা (আঃ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে চলে গেছেন। ফেরাউন সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদ্ধাবনের ব্যবস্থা গ্রহণ করলো।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ

ফেরাউন বিভিন্ন শহরে লোক পাঠিয়ে সৈন্য সমাবেশ করার আদেশ দিলো। যখন সৈন্যরা সমবেত হলো তখন সে বললো, বনী ইসরাঈলদের ক্ষুদ্র দল, সংখ্যার দিক থেকেও ক্ষুদ্র এবং আসবাবপত্রের দিক থেকেও, আর আমাদের দল বিরাট, সংঘবদ্ধ, সুশৃংখল, অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত।

فَاَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِى الْمَدَآئِنِ حٰشِرِيْنَ ○ اِنَّ هٰٓؤُلَآءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيْلُوْنَ

"ফলে আমি তাদেরকে বাগান এবং ঝর্ণা থেকে বহিস্কার করলাম এবং তাদের অর্থ-ভান্ডার ও উত্তম সুরম্য প্রাসাদগুলো থেকেও"।

অর্থাৎ যখন ফেরাউন ও তার দলবল হযরত মূসা (আঃ) ও তার দল বনী ইসরাঈলের পেছনে ধাওয়া করতে বের হলো তখন তাদের নিজেদের সুরম্য ইমারত সমূহ এবং তাদের

যাবতীয় সুখ-সামগ্রী ফেলে চলে আসলো। আর কখনও জীবনে তারা সেখানে ফিরে যেতে পারেনি, তারা সেখান থেকে চিরতরে বের হয়েছিলো আর তাদের এই বহিষ্কারাদেশ আল্লাহ পাকই দিয়েছিলেন। কেননা তারা ছিল জালেম, তারা ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী, তারা স্বয়ং স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয়েছে এবং তাঁর প্রেরিত রসূল হযরত মূসা (আঃ)-এর রেসালতে অবিশ্বাস করেছে, তাই তারা তাদের কৃতকর্মের শাস্তি ভোগ করেছে।

ফেরাউনের ধ্বংস

كَذٰلِكَ

"ঘটনা এভাবেই ঘটেছিলো"। বস্তুতঃ যে কেউ এ পৃথিবীতে আল্লাহ পাকের নাফরমান হয় সে ব্যক্তি হোক কি জাতি, আল্লাহ পাক তাকে কিছুদিনের জন্যে অবকাশ দিয়ে থাকেন। তার হেদায়েতের জন্যে যথেষ্ট সুযোগ দান করেন। এরপর তার জন্যে শাস্তির সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে অনেক সময় অতিবাহিত হয়। যদি এর মধ্যে হেদায়েত নসীব না হয় তবে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তির আদেশ কার্যকর হয়। আর তাই হয়েছে জালেম ফেরাউনের ব্যাপারে।

কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক এ সম্পর্কে একটি নীতিমালা ঘোষণা করেছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاِذَآ اَرَدْنَآ اَنْ نُّهْلِكَ قَرْيَةً اَمَرْنَا مُتْرَفِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنٰهَا تَدْمِيْرًا (সূরা বনী ইসরাঈল)

"আমি যখন কোন জনপদকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিদেরকে সৎ কাজের আদেশ করি, কিন্তু তারা সেখানে অসৎ কাজ করে তখন তাদের শাস্তি ন্যায় সঙ্গত হয়ে যায়। এরপর আমি তাদেরকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করি"।

ফেরাউন শুধু যে বনী ইসরাঈল জাতির প্রতি বহুদিন ধরে জুলুম অত্যাচার করেছে তাই নয়; বরং হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি অবজ্ঞা করেছে এবং তাঁর মোকাবেলা করে ব্যর্থ হয়েছে, তার মনোনীত যাদুকররা ঈমান এনেছে কিন্তু তবুও সে ঈমান আনেনি, সৎ পথ অবলম্বন করেনি। এমনকি যখন হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর জাতি বনী ইসরাঈল তার জুলুম থেকে আত্মরক্ষার্থে রাতের অন্ধকারে মিশর ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সে তাদের পিছু ধাওয়া করেছে। তাই লোহিত সাগরেই হয়েছে তার এবং তার দলবলের সলিল সমাধি। আল্লাহ পাক তার সমস্ত ধন-সম্পদের অধিকারী করেছেন বনী ইসরাঈল জাতিকে। তাই পরবর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

وَاَوْرَثْنٰهَا بَنِيْٓ اِسْرَآءِيْلَ

"এবং আমি বনী ইসরাঈলকে করেছিলাম সবকিছুর অধিকারী"।

বনী ইসরাঈলকে ফেরাউনের সমস্ত ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছি। কেননা, আল্লাহ পাক ফেরাউনকে যখন লোহিত সাগরে ডুবিয়ে ধ্বংস করলেন তখন তাদের যাবতীয় ধন-সম্পদ, বাড়ী-ঘর সব কিছুর অধিকারী হয় বনী ইসরাঈল।[১]

এমনিভাবে আল্লাহ পাক পৃথিবীতে জালেমদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকেন।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেনঃ ঐতিহাসিকদের মতে বনী ইসরাঈলরা তখন মিশর প্রত্যাবর্তন করেনি, বরং সীনা মরুভূমিতে প্রবেশ করে, সেখানেই তাদের প্রতি "মান্না সালওয়া" নাযিল হয়, হযরত মূসা (আঃ)-কে তৌরাতও সেখানেই প্রদান করা হয়। আর হযরত ইউশা এবনে নূন (আঃ)-কে ঐ একই স্থানেই নবুওয়্যত দান করা হয়। চল্লিশ বছর যাবত বনী ইসরাঈল জাতি এই ময়দানে তীহে দিশেহারা অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে থাকে। কেননা, তারা আল্লাহ পাকের আদেশ অমান্য করেছিল। জেহাদে যেতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল। সুদীর্ঘ চল্লিশ বছর পর যখন তাদের তওবা কবুল হল তখন তাদেরকে সেখান থেকে বের হওয়ার অনুমতি দেয়া হল। তখন তারা প্যালেষ্টাইন ও সিরিয়াতে প্রবেশ করে। হয়তো সিরিয়াতে ক্ষমতা বিস্তার করার পর তারা পুনরায় মিশরে গমন করে।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, যখন মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ পাকের আদেশ হল যে রাতারাতি বনী ইসরাঈলকে নিয়ে বেরিয়ে যাও। তখন বনী ইসরাঈলীরা কিবতীদের থেকে অনেক স্বর্ণালংকার ঋণ হিসাবে চেয়ে নেয়। এরপর যখন চাঁদ ওঠে, তখন তারা বের হয়ে পড়লো। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, সে রাতে চন্দ্র গ্রহণ ছিল। হযরত মূসা (আঃ) পথিমধ্যে লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবর কোথায়? তখন একজন বৃদ্ধা তাঁকে কবরের সন্ধান দিল। তিনি হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর তাবুত সঙ্গে নিয়ে নিলেন। হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর অসিয়ত ছিল বনী ইসরাইল যখন মিশর থেকে যাবে তখন যেন তাঁর তাবুত সঙ্গে নিয়ে যায়।

এবনে আবি হাতেমে একখানি হাদীস সংকলিত হয়েছে, হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম একজন গ্রাম্য ব্যক্তির মেহমান হয়েছিলেন। সে তাঁর আপ্যায়নে সর্বাত্মক চেষ্টা করলো। তিনি তাকে বললেন, কখনও মদীনা শরীফে আমার সঙ্গে মোলাকাত করবে। কিছুদিন পর সেই ব্যক্তি মদীনায় হাযির হল।

হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার কোন কিছুর প্রয়োজন আছে? সে বললো, জ্বী, হ্যাঁ, একটি উষ্ট্রি দান করুন, তার আসবাবপত্রসহ, আর এমন একটি বকরী দান করুন, যে দুধ দেয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, আক্ষেপ তোমার জন্যে, তুমি বনী ইসরাঈলের বৃদ্ধার ন্যায় কিছু চাওনি যেমন সে চেয়েছিলো। সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, সে ঘটনা কি? তখন তিনি এরশাদ করলেন, যখন হযরত কলীমূল্লাহ (আঃ) বনী ইসরাঈলকে নিয়ে রওনা হলেন তখন তিনি পথ হারিয়ে ফেললেন। অনেক চেষ্টা করেও সঠিক পথের সন্ধান পেলেন না। তিনি লোকদের একত্রিত করে জিজ্ঞাসা করলেন, এ ব্যাপারটি কি? তখন বনী ইসরাঈলের জ্ঞানী লোকেরা বললেন, হযরত ইউসুফ (আঃ) তাঁর জীবন সায়াহ্নে আমাদের থেকে এই অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, তোমরা যখন মিশর থেকে চলে যাও তখন আমার তাবুত অবশ্যই নিয়ে যাবে। হযরত মূসা (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবরটা কোথায় আমাকে কে বলবে? সকলে বললো, আমরা জানিনা

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫২৩

তবে একজন বৃদ্ধা আছেন, তিনি জানেন। তখন বৃদ্ধাকে বলা হলো, আমাকে ইউসুফ (আঃ)-এর কবর দেখাও, বৃদ্ধা বললেন, অবশ্যই দেখাবো। তবে তার পূর্বে আমার দাবী আদায় করে নেই। হযরত মূসা (আঃ) বললেন, তোমার দাবী কি? সে বললো, জান্নাতে আপনার সঙ্গী হতে চাই। হযরত মূসা (আঃ) এই দাবীকে অত্যন্ত বড় মনে করলেন। তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ওহী আসলো যে, তার এ দাবী মেনে লও। এরপর সেই বৃদ্ধা হযরত মূসা (আঃ)-কে হযরত ইউসুফ (আঃ)-এর কবরস্থানটি দেখিয়ে দিলো এবং তিনি তাবুত সঙ্গে নিয়ে নিলেন।[১]

فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ

"এরপর সূর্যোদয়ের সময় তারা তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে"।

এ আয়াত থেকে পুনরায় ঘটনার বিবরণ রয়েছে। অর্থাৎ ফেরাউন চারদিক থেকে সৈন্য সমাবেশ করে এবং পূর্ণ প্রস্তুতি গ্রহণ করে ভোরের দিকে মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের পিছু ধাওয়া করে।

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ

অবশেষে যখন উভয় পক্ষ সামনাসামনি হলো তখন মূসার সাথীরা বললো, আমরা ধরা পড়ে গেলাম, নিঃসন্দেহে তারা আমাদের নিকট পৌঁছে যাবে এবং আমাদেরকে পাকড়াও করে ফেলবে। আর তাদের মোকাবেলা করার শক্তিও আমাদের নেই।

قَالَ كَلَّا ۖ إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ

মুসা বললেন, কখনও নয়, আমার প্রতিপালক যে আমার সঙ্গেই রয়েছেন, নিশ্চয় তিনি আমাকে পথ দেখাবেন। যেহেতু পেছনে ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী ধাওয়া করছিল, আর সম্মুখে ছিল লোহিত সাগর, তাই মূসা (আঃ)-এর লোকেরা অস্থির ও ব্যাকুল হয়ে পড়লো। আর এ অস্থিরতা ছিল নিতান্ত স্বাভাবিক।

কিন্তু হযরত মূসা (আঃ) তখন তাঁর সাথী বনী ইসরাঈলকে অভয় দান করলেন যে, কখনও তোমরা ধরা পড়বে না। কেননা, আল্লাহ পাক আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, আমরা তাঁরই মদদপুষ্ট। আর যাকে আল্লাহ পাক সাহায্য করেন তার কোন ভয় থাকেনা।

فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ ۖ فَانفَلَقَ

"তখন আমি মূসাকে বলি তোমার লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত কর, ফলে সমুদ্র বিদীর্ণ হয়ে পড়ে এবং তার প্রতিটি খন্ড বিরাট পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায়"।

হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ পাকের আদেশ মোতাবেক তাঁর লাঠি দ্বারা সমুদ্রে আঘাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র বিদীর্ণ হল। তাতে বারটি পথ তৈরি হল। পানি জমাট হয়ে পাহাড়ের ন্যায় হয়ে গেল। বনী ইসরাঈলের বারটি গোত্রের জন্য বারটি রাস্তা হল, যা আল্লাহর হুকুমে সম্পূর্ণ শুষ্ক ছিল। এমনকি তাতে কাদামাটিও ছিলনা। এভাবে বনী ইসরাঈল নিশ্চিন্ত

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৩২

মনে সমুদ্র পার হয়ে গেল। আল্লাহ পাক মূসা (আঃ)-কে হুকুম দিলেন, সমুদ্রের অভ্যন্তরীণ রাস্তাগুলোকে শুষ্ক অবস্থায় ছেড়ে যাও। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا ۖ إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُّغْرَقُونَ

মূলতঃ স্থল ও সামুদ্রিক পথ আল্লাহ পাকের অসীম কুদরতের সম্মুখে সবই সমান। তাই সমুদ্রের অভ্যন্তরে পথ রচনা করা আল্লাহ পাকের পক্ষে আদৌ কঠিন নয়। হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠি ছিল তাঁর মোজেযা, লাঠির আঘাত সমুদ্র বক্ষকে চিরে ফেলে।

فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ

"আর সমুদ্রের পানি পর্বত সদৃশ দু'পাশে দণ্ডায়মান হয়ে যায়"।

وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ

"এবং আমি সেখানেই অন্যদেরকে নিয়ে আসি"।

অর্থাৎ ফেরাউন ও তার দলবলকে আল্লাহ পাক সেখানে পৌঁছে দেন। সমুদ্র বক্ষে রচিত পথ দেখে তারা তাতে প্রবেশ করে। আল্লাহ পাকের হুকুমে দু'দিক থেকে পানি এসে তাদেরকে নিমজ্জিত করে। হযরত মূসা (আঃ) ও বনী ইসরাঈলকে আল্লাহ পাক এভাবে রক্ষা করেন।

وَأَنجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ أَجْمَعِينَ ﴿٦٥﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الْآخَرِينَ ﴿٦٦﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿٦٧﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿٦٨﴾ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ ﴿٦٩﴾ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ
وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿٧٠﴾ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ ﴿٧١﴾
قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ﴿٧٢﴾ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ ﴿٧٣﴾
قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٧٤﴾

তরজমা

(৬৫) এবং আমি মূসা এবং তার সকল সঙ্গীকে রক্ষা করলাম।

(৬৬) এবং অন্যান্য সকলকে আমি নিমজ্জিত করি।

(৬৭) নিশ্চয় এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অনেকেই বিশ্বাসী ছিলনা।

(৬৮) আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালকই সর্বশক্তিমান এবং করুণাময়ও।

(৬৯) আর তাদের নিকট ইব্রাহীমের ঘটনা বর্ণনা করুন।

(৭) যখন তিনি তার পিতা এবং জাতিকে বলেছিলেন তোমরা কার পূজা করছো?

(৭১) তারা বলে আমরা মূর্তিপূজা করি এবং সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি।

(৭২) ইব্রাহীম বলেন, তোমরা যখন তাদেরকে ডাক, তখন তারা কি তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে?

(৭৩) তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে অথবা কোন ক্ষতি করতে পারে?

(৭৪) তারা বলে না, তবে আমাদের পিতা, পিতামহদেরকে এ কাজ করতে দেখেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলকে যখন আল্লাহ পাক লোহিত সাগর পার হয়ে আত্মরক্ষার তৌফিক দিয়েছেন তখন ফেরাউন তার দলবল নিয়ে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হয়। তারা দেখলো সমুদ্রবক্ষ চিরে পথ হয়ে আছে। তখন ঐ পথে ফেরাউন ও তার দলবল সমুদ্র পাড়ি দিলো এবং আল্লাহ পাকের আদেশ ক্রমে হঠাৎ করে দু'দিকের পানি এসে তাদেরকে নিমজ্জিত করে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দেয়। এভাবেই সত্যের বিজয় আর বাতিলের বাতুলতা প্রমাণিত হলো, সত্য পরায়ণ ঈমানদারদের বিজয় হলো এবং সত্যদ্রোহী কাফের বেঈমানদের ভয়াবহ পরিণতি সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হলো।

বস্তুতঃ মানুষ যতো শক্তিশালীই হোক না কেন, যতো সমর শক্তির অধিকারীই হোক না কেন, যতো জনবলের সমর্থনই থাকুক না কেন আল্লাহ পাকের বিদ্রোহী হলে তার আর নিস্তার নেই। ফেরাউনের ন্যায়ই হবে তাদের শোচণীয় পরিণাম-এ ঘটনা দ্বারা এ সত্যই সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে। অতএব, ফেরাউনের ধ্বংস থেকে বিশ্ববাসীর শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً

(নিশ্চয় এতে রয়েছে বিশেষ নিদর্শন) অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদের সংরক্ষণে এবং ফেরাউন ও তার দলবলের ধ্বংস করণে সুস্পষ্ট নির্দশন রয়েছে হযরত মূসা (আঃ)-এর সত্যতার এবং ফেরাউনের পথভ্রষ্টতার।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ

"আর তাদের অধিকাংশ লোক মোমেন ছিলনা"।

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউনের সাথীদের মধ্যে তার স্ত্রী আছিয়া মোমেন ছিলেন। এছাড়া হিযকীল (যিনি তাঁর ঈমানকে গোপন রেখেছিলেন), তাঁর স্ত্রী এবং মরয়াম বিনতে নামুসিয়া, তিনি সেই মহিলা যিনি ইউসুফ (আঃ)-এর কবরের ঠিকানা বলেছিলেন।[১]

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সর্তকবাণী

এ ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে মক্কার কাফেরদেরকে সতর্ক করা হয়েছে যে, যদি তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করতে থাকে, তাদেরও এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হবে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫২৪

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয় (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক দুশমনদের শাস্তি বিধানে অত্যন্ত পরাক্রমশালী এবং তাঁর তাবেদার বন্দাদের জন্যে তিনি অতীব দয়াবান।

ফেরাউন যে বিষয়ে গৌরব করতো

বর্ণিত আছে যে, ফেরাউন নীল দরিয়া এবং মিশরের অন্যান্য সমুদ্রগুলোর ওপর গৌরব করতো। সে বলতো,

أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهٰذِهِ الْأَنْهٰرُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي

মিশরের রাজত্ব কি আমার নয়? আর এই নহরগুলো আমাদের দেশের তলদেশ থেকে প্রবাহিত হচ্ছে। অবশেষে আল্লাহ পাক ঐ সমুদ্রের মধ্যেই অহংকারী রাজা ফেরাউন এবং তার দলবলকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন, যা নিয়ে সে গৌরব করতো। হযরত মূসা (আঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতা প্রমাণিত হলো এবং ঈমানদারদের সাহায্য এবং হেফাযত করা হলো, আর অহংকারী দূরাত্মা কাফেরদেরকে ধ্বংস করা হলো।[১]

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ

"আর (হে রসূল!) তাদেরকে ইব্রাহীমের কথা শুনিয়ে দিন"।

পূর্ববর্তী আয়াতের সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে তাঁর রেসালতের দায়িত্ব পালনে কি কি বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছে তার কিছুটা উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পিতার পথভ্রষ্টতার কারণে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত ও মর্মাহত ছিলেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর সম্প্রদায় বাবেল এলাকায় বাস করতো। তারা নক্ষত্র পূজারী ছিল এবং কিছু লোক মূর্তি পূজাও করতো। তাদের বিশ্বাস ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন পরিবর্তনে নক্ষত্রপুঞ্জের প্রভাব রয়েছে। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অকাট্য যুক্তি এবং বলিষ্ঠ দলিল-প্রমাণ দিয়ে তাঁর সম্প্রদায়কে সত্য উপলব্ধি করার আহ্বান জানিয়েছেন এবং আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপনের উপদেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرٰهِيمَ

হে নবী! আপনি মক্কাবাসীর নিকট ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করুন। মক্কাবাসী নিজেদেরকে ইব্রাহীম (আঃ)-এর বংশধর হওয়ার ব্যাপারে গৌরব বোধ করে। অতএব, তাদের কর্তব্য হল, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন তৌহিদে বিশ্বাসী। তিনি এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই জীবনের যাবতীয় কাজ করতেন এবং তিনি সর্বাবস্থায় আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখতেন। শেরক ও পৌত্তলিকতার

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২২৪

অন্ধকারকে দূরীভূত করতেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই ঘটনা হয়তো মক্কার কাফেরদের অন্তরের রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করার জন্যে যথেষ্ট হবে।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সর্বপ্রথম শেরকের বাতুলতা ঘোষণা করেছেন এবং মূর্তিগুলো যে নিতান্ত অসহায় একথাও বলেছেন। এরপর বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন। মানুষকে সৃষ্টি করা, তাকে হেদায়েত দেয়া, রিয্ক পৌঁছানো বা জীবিত রাখা সবই আল্লাহ্ পাকের কর্তৃত্বাধীন। অতএব, মানুষের এবাদতের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ্ পাকই, আর কিছু নয়।

তাই তিনি তাঁর পিতা এবং সম্প্রদায়কে সম্বোধন করে বললেনঃ

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ

"যখন তিনি তার পিতা এবং জাতিকে বলেছিলেন, তোমরা কার পূজা করছো"?

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের নিকট এ সম্পর্কে জানার জন্যে প্রশ্ন করেননি; কেননা তিনি জানতেন যে তারা মূর্তিপূজা করে। তিনি প্রশ্ন করেছেন, তাদেরকে একথা জানাবার জন্যে যে তোমরা যে সব বস্তুর পূজা কর এবং যে সব বস্তুর সম্মুখে ভক্তি-অনুরক্তি প্রকাশ কর, সেগুলো আদৌ এর যোগ্য নয়। বিশ্বসৃষ্টির মাঝে সর্বোচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সৃষ্টি হলো মানুষ। অতএব, সৃষ্টির সেরা মানুষ কখনো অন্য কোন সৃষ্টির সম্মুখে মাথা নত করতে পারেনা। তাই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) জিজ্ঞাসা করেছেন, তোমরা কিসের পূজা কর?

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ

তারা বলে, আমরা মূর্তি পূজা করি, আর সারাদিন তাদের কাছেই বসে থাকি। আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্ঘ নিবেদন করি তাদেরই সম্মুখে, আর সারাদিন ধরে ভক্তিভরে তাদেরই সম্মুখে আমরা বসে থাকি।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর প্রশ্ন ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, কিন্তু তারা মূর্তিপূজার উপর গর্ব প্রকাশার্থে দীর্ঘ জবাব দিয়েছে।

قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ ○ أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ

ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, তোমরা যে তাদেরকে ডাক, তারা কি তোমাদের ডাক শ্রবণ করতে পারে? তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে? অথবা তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে?

একথা সর্বজন-বিদিত ও স্বীকৃত যে, ঐ মূর্তিরা কারো কোন কথা শ্রবণও করতে পারেনা; কোন কিছু বুঝতেও পারেনা; কারো ভাল-মন্দ কোন কিছুই করতে সক্ষম হয়না এমনকি, যদি তাদের দেহে একটি মশা মাছি বসে তবে তা তাড়াবারও ক্ষমতা তারা রাখেনা, এমন অক্ষম, অসহায় বস্তুকে তোমরা উপাস্য হিসেবে গ্রহণ কর কোন্ যুক্তিতে?

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) هَلْ يَسْمَعُونَ এর অর্থ করেছেন এভাবেঃ তারা কি তোমাদের কথা শ্রবণ করতে পারে? আর أَوْ يَنْفَعُونَكُمْ অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা কর, তবে তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে?

أَوْ يَضُرُّونَ

অর্থাৎ যদি তোমরা তাদের পূজা না কর, তবে কি তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে?

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

তারা বলে না, এসব কারণে আমরা তাদের পূজা করিনা। আমরা এসব যুক্তি তর্কেরও ধার ধারিনা। আমাদের বাপ-দাদা চৌদ্দপুরুষকে এদের পূজা করতে দেখেছি, তাই আমরাও এদের পূজা করি।[১]

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا
كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٧٥﴾ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ ﴿٧٦﴾ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ
لِّيٓ إِلَّا رَبَّ الْعَٰلَمِينَ ﴿٧٧﴾ الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿٧٨﴾ وَ
الَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿٧٩﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿٨٠﴾
وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿٨١﴾ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي
خَطِيٓـَٔتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿٨٢﴾ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّٰلِحِينَ ﴿٨٣﴾
وَاجْعَل لِّي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ﴿٨٤﴾ وَاجْعَلْنِي مِن
وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ ﴿٨٥﴾ وَاغْفِرْ لِأَبِيٓ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّآلِّينَ ﴿٨٦﴾
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ﴿٨٧﴾ يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ ﴿٨٨﴾ إِلَّا
مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴿٨٩﴾ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴿٩٠﴾

তরজমা

(৭৫) ইব্রাহীম বলেন, তোমরা কি ভেবে দেখেছ যে তোমরা যাদের পূজা করছো-

(৭৬) তোমরা এবং তোমাদের পূর্ববর্তী পিতৃ-পুরুষরা।

(৭৭) নিশ্চয় তারা সকলে আমার দুশমন, শুধুমাত্র সেই বিশ্ব প্রতিপালকই আমার রব-

(৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান।

(৭৯) তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়।

(৮০) আর আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন।

[১]। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন নূরুল কোরআন খন্ড-৭, পৃষ্ঠা-২৩০-৪৪

(৮১) এবং যিনি আমাকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন এবং পুনর্জীবিত করবেন।

(৮২) যাঁর সম্পর্কে আমি আশা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন।

(৮৩) হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আদশে দিন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন।

(৮৪) আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার কথাকে সত্য করে রাখুন।

(৮৫) এবং আমাকে নেয়ামতের বাগানের তথা জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন।

(৮৬) এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্ট।

(৮৭) যেদিন সকলে উত্থিত হবে সেদিন আমাকে লজ্জিত করবেন না।

(৮৮) যেদিন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা।

(৮৯) সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে।

(৯০) এবং পরহেযগারদের জন্যে বেহেশতকে নিকটে উপস্থাপন করা হবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতিকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তোমরা যে মূর্তি পূজা কর তারা কি তোমাদের কোন উপকার করতে পারে? আর যদি তোমরা তাদের পূজা না কর তবে কি তারা তোমাদের কোন ক্ষতি করতে পারে? তারা বলেছে, উপকার পাওয়ার জন্যে বা ক্ষতি থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আমরা মূর্তি পূজা করিনা। যেহেতু আমাদের পূর্ব পুরুষরা এ কাজ করতেন, তাই আমরাও তা করি। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে প্রশ্ন করেছেন তারই বিবরণ রয়েছে আলোচ্য আয়াত সমূহে।

قَالَ أَفَرَءَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) বলেন, তোমরা এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরা যা কিছুর পূজা করে আসছো–

فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّيٓ

"নিশ্চয় তারা সকলেই আমার শত্রু"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাদের উপাস্যদেরকে তাঁর শত্রু বলেছেন। এরা শুধু আমাদের দুশমন নয়, তোমাদেরও শত্রু। শত্রু দ্বারা যে ক্ষতি সাধনের আশঙ্কা থাকে তার চেয়ে অধিকতর ক্ষতি হয় মূর্তি পূজার মাধ্যমে; বরং মূর্তি পূজার পরিণাম সমূলে ধ্বংস হওয়া ছাড়া আর কিছুই নয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর মন্তব্য অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এর একটি অর্থ হতে পারে এই, কেয়ামতের দিন এই বাতিল উপাস্যরাই হবে তোমাদের শত্রু। আজ যাদের প্রতি তোমরা ভক্তি-শ্রদ্ধা পোষণ করছো, কাল কেয়ামতের দিন তারাই হবে তোমাদের শত্রু। তাদের কারণে তোমাদের ধ্বংস হবে অনিবার্য। অথবা এর অর্থ হল, তোমাদের এসব মূর্তিগুলো আমার শত্রু, আমিও তাদের শত্রু। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এই উক্তি তাঁর জাতির প্রতি একটি হুমকি স্বরূপও হতে পারে। তোমাদের উপাস্যদের আমি শেষ করে ছাড়বো। তোমরা তাদের পূজা করতে পার, তাদের সম্মুখে মাথা নত করতে পার, কিন্তু আমি তাতে কোন অবস্থাতেই প্রস্তুত নই।

إِلَّا رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ

আমার প্রভু, আমার বন্ধু একজনই, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক, তিনিই বিশ্ব স্রষ্টা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী লিখেছেন, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতির মধ্যে কিছু লোক আল্লাহ পাকের এবাদতের পাশাপাশি মূর্তিপূজাও করতো। সেজন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কথাটিকে এভাবে বলেছেন যে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক ব্যতীত তোমাদের সকল উপাস্যই আমার শত্রু।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের কিছু বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী বর্ণনা করেছেন। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

الَّذِىْ خَلَقَنِىْ فَهُوَ يَهْدِيْنِ

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণের পথ তিনিই আমাকে প্রদর্শন করেন।

হেদায়েত আল্লাহ পাকের দান

এই পৃথিবীতে মানুষ আগন্তুক, ইতিপূর্বে ছিলনা কিছুদিন পর থাকবেনা। আল্লাহ পাকই মানুষকে জীবন-সংগ্রামের কণ্টকাকীর্ণ ক্ষেত্রে সরল, সঠিক, পূণ্য পন্থা প্রদর্শন করেন, যাতে করে মানুষ যা তার জন্যে উপকারী তা গ্রহণ করে এবং যা অপকারী তা বর্জন করে। মাতৃ-গর্ভ থেকে জান্নাতে পৌছা পর্যন্ত আল্লাহ পাকের হেদায়েতই মানুষকে তার জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে সঠিক পথের সন্ধান দেয়। কোরআনে করীমের সূরা ফাতেহায় এজন্যেই আল্লাহ পাক একখানি দোয়া শিক্ষা দিয়েছেনঃ

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ

হে পরওয়ারদেগার! আমাকে সঠিক পথ দেখাও সে পথ, যে পথে চলেছেন তোমার নেয়ামত লাভে ধন্য লোকেরা। সে পথ নয়, যে পথে চলেছে পথভ্রষ্ট ও কোপগ্রস্ত লোকেরা। আর এ কারণেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারার শুরুতেই ঘোষণা করেছেনঃ

الٓمّٓ ○ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ

"আলীফ, লাম, মীম। এই কিতাব এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই, এই কিতাব পথ প্রদর্শনকারী সে সব লোকদের জন্যে যারা আল্লাহকে ভয় করে"।

সূরা বাকারায় আল্লাহ পাক যেখানে হযরত আদম (আঃ)-এর জান্নাত থেকে জমীনে অবতরণের কথা বলেছেন, সেখানে আল্লাহ পাকের তরফ থেকে যুগে যুগে পথ প্রদর্শনকারী আসবে বলেও ঘোষণা করেছেনঃ

قُلْنَا اهْبِطُوْا مِنْهَا جَمِيْعًا ۚ فَاِمَّا يَاْتِيَنَّكُمْ مِّنِّىْ هُدًى فَمَنْ .....هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

(সূরা বাকারা ৩৮-৩৯)

"আমি বলেছিলাম, তোমরা সকলেই নিচে নেমে যাও। এরপর যদি আমার পক্ষ থেকে তোমাদের নিকট কোন হেদায়েত আসে, তখন যারা সেই হেদায়েত মেনে চলবে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিতও হবেনা। আর যারা অবাধ্য হবে, নাফরমানী করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যাজ্ঞান করবে তারা হবে দোযখবাসী, তারা চিরদিন সেখানে থাকবে"।

وَالَّذِىْ هُوَ يُطْعِمُنِىْ وَيَسْقِيْنِ

"তিনিই আমাকে দান করেন আহার্য ও পানীয়", অর্থাৎ যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনিই আমার লালন-পালন করেন। যিনি আমাকে দান করেছেন আমার অস্তিত্ব, আর এ অস্তিত্ব রক্ষা করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাও তিনিই করেন, আমার জীবনের যত পরিবর্তন সবই তাঁর হাতে।

وَاِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِيْنِ

"আর আমি যখন অসুস্থ হই, তখন তিনিই আমাকে আরোগ্য দান করেন"।

অর্থাৎ আমার আহার্য, পানীয়, আমার রোগ নিরাময়, আমার স্বাস্থ্য-সুখ, এমনকি আমার জীবন ও মরণ এক কথায় সব কিছুই আল্লাহ পাকের হাতে, সবই তাঁর দয়া।

আলোচ্য আয়াতাংশে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) অসুস্থ হওয়ার সম্পর্ককে নিজের সাথে করেছেন, আর আরোগ্য দানের সম্পর্ককে আল্লাহর সাথে করেছেন। অথচ রোগ হওয়া আর রোগ নিরাময় হওয়া, সব ক্ষেত্রেই আল্লাহর ইচ্ছাই কার্যকর। এর কারণ হল, আদবের খাতিরে অসুস্থ হওয়ার সম্পর্ক তিনি নিজের সাথে করেছেন। এতদ্ব্যতীত আরও একটি কারণ রয়েছে, মানুষের যে কোন বিপদ তার কৃতকর্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই হয়। এজন্যে রোগের বিপদও তারই কোন ভুল-ভ্রান্তি অথবা গাফলতের কারণে হয়ে থাকে। দ্বিতীয়তঃ হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের নেয়ামতের উল্লেখ করছিলেন, আর অসুস্থ হওয়া নেয়ামত নয়। এজন্যে অসুস্থ হওয়ার সম্পর্ককে নিজের সাথে করেছেন।[১]

وَالَّذِىْ يُمِيْتُنِىْ ثُمَّ يُحْيِيْنِ

"এবং যিনি আমাকে মৃত্যু মুখে পতিত করবেন এবং পুনর্জীবিত করবেন"।

অর্থাৎ যিনি আমাকে এ জীবন দিয়েছেন, তিনিই আমার এ জীবনের অবসান ঘটাবেন মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধানের মাধ্যমে। এরপর তিনি আমাকে পুনর্জীবন দান করবেন। এ জীবন যেমন ক্ষণস্থায়ী এ জীবনের যাবতীয় সম্পদ এবং সামগ্রী যেমন ক্ষণস্থায়ী, এখানকার স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য এমনকি, মৃত্যুর পরের অবস্থাও ক্ষণস্থায়ী। চিরস্থায়ী শুধু পরকালীন জিন্দেগী।

وَالَّذِىْ اَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لِىْ خَطِيْٓئَتِىْ يَوْمَ الدِّيْنِ

"যাঁর সম্পর্কে আমি আশা করি যে, তিনি কেয়ামতের দিন আমার ত্রুটি-বিচ্যুতি ক্ষমা করবেন"।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫২৭

অর্থাৎ তিনি আমার ভুল-ত্রুটির কারণে কেয়ামতের কঠিন দিন আমাকে পাকড়াও করবেন না, আমি তাঁর প্রতি এ আশা পোষণ করি। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) ছিলেন আল্লাহর বন্ধু, নবী ও রসূল। তিনি ছিলেন নিঃস্পাপ। তবুও তিনি বিনয় এবং আদবের খাতিরে এভাবে বলেছেন যে, আশা করি আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করবেন। এতে শিক্ষা রয়েছে উম্মতের জন্যে, যেন প্রত্যেকটি মানুষ নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়। আর একথা নিশ্চিতভাবে প্রত্যেকেরই জানা উচিত, একমাত্র আল্লাহ পাকই ক্ষমা করতে পারেন, আর কেউ নয়। দ্বিতীয়তঃ এতে এ শিক্ষাও রয়েছে যে প্রত্যেকের কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের রহমতের আশা করা, কখনও আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ না হওয়া। কেননা, আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে এরশাদ করেছেন,

انا عند ظن عبدى بى

"আমি আমার বন্দার ধারণা মোতাবেক তার সাথে ব্যবহার করি"।

অর্থাৎ আল্লাহ পাকের সম্পর্কে যে যেমন ধারণা করবে আল্লাহ পাকও তার সাথে তেমনি ব্যবহার করবেন। আর পবিত্র কোরআনেও আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, এ কয়েকটি সংক্ষিপ্ত বাক্যের মাধ্যমে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) আল্লাহ পাকের অনেক নেয়ামতের উল্লেখ করেছেন এবং আল্লাহ পাকের অপার মহিমা ও গুণাবলীর উল্লেখ করেছেন এবং তাঁর সম্প্রদায়কে একথা সুস্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছেন যে, মানব জাতির এবাদতের যোগ্য একমাত্র সেই পবিত্র সত্ত্বা আল্লাহ পাক, যাঁর এসব গুণাবলী এবং বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তোমাদের হাতে বানানো মূর্তিগুলো কোন অবস্থাতেই মানুষের উপাস্য হতে পারেনা। এগুলোকে কেন্দ্র করে মানুষ কখনও কোন কিছু আশা করতে পারেনা। কেননা, এ অসহায় মূর্তিগুলো উপকার করতে পারেনা। এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতি থেকে মুখ ফিরিয়ে মনোনিবেশ করেন এক আল্লাহ পাকের দিকে এবং আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দোয়া করতে থাকেন এভাবে,

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا وَّ اَلْحِقْنِيْ بِالصّٰلِحِيْنَ

"হে আমার প্রতিপালক! আমাকে আদেশ দিন এবং নেককারদের অন্তর্ভুক্ত করুন"।

আলোচ্য আয়াতে "হুকুম" শব্দটির অর্থ হল, বিচার-বুদ্ধি, জ্ঞান-মনীষা, এলম এবং আমলের পরিপূর্ণতা। আর "সালেহীন" শব্দ দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। অতএব, হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করেছেন এভাবে, হে আমার প্রতিপালক! আমাকে দান কর বিচার-বুদ্ধি, এলম এবং আমলের পরিপূর্ণতা এবং মনীষা, আর তোমার প্রিয় পূণ্যাত্মা লোকদের তথা আম্বিয়ায়ে কেরামের মধ্যে আমাকে অন্তর্ভুক্ত কর।

যেহেতু কোন মানুষের পক্ষেই আল্লাহ পাকের বন্দেগীর হক্ব আদায় করা সম্ভব নয়, তাই আম্বিয়ায়ে কেরাম সারা জীবন সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের বন্দেগীতে মশগুল থাকা সত্বেও সর্বদা ভীত-সন্ত্রস্ত থাকতেন। আর এজন্যেই হযরত ইব্রাহীম (আঃ) এভাবে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছেন এবং দোয়া করেছেন।

ইমাম আবু হানিফা (রঃ) যিনি চল্লিশ বছর যাবত এশার নামাযের অজু দ্বারা ফজরের নামায আদায় করেছেন, যিনি ৭০ বছরের জীবনে ৫৫ বার হজ্জ করেছেন তিনি বলেছেন, আমরা একথা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ্ পাকের এবাদতের যে হক্ব রয়েছে তা কোন বন্দার দ্বারা আদায় করা সম্ভব নয়।

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের "হুকুম" শব্দটির অর্থ হল, এলম, হেকমত এবং নবুওয়্যত ও এলম, আমলের পরিপূর্ণতা। আলোচ্য আয়াতে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যে দু'টি দোয়া করেছেন, আল্লাহ্ পাক তা কবুল করেছেন। আল্লাহ্ পাক তাঁকে এলম, হেকমত, রেসালত-সবই দান করেছেন।

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْاٰخِرِيْنَ

"আর পরবর্তীদের মধ্যে আমার কথাকে সত্য করে রাখুন"।

অর্থাৎ পরবর্তীতে পৃথিবীতে যে সব মানুষের পদচারণা হবে, তারা যেন আমার অনুসরণ করে। আল্লাহ্ পাক এ দোয়াও কবুল করেছেন।

এ কারণেই উম্মতে মোহাম্মদীয়ার উপর হুকুম হয়েছে, আত্তাহিয়্যাতে যখন দরূদ শরীফ পাঠ করা হয়, তখন যেন

كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم

পাঠ করা হয়। শুধু তাই নয়; সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এরই বংশধর। আর কেয়ামত পর্যন্ত এ উম্মতের মাধ্যমে ইব্রাহীম (আঃ)-এর সুনাম-সুখ্যাতি অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা করেছেন আল্লাহ্ পাক। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) সম্পর্কে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا دعاء ابينا ابراهيم عليه السلام

অর্থাৎ আমি ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়ারই জীবন্ত প্রতীক। এসব কিছুই হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দোয়া কবুল হওয়ার প্রমাণ যা আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

وَاجْعَلْنِيْ مِنْ وَّرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيْمِ

"এবং আমাকে নেয়ামতের বাগানের তথা জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন"।

অর্থাৎ জান্নাতের নেয়ামত আমাকে দান করুন, যেভাবে ওয়ারিশ সূত্রে মানুষ পৈত্রিক সম্পত্তি লাভ করে, ঠিক তেমনি আমাকে জান্নাতের উত্তরাধিকারী করুন।

এরপর হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার মাগফেরাতের জন্যে দোয়া করেছেন।

وَاغْفِرْ لِاَبِيْٓ اِنَّهٗ كَانَ مِنَ الضَّآلِّيْنَ

"এবং আমার পিতাকে ক্ষমা করুন, নিঃসন্দেহে তিনি পথভ্রষ্ট"।

হযরত ইব্রাহীম (আঃ) যখন তাঁর পিতাকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন, তখন তাঁর পিতা শুধু যে সে আহ্বানে সাড়া দেয়নি তা নয়; বরং তাঁর শাস্তি

বিধানের হুমকি দেয়, এজন্যে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) হিজরত করেন এবং পিতাকে ছেড়ে চলে যান, তাই পিতার জন্যে তিনি দোয়া করছেনঃ হে আল্লাহ! তাঁকে হেদায়েত কর, তাঁকে ঈমান নসীব কর, যাতে করে তিনি তোমার মাগফেরাত লাভের যোগ্য হতে পারেন। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর আশা ছিল হয়তো তাঁর পিতা আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের তৌফিক পাবেন, এজন্যে তিনি এ দোয়া করেছিলেন। কিন্তু যখন তিনি এ সত্য সম্পর্কে অবগত হন যে, তাঁর পিতা আল্লাহ পাকের দুশমন এবং সে কখনও ঈমান আনবেনা তখন তিনি তাঁর পিতার ব্যাপারে নিজেকে সম্পূর্ণ দূরত্বে রাখেন এবং তার ব্যাপারে আর কখনও আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করেননি। এজন্যে সূরা তওবায় এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرٰهِيْمَ لِاَبِيْهِ اِلَّا عَنْ مَّوْعِدَةٍ

আর ইব্রাহীমের তার পিতার জন্যে যে এস্তেগফার করেছিল তা একটি ওয়াদার কারণে, যা তিনি করেছিলেন, যখন এ সত্য সুস্পষ্টভাবে প্রকাশিত হল যে, সে আল্লাহর দুশমন তখন তিনি তার নিকট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখেন।

অথবা কথাটিকে এভাবেও বলা যেতে পারে হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতার জন্য তখন দোয়া করেছেন, যখন কাফেরদের জন্যে দোয়া করা নিষিদ্ধ ছিলনা।[১]

وَلَا تُخْزِنِيْ يَوْمَ يُبْعَثُوْنَ

"যেদিন সকলে উত্থিত হবে, সেদিন আমাকে লজ্জিত করোনা"।

অর্থাৎ কেয়ামতের দিন তাকে শাস্তি দিয়ে আমাকে সকলের সম্মুখে লজ্জিত করোনা। লক্ষণীয় বিষয় এই, যখন ইব্রাহীম খলিলুল্লাহ (আঃ) কেয়ামতের দিনের অপমানকে ভয় করেছেন, তখন পৃথিবীতে এমন কে আছে যে এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হতে পারে, কেননা সেদিন হবে অত্যন্ত কঠিন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণিত এবং বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত হাদীসের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, আমাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক যে কোন কোন বন্দার সাথে চুপে চুপে কথা বলবেন, যার খবর অন্যদের হবেনা এ সম্পর্কে আপনি কি জানেন? তিনি বলেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমাদের মধ্যে কিছু লোক কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাকের নিকটবর্তী হবে এমনকি, তিনি তার মধ্যে পর্দা ফেলে দেবেন এবং এরশাদ করবেনঃ তুমি কি এমন কাজ করেছিলে? বন্দা আরজ করবে, জ্বী-হ্যাঁ। তখন আল্লাহ পাক এরশাদ করবেনঃ আমি দুনিয়াতে তোমার এ কাজটির উপর পর্দা ফেলে রেখেছিলাম, আর আজ তোমাকে মাফ করলাম। এরপর তার নেক আমলের ফিরিস্তি তার ডান হাতে দিয়ে দেয়া হবে। পক্ষান্তরে কাফের ও মুনাফেকদেরকে সকলের সম্মুখেই ডাকা হবে এবং লা'নত দেয়া হবেঃ

هٰؤُلَآءِ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ ۚ اَلَا لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الظّٰلِمِيْنَ.

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩০
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন, কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৩০

"এরাই সে সব লোক যারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে মিথ্যা রটনা করেছিল, মনে রেখ, আল্লাহ্ পাকের লা'নত জালেমদের উপর"।

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ ○ اِلَّا مَنْ اَتَى اللّٰهَ بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ

(সেদিন ধন-সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা, সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে ব্যক্তি যে বিশুদ্ধ অন্তর নিয়ে আল্লাহর নিকট হাযির হবে) অর্থাৎ শেরক থেকে সন্দেহ থেকে যার অন্তর পবিত্র সেই নাজাত পাবে।

আল্লামা বগভী (রহঃ) লিখেছেন, এটিই হলো অধিকাংশ তফসীরকারদের ব্যাখ্যা।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) বলেছেন, 'সলিম' শব্দটির অর্থ হলো মোমেনের অন্তর সুস্থ থাকে। আর কাফের এবং মুনাফিকের অন্তর থাকে অসুস্থ।

আবু ওসমান নিশাপুরী (রহঃ) বলেছেন, 'সলিম' অর্থ হলো নিরাপদ অর্থাৎ মোমেনদের অন্তর সকল প্রকার বেদআত থেকে নিরাপদ থাকে।

আয়াতের মর্মকথা

তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো কেয়ামতের কঠিন দিনে কারো ধন-সম্পদ অথবা সন্তান-সন্ততি কোন উপকারে আসবেনা, তবে শুধু মোমেনের উপকারে আসবে।

পক্ষান্তরে, কাফেররা তাদের আত্মীয়-স্বজনের জন্যে যত অর্থ-সম্পদই ব্যয় করুক এবং যত এতিম-মিসকীন, অনাথ-বিপদগ্রস্ত মানুষকে সাহায্য করুক না কেন, তার জন্যে উপকারী হবে না। কাফেরের জন্যে কেউ ক্ষমাপ্রার্থীও হবেনা।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কেয়ামতের দিন ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর পিতা আজরকে দুর্গত অবস্থায় দেখবেন এবং বলবেন যে, আমি কি আপনাকে বলিনি যে আমার কথার বিরুদ্ধে চলবেন না। তাঁর পিতা বলবে, আজ আমি তোমার অবাধ্য হবোনা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) দোয়া করবেন এবং আরয করবেন, হে আমার পরওয়ারদেগার! তুমি ওয়াদা করেছিলে কেয়ামতের দিন তুমি আমাকে অপমানিত করবেনা। আমার পিতার অপমানের চেয়ে আমার আর বড় অপমান কি হবে? আল্লাহ পাক এরশাদ করবেন : আমি কাফেরদের জন্যে জান্নাত হারাম করে দিয়েছি। তখন আল্লাহ পাক হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-কে বলবেন, হে ইব্রাহীম! তোমার পায়ের দিকে দৃষ্টিপাত করো তখন তিনি দেখবেন বড় বড় চুল বিশিষ্ট বিচ্ছুর ন্যায় প্রাণী যা ময়লার মধ্যে পড়ে আছে, সেখান থেকে তাকে তুলে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, যে মোমেন আল্লাহর রাহে ধন-সম্পদ ব্যয় করবে, কেয়ামতের দিন তার দ্বারা সেই উপকৃত হবে। এভাবে যদি সন্তান-সন্ততি নেককার হয়, আর তারা যদি পিতা-মাতার জন্যে ক্ষমাপ্রার্থী হয় তবে তাদের দ্বারাও পিতা-মাতা উপকৃত হবে।[১]

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩১

(আর বেহেশতকে পরহেযগার লোকদের নিকট উপস্থাপন করা হবে) অর্থাৎ যারা দুনিয়াতে আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন করবে, আল্লাহ পাকের বিধান মেনে চলবে, তারা কেয়ামতের দিন বেহেশতকে তাদের কাছে দেখতে পাবে। ফলে তাদের হৃদয়-মন অতি আনন্দে উদ্বেলিত হবে। পক্ষান্তরে দোযখীরা দোযখে প্রবেশের পূর্বেই দোযখের ভয়াবহ দৃশ্য দেখতে পাবে।

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ ﴿٩١﴾ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ﴿٩٢﴾
مِنْ دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمْ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ﴿٩٣﴾ فَكُبْكِبُوا فِيهَا
هُمْ وَالْغَاوُونَ ﴿٩٤﴾ وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ﴿٩٥﴾ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ ﴿٩٦﴾ تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ﴿٩٧﴾ إِذْ نُسَوِّيكُمْ بِرَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٩٨﴾ وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ﴿٩٩﴾ فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ ﴿١٠٠﴾
وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ ﴿١٠١﴾ فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٢﴾
إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٠٤﴾

তরজমা

(৯১) এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে উন্মুক্ত করা হবে দোযখ।

(৯২) আর তাদেরকে বলা হবে, "তারা কোথায় যাদের তোমরা পূজা করতে"?

(৯৩) আল্লাহ পাকের পরিবর্তে? তারা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারে? অথবা তারা কি নিজেদের কোন সাহায্য করতে পারে? অথবা তারা কি নিজেদেরকে রক্ষা করতে সক্ষম?

(৯৪) এরপর তাদেরকে এবং সকল পথভ্রষ্ট লোকদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে উপুড় করে।

(৯৫) আর ইবলিস বাহিনীর সকলকেও।

(৯৬) তারা সেখানে একে অন্যের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়ে বলবে,

(৯৭) আল্লাহর শপথ! আমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতেই ছিলাম।

(৯৮) আমরা যখন তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমকক্ষ গণ্য করতাম।

(৯৯) এ পাপীষ্ঠরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল।

(১০০) পরিণামে আমাদের পক্ষে কোন সুপারিশকারী নেই।

(১০১) এবং কোন সহৃদয় বন্ধু আমাদের নেই।

(১০২) যদি আমরা আর একবার (দুনিয়াতে) ফিরে যেতে পারতাম তবে আমরা ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(১০৩) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, কিন্তু তাদের অনেকেই মোমেন নয়।

(১০৪) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত প্রতাপশালী, পরম দয়ালু।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে যে, মোত্তাকীদের জন্যে বেহেশতকে তাদের নিকট উপস্থাপন করা হবে যাতে করে তারা আনন্দিত হয়। জান্নাতে তাদের জন্যে যে অনন্ত অসীম নেয়ামত রয়েছে, তা দেখা মাত্র জান্নাতবাসীদের আনন্দ-উল্লাসের সীমা থাকবেন না।

আর আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের ভয়াবহ পরিণতির কথা ঘোষণা করে এরশাদ হয়েছেঃ

وَبُرِّزَتِ الْجَحِيْمُ لِلْغٰوِيْنَ

"এবং পথভ্রষ্টদের জন্যে উন্মুক্ত করা হবে দোযখ"।

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, দোযখীদের ভয়-ভীতি, হতাশা এবং দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করার নিমিত্তেই তাদেরকে দোযখ দেখানো হবে।[১]

যেমন কোরআনে করীমের অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

فَلَمَّا رَاَوْهُ زُلْفَةً سِيْٓئَتْ وُجُوْهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا

"কাফেররা যখন দোযখকে দেখতে পাবে তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যাবে"।

মূলতঃ দোযখ হলো যাবতীয় কষ্ট, অপমান এবং সকল বিপদের মূল কেন্দ্র। যখন তারা চরম শাস্তির কেন্দ্র দোযখ দেখতে পাবে, তখন তাদের চেহারা মলিন হয়ে যাবে। কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, দোযখের কঠোর এবং বিকট শব্দ শ্রবণ মাত্র দোযখীরা থর থর করে কাঁপতে থাকবে, তাদের অন্তর বিদীর্ণ হবার উপক্রম হবে।

هَلْ يَنْصُرُوْنَكُمْ اَوْ يَنْتَصِرُوْنَ

দোযখীদেরকে ধমক দিয়ে বলা হবে, তোমরা যাদের পূজা করতে, যাদের প্রতি তোমাদের অন্তরের ভক্তি শ্রদ্ধার অর্য নিবেদন করতে, আজ তারা কোথায়? তোমাদের সেই বাতিল উপাস্যরা কোথায়, তারা কি তোমাদের সাহায্য করতে আসবে না?

فَكُبْكِبُوْا فِيْهَا هُمْ وَالْغَاوٗنَ

"এরপর তাদেরকে এবং সকল পথভ্রষ্ট লোকদেরকে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে উপুড় করে"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) فكبكبوا শব্দটির অর্থ করেছেন, তাদেরকে দোযখে একত্রিত করা হবে।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৫২

মুজাহেদ (রঃ) এ শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, তাদেরকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটির অর্থ হলো নিক্ষেপ করা হবে।

আর জুযাজ (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো দোযখে তাদেরকে একের উপর অন্যকে নিক্ষেপ করা হবে।

কুতায়বী (রঃ) বলেছেন, তাদেরকে মাথা নীচু করে নিক্ষেপ করা হবে।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, কাফেরদেরকে এভাবে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে যে, তারা নিক্ষিপ্ত হবার পর ধীরে ধীরে নীচের দিকে যেতে থাকবে। এমনকি, দোযখের তলদেশে পৌঁছে যাবে আর পাপীষ্ঠ কাফেরদের সঙ্গে সঙ্গে তাদের বানানো উপাস্যদেরকেও দোযখে নিক্ষেপ করা হবে।[১]

وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ

"এবং ইবলিস শয়তান আর তার সাঙ্গ-পাঙ্গদেরকে উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে"।

অর্থাৎ জ্বীন বা মানুষ যারাই দুনিয়ার জীবনে ইবলিসের অনুসারী হবে তাদের সকলকেই সেদিন উপুড় করে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। কাফেরদের পূজনীয় মূর্তি এবং ইবলিস শয়তান বা তার সাঙ্গ-পাঙ্গ যারা মানুষকে পথভ্রষ্ট করে, তাদের কেউ সেদিন তাদের অনুসারীদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারবেনা। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, جنود ابليس দ্বারা ইবলিসের বংশধরদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তবে অধিকাংশ তফসীরকার বলেছেন যে, এর দ্বারা ইবলিসের অনুসারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সেদিন পাপীষ্ঠরা একথা স্বীকার করবে যে, দুনিয়ার জীবনে শয়তানের প্ররোচনায় পড়ে বাতিল উপাস্যদের পূজা করে তারা মারাত্মক ভুল করেছে। আজ কেউ তাদের সাহায্যকারী নেই, যাদের প্ররোচনায় তারা অন্যায় অনাচারে লিপ্ত হয়েছে আজ তারা নিজেরাই বিপদগ্রস্ত, তাই তাদের পূজারীদের সাহায্য করার কথা সম্পূর্ণ অসম্ভব, অচিন্তনীয়, তাই সেদিন তারা পরস্পর কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে তাদের ভুল স্বীকার করবে। পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قَالُوا وَهُمْ فِيهَا يَخْتَصِمُونَ

দোযখে তারা একে অন্যের সঙ্গে কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়ে বলবে,

تَاللَّهِ إِنْ كُنَّا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

আল্লাহর শপথ! আমরা সুস্পষ্ট ভুলে ছিলাম, অর্থাৎ চরম পথভ্রষ্টতা ও ধ্বংসাত্মক ভ্রান্তিতে নিমজ্জিত ছিলাম। এ বিভ্রান্তি হলো স্রষ্টা ও পালনকর্তা আল্লাহ পাকের অবাধ্য হওয়া, যাঁর অনন্ত-অসীম দান প্রতিটি মানুষ অহরহ ভোগ করে তাঁর অকৃতজ্ঞ হওয়া, এমনকি তাঁর পরিবর্তে হাতে বানানো মূর্তির সম্মুখে মাথা নত করা।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩২

إِذْ نُسَوِّيكُم بِرَبِّ الْعَالَمِينَ

আমরা যখন তোমাদেরকে রব্বুল আলামীনের সমকক্ষ গণ্য করতাম, মূলতঃ তখনই আমরা ভুল করেছিলাম। আর সে ভুলের মাশুলই আজ আমাদেরকে দোযখের শাস্তির মাধ্যমে ভোগ করতে হচ্ছে।

সেদিন পূজারীরা তাদের উপাস্যদেরকে বলবে, আমরা অত্যন্ত মারাত্মক ভুল করেছি যখন আমরা তোমাদেরকে উপাস্য হিসাবে গ্রহণ করেছি, আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করেছি এবং তোমাদেরকে তাঁর সমকক্ষ মনে করেছি।

وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ

"আর এ পাপীষ্ঠরাই আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল"।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, المجرمون বা পাপীষ্ঠ বলে শয়তানদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর কালবী (রঃ) বলেছেন, এ শব্দটি দ্বারা পথভ্রষ্ট লোকদের পূর্ব পুরুষদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। কেননা তাদের অনুসরণেই লোকেরা শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত হয়েছে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে পাপীষ্ঠ তাদেরকে বলা হয়েছে যারা মানুষকে মূর্তি পূজার দিকে আকৃষ্ট করেছে তারা জ্বীন হোক বা মানুষ, যেমন কোরআনে করীমে রয়েছে কাফেরদের কথা।

رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا

"হে পরওয়ারদেগার! আমরা আমাদের নেতাদের কথা মেনে চলেছি, তাই তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছে"।[২]

এভাবে কাফেররা তাদের অপরাধ স্বীকার করবে এবং তাদের বিভ্রান্তির কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করবে। কিন্তু সে উপলব্ধি তাদের কোন উপকারে আসবে না। তাই তারা আক্ষেপ করে বলবে,

فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ

আমাদের এ কঠিন সংকট-মুহূর্তে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই, যেমন মোমেনদের জন্যে ফেরেশতাগণ ও নবী রসূলগণ সুপারিশকারী রয়েছেন। এমনকি আমাদেরকে সাহায্য সহায়তা করতে পারে এমন কোন বন্ধু-বান্ধবও নেই, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

অর্থাৎ আমাদের কোন খাঁটি বন্ধুও নেই কেননা, সেদিন মোমেনগণ একে অন্যের বন্ধু হবে। আর কাফেরদের পরস্পরের মধ্যে হবে শত্রুতা।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩৩
২। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৫২

যেমন অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلْاَخِلَّآءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ اِلَّا الْمُتَّقِيْنَ

দুনিয়াতে যারা পরস্পরের বন্ধু আখেরাতে তারাই একে অন্যের শত্রু হবে। তবে মোত্তাকী পরহেযগার লোকদের এ অবস্থা থাকবে না, তারা হবে পরস্পরের বন্ধু।

যাদেরকে কাফেররা বড় আশা করে পূজা করেছিল, যাদের প্রতি তাদের আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা উজাড় করে দিয়েছিল তারা আজ নিজেরাই বিপদগ্রস্ত, তাই পূজারীদের সাহায্য করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা।[১]

হযরত যাবের (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, আমি নিজেই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মানুষ জান্নাতে একথা বলবে, আমার অমুক বন্ধু কোথায়? অথচ ঐ বন্ধু তখন দোযখে থাকবে। আল্লাহ পাক এ পর্যায়ে আদেশ দান করবেন যে, জান্নাতীর বন্ধুকে দোযখ থেকে বের করে জান্নাতে নিয়ে যাও।

এরপর যারা দোযখে রয়ে যাবে তারা বলবে,

فَمَا لَنَا مِنْ شٰفِعِيْنَ ○ وَلَا صَدِيْقٍ حَمِيْمٍ

(হায়! আমাদের কোন সুপারিশকারীও নেই, আমাদের কোন সহৃদয় বন্ধুও নেই) এজন্যে হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন, তোমরা মোমেন বন্ধুদের সংখ্যা বৃদ্ধি কর কেননা, কেয়ামতের দিন তারা সুপারিশ করবে।

ঐ সংকটময় মুহূর্তে দোযখীরা আক্ষেপ করে বলবে,

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

(যদি আমরা আর একবার দুনিয়াতে ফিরে যেতে পারতাম তবে ঈমানদারদের অন্তর্ভুক্ত হতাম) কাফেররা এভাবে পৃথিবীতে দ্বিতীয়বার ফিরে আসার আকাঙ্ক্ষা করবে, কিন্তু এ আকাঙ্ক্ষায় তারা মোমেন হবার যে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে তা-ও আন্তরিক নয়, তাই তাদের একথাও সত্য নয়। এজন্যে পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে তাদের একথার বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

وَلَوْ رُدُّوْا لَعَادُوْا لِمَا نُهُوْا عَنْهُ

যদি তাদেরকে পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে যেতে দেয়া হয়, তবে তারা ঐ অন্যায় অনাচারের পুনরাবৃত্তি করবে যে সম্পর্কে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে।

বিশেষ নিদর্শন

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

(নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন) অর্থাৎ হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর এ ঘটনায় বুদ্ধিমান লোকদের জন্যে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। কেননা হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর বক্তব্যে

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১০২

রয়েছে তৌহিদের সুস্পষ্ট দলিল-প্রমাণ, সত্য পথের দিক-নির্দেশনা। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) কত সুন্দর এবং যুক্তিপূর্ণভাবে পৌত্তলিকতার বাতুলতা এবং তৌহিদের সত্যতা ঘোষণা করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তাঁর জাতির প্রতি কত দয়াদ্র ছিলেন এবং তাদেরকে গোমরাহীর অন্ধকার থেকে বের করে হেদায়েতের আলোর দিকে নিয়ে আসার জন্যে কত আগ্রহী ছিলেন, তা-ও লক্ষ্য করা যায়।

এতদ্ব্যতীত, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনাকে পবিত্র কোরআন কত সুন্দর, কত আকর্ষণীয় এবং কত হৃদয়গ্রাহী করে পেশ করেছে, তাও-ও বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

এতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জন্যে সান্ত্বনা, হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর শত চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর সম্প্রদায় তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি, অবশেষে নির্যাতীত অবস্থায় তাঁকে হিজরত করতে হয়েছে, এমনিভাবে মক্কাবাসী যদি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তা নতুন কিছু নয়।

দ্বিতীয়তঃ এতে হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার সুস্পষ্ট দলিলও রয়েছে। কেননা, সহস্রাধিক বছর পূর্বের সত্য ঘটনা তিনি বর্ণনা করেছেন অথচ তিনি ছিলেন উম্মী। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত ওহীর মাধ্যমে এসব ঘটনা তিনি জানতে পারেন, তাই তাঁর প্রতি ঈমান আনয়ন বা বিশ্বাস স্থাপন করা বুদ্ধিমান মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

(কিন্তু এতদসত্ত্বেও হতভাগাদের অনেকেই ঈমান আনবার নয়) অর্থাৎ ইব্রাহীম (আঃ) যত সুন্দরভাবেই আল্লাহ পাকের একত্ববাদের কথা তাঁর জাতিকে বুঝিয়েছেন, কিন্তু তারপরও তাদের অধিকাংশ লোক তাঁর প্রতি ঈমান আনেনি।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

(আর নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু) আল্লাহ পাক পরাক্রমশালী, তাই যে কোন সময় কাফেরদেরকে তিনি শাস্তি দিতে পারেন, কিন্তু এর পাশাপাশি তিনি পরম দয়ালুও। তাই তিনি তাদের শাস্তিকে ত্বরান্বিত করেন না; বরং তাদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকেন, যাতে করে তাদের বংশধরদের মধ্যে কেউ ঈমান আনতে পারে।[১]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৪৩
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩৪
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬১

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ ﴿١٠٥﴾ إِذْ قَالَ لَهُمْ
أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ﴿١٠٦﴾ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٠٧﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ
أَطِيعُونِ ﴿١٠٨﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿١٠٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١١٠﴾ قَالُوا أَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ
الْأَرْذَلُونَ ﴿١١١﴾ قَالَ وَمَا عِلْمِي بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿١١٢﴾ إِنْ حِسَابُهُمْ
إِلَّا عَلَىٰ رَبِّي لَوْ تَشْعُرُونَ ﴿١١٣﴾ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٤﴾ إِنْ أَنَا
إِلَّا نَذِيرٌ مُبِينٌ ﴿١١٥﴾ قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ
مِنَ الْمَرْجُومِينَ ﴿١١٦﴾ قَالَ رَبِّ إِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونِ ﴿١١٧﴾

তরজমা

(১০৫) নূহের জাতি রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল।

(১০৬) যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি ভয় কর না?

(১০৭) আমি তো তোমাদের জন্যে এক বিশ্বস্ত রসূল।

(১০৮) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।

(১০৯) আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন বিনিময় চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু বিশ্ব প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে।

(১১০) অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল।

(১১১) তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব? অথচ ইতরজনেরা তোমার অনুসরণ করছে।

(১১২) নূহ বললেনঃ তারা কি করতো তা আমার জানা নেই।

(১১৩) তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, অবশ্য যদি তোমরা তা বুঝতে পার।

(১১৪) মোমেনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়।

(১১৫) আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র।

(১১৬) তারা বলে, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

(১১৭) নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করেছে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহ আল্লাহ পাক হযরত মূসা (আঃ) এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণনা করেছেন। উদ্দেশ্য হল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া। যেভাবে কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনয়নের পরিবর্তে তাঁর প্রতি অকথ্য নির্যাতন করছিল, ঠিক এমনিভাবে হযরত মূসা (আঃ)-এর জাতি তাঁর প্রতি এবং হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর জাতি তাঁর প্রতি জুলুম করেছিল।

আলোচ্য আয়াতে এ পর্যায়ের তৃতীয় ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারাও হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) প্রায় হাজার বছর ধরে তাঁর জাতির নিকট আল্লাহ পাকের তৌহীদের বাণী পৌঁছিয়েছেন। তাদেরকে হেদায়েত করার জন্যে তিনি সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা তাঁর প্রতি বর্ণনাতীত নির্যাতন করেছে, আর তিনি সবর করেছেন।

হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে সম্বোধন করে বলেছেন, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল। তাই তোমাদের কর্তব্য হল আমার প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা, আমার অনুসারী হওয়া এবং আল্লাহ পাককে ভয় করা, কেননা তিনিই স্রষ্টা, তিনিই পালনকর্তা, মানুষ মাত্রকে অবশেষে তাঁর দরবারেই হাযির হতে হবে এবং প্রত্যেকটি মানুষকে তাঁর জীবনের যাবতীয় কর্মকান্ডের জন্যে জবাবদিহী করতে হবে। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ ِالْمُرْسَلِيْنَ

(নূহের জাতি রসূলগণের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি শুধু তাঁকেই মিথ্যা জ্ঞান করেছিল অন্য রসূলগণকে নয়, অথচ আলোচ্য আয়াতে المرسلين অর্থাৎ রসূলগণকে মিথ্যা জ্ঞান করেছিল বলা হয়েছে। এর কারণ এই যে, একজন রসূলকে অস্বীকার করার অর্থ সকল রসূলকে অস্বীকার করা। কেননা সকল নবী রসূলের আহ্বান একটিই, আর তা হল এক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, তাঁর প্রতি পূর্ণ আনুগত্য প্রকাশ কর, তাঁর বিধান মেনে চল। আখেরাতে বিশ্বাস কর এবং আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহ কর।

হযরত হাসান বসরী (রঃ) আলোচ্য প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন এভাবে। প্রত্যেক নবী একই বিশ্বাস, একই আমলের পয়গাম নিয়ে এসেছেন, অতএব যে একজন নবীকে অস্বীকার করে সে যেন সকল নবীকেই অস্বীকার করল।[১]

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ نُوْحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

যখন তাদের ভ্রাতা নূহ তাদেরকে বলেছিলেন তোমরা কি ভয় কর না? এখানে উল্লেখযোগ্য যে, হযরত নূহ (আঃ)-কে তাঁর জাতির ভাই বলা হয়েছে। এ ভ্রাতৃত্ব হল বংশ সূত্রে, তাদের দ্বীনি ভাই তিনি কখনো ছিলেন না।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩৫

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ন্যায় হযরত নূহ (আঃ)-ও তাঁর সততা ও আমানতদারীর জন্যে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেন,

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ

নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রসূল। আমি আল্লাহ পাকের প্রেরিত পুরুষ। আমি আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তোমাদের নিকট তাঁর মহান বাণী নিয়ে হাযির হয়েছি। আমি তাঁর বাণীর আমানতদার। আর আমার আমানতদারী ও সততা সম্পর্কে তোমরা সম্পূর্ণ অবগত।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আমার কথা মেনে চল। তোমাদের ব্যাপারে আমার কোন স্বার্থ নেই। অতএব, এ নিঃস্বার্থ হিতৈষী ভাইটির কথা তোমরা মেনে চল। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানাচ্ছি, আর এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার আদেশ দিচ্ছি। অতএব তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দাও এবং আমার আদেশ পালন কর, শেরক এবং মূর্তিপূজা পরিহার কর।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আমি তোমাদের নিকট এর জন্যে কোন বিনিময় চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো শুধু বিশ্ব প্রতিপালকের নিকটই রয়েছে"।

হযরত নূহ (আঃ) সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের রসূল হিসাবে আগমন করেছি। তোমাদের হেদায়েতের দায়িত্ব পালন করছি। কিন্তু এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমার পারিশ্রমিক তো স্বয়ং আল্লাহ পাকই দান করবেন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

(অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল) এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, এ কথাটি ইতিপূর্বেও বলা হয়েছে, বারবার কেন একই কথা বলা হয়? ইমাম রাজী (রঃ) এর জবাবে বলেছেন, একই কথা একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বপ্রথম لا تتقون শব্দটির অর্থ হলো لا تتقون مخالفنى অর্থাৎ তোমরা কি আমার বিরোধিতা করাকে ভয় কর না অথচ আমি আল্লাহর রসূল। আর দ্বিতীয়বার যখন لا تتقون বলা হয়েছে তখন এর অর্থ হলো তোমরা কি আমার বিরোধিতাকে ভয় কর না, অথচ আমি তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক চাইনা। অতএব, একই বাক্যেকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, আলোচ্য আয়াতে আল্লাহকে ভয় করার কথা আগে বলা হয়েছে পরে বলা হয়েছে আনুগত্যের কথা এর কারণ এই, আল্লাহর প্রতি ভয় থাকলেই আনুগত্যের গুণ অর্জিত হয়। পক্ষান্তরে, তাকওয়া পরহেযগারীর অভাব হলে আনুগত্যের গুণ অর্জন করা সম্ভব হয় না। শুধু এ কারণেই আল্লাহকে ভয় করার কথা আগে বলা হয়েছে এবং আনুগত্য প্রকাশের কথা পরে বলা হয়েছে।[১]

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড- ২৪, পৃষ্ঠা-১৫৫

এখানে আরো একটি বিষয় বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য, হযরত নূহ (আঃ) স্বীয় জাতিকে তাঁর নিজের দু'টি গুণের কথা বলেছেন (১) তিনি আমানতদার, বিশ্বস্ত। তাঁর আমানতদার হওয়ার দাবী হলো তাঁকে মেনে চলা। (২) এতে তাঁর কোন স্বার্থ নেই, তিনি কোন পারিশ্রমিকও চান না, অতএব যিনি নিঃস্বার্থ, যিনি হিতৈষী, যিনি কল্যাণকামী তাঁর কথা মেনে চলা একান্ত কর্তব্য।

قَالُوْٓا اَنُؤْمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الْاَرْذَلُوْنَ

(তারা বলল, আমরা কি তোমার প্রতি ঈমান আনব? অথচ ইতর জনেরাই তোমার অনুসরণ করছে) হযরত নূহ (আঃ)-এর আহ্বানের জবাবে তাঁর জাতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে বলল, সমাজের ইতর শ্রেণীর লোকেরাই তোমার অনুসারী হয়েছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার অনুসরণ করতে পারি।

আরোচ্য আয়াতের ارذلون শব্দটি ارزل শব্দের বহু বচন। এর অর্থ হলো ইতর, নীচু শ্রেণীর লোক, সমাজে যার সম্মান বা প্রতিপত্তি নেই। (قاموس)

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেনঃ যার সম্মান নেই এবং যার অর্থ সম্পদও কম তাকেই ارذل বলা হয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, নিম্ন শ্রেণীর লোককে ارذل বলা হয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো স্বর্ণকার। একরামা (রঃ। বলেছেন, কাপড় বুননকারী বা তাঁতী এবং চামারকে ارذل বলা হয়।

তফসীরকারগণ লিখেছেন যে, নূহ (আঃ)-এর জাতির কথাবার্তা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে তারা ছিল নির্বোধ, কেননা তারা বলেছিল যে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা শুধু অর্থ সম্পদ অর্জনের লোভেই হযরত নূহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তাদের সাথে মিলে মিশে তোমার প্রতি ঈমান আনব।[১]

এ আয়াত সমূহের তফসীরে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, এ পৃথিবীতে যখন সর্বপ্রথম মূর্তি পূজা আরম্ভ হয় এবং লোকেরা শয়তানের পথে চলতে শুরু করে, তখন আল্লাহ পাক মানব জাতির হেদায়েতের জন্য হযরত নূহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন। তিনি সেকালের মানুষকে আল্লাহ পাক সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন এবং আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হলে যে শাস্তি হবে সে সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন।

কিন্তু হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর সতর্কবাণীতে কর্ণপাত করেনি এবং তাদের অন্যায় অনাচার থেকে বিরতও হয়নি; বরং তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে, তাঁর শত্রু হয়েছে এবং তাঁর প্রতি জুলুম অত্যাচার করেছে।

এরপরও হযরত নূহ (আঃ) তাদেরকে বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। তখন তাঁর জাতি বলল, সমাজের কিছু ইতর শ্রেণীর লোকই তোমার প্রতি ঈমান এনেছে, এমন অবস্থায় আমরা কিভাবে তোমার প্রতি ঈমান আনতে পারি।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩৬

قَالَ وَمَا عِلْمِيْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ

"নূহ বললেন, তারা কি করত তা আমার জানা নেই"।

অর্থাৎ কাফেরদের এ দম্ভোক্তির জবাবে আল্লাহর নবী হযরত নূহ (আঃ) বললেন, যদি কেউ আমার নিকট সত্য গ্রহণের জন্যে হাযির হয় তখন এটি আমার কর্তব্য নয় যে আমি তার পেশা এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করি, বরং আমার কর্তব্য হলো যে সত্য গ্রহণে আগ্রহী হয় তার নিকট সত্য পৌঁছে দেয়া।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত নূহ (আঃ) বলেছেনঃ আমি জানি না যে কে কোন্ উদ্দেশ্যে আমার অনুসরণ করতে আসে, তারা শুধু আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যেই আসে অথবা পার্থিব জগতের কোন লাভ-লোভের জন্যে তা আল্লাহ পাকই ভাল জানেন।

اِنْ حِسَابُهُمْ اِلَّا عَلٰى رَبِّيْ لَوْ تَشْعُرُوْنَ

(তাদের হিসাব গ্রহণ তো আমার প্রতিপালকেরই কাজ, অবশ্য যদি তোমরা তা বুঝতে পার) আল্লাহ পাকই মানুষের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের খবর রাখেন, যদি তোমরা বুঝতে পারতে তবে এ সত্য উপলব্ধি করতে কিন্তু তোমাদের বুঝবার ক্ষমতা লোপ পেয়েছে, তাই তোমরা এ সত্য উপলব্ধি করতে পার না।

ফররা (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো যদি তোমাদের জ্ঞান থাকত তবে তোমরা মোমেনদেরকে নিম্ন শ্রেণীর লোক বলতে না।

وَمَآ اَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"মোমেনদেরকে তাড়িয়ে দেয়া আমার কাজ নয়"।

অর্থাৎ হযরত নূহ (আঃ) তাঁর জাতিকে জানিয়ে দিলেন যে, তোমাদের কথায় আমি দরিদ্র মোমেনদেরকে আমার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিতে পারিনা। অনুরূপভাবে তাদের মধ্যে কার কি পেশা রয়েছে তার অনুসন্ধান করাও আমার কাজ নয়।

اِنْ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّبِيْنٌ

(আমি তো শুধু একজন স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র) মানুষকে আল্লাহর নাফরমানী সম্পর্কে সতর্ক করাই আমার কাজ, এটিই আমার দায়িত্ব। আর এ দায়িত্ব সকলের ব্যাপারেই আমাকে পালন করতে হবে। ধনী-দরিদ্র, আশরাফ-আতরাফ এক কথায় সকলের জন্যেই আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে। সকলকে আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করাই আমার কর্তব্য। এ কর্তব্য পালনের ব্যাপারে মানুষের মধ্যে কোন প্রকার পার্থক্য করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব, তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্যে দরিদ্র মুসলমানদেরকে আমার নিকট থেকে বের করার প্রশ্নই ওঠেনা। আমার কাজ তোমাদেরকে সুস্পষ্ট ভাষায় সতর্ক করা, আর সে কাজ আমি করেছি।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰنُوْحُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَرْجُوْمِيْنَ

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৩৯

"তারা বলে, হে নূহ! যদি তুমি বিরত না হও, তবে তুমি অবশ্যই প্রস্তরাঘাতে নিহতদের অন্তর্ভুক্ত হবে"।

হযরত নূহ (আঃ) সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত তাঁর জাতিকে সত্যের দিকে আহ্বান করতে থাকেন, কিন্তু তাদের নাফরমানী উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। অবশেষে তারা হযরত নূহ (আঃ)-কে হুমকি ধমকি দিতে থাকে। তারা বলে, যদি তুমি উপদেশ বিতরণে ক্ষান্ত না হও, যদি তোমার এ কাজ অব্যাহত রাখ তবে আমরা তোমাকে পাথর মেরে মেরে শেষ করে দেব। যদি প্রাণ রক্ষা করতে চাও তবে আমাদেরকে উপদেশ দেয়া পরিত্যাগ কর।

হযরত নূহ (আঃ) যখন দেখলেন তারা কখনো হেদায়েত গ্রহণ করবেনা এবং তারা তাঁর প্রাণ সংহারে উদ্দত হতে চায়, এমন অবস্থায় হযরত নূহ (আঃ)-এর হাত আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ওঠে। তিনি মুনাজাত করলেন এভাবে–

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِ

"নূহ বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে অস্বীকার করেছে এবং আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে। অতএব, তাদের এবং আমার মাঝে চূড়ান্ত ফয়সালা করে দাও"।

হযরত নূহ (আঃ) সাড়ে নয়শ' বছর পর্যন্ত হেদায়েত করার পরও তারা তাঁর হেদায়েত গ্রহণ করল না, যখন কাফেররা পাথর মেরে তাঁকে হত্যা করার হুমকি দিল এবং তিনি যখন তাদের হেদায়েত সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখনই তিনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তাদের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে এ আরজী পেশ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! এ জাতিকে বোঝাতে সর্বাত্মক চেষ্টা করেছি কিন্তু তারা আমাকে শুধু মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তাদের হেদায়েত গ্রহণের কোন আশাই রয়নি, অতএব তাদের এবং আমার মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করে দাও।[১]

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ ﴿١١٨﴾
فَاَنْجَيْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ ﴿١١٩﴾ ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ
الْبٰقِيْنَ ﴿١٢٠﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٢١﴾ وَ
اِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٢٢﴾ كَذَّبَتْ عَادُ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٢٣﴾ اِذْ
قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ هُوْدٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٢٤﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٢٥﴾
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٢٦﴾ وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ
اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٢٧﴾

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪ পৃষ্ঠা-১৫৫

তরজমা

(১১৮) অতএব, আমার ও আমার জাতির মধ্যে চূড়ান্ত মীমাংসা করুন এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করুন।

(১১৯) এরপর আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে ঐ ভরা নৌযানে রক্ষা করলাম।

(১২০) আর অবশিষ্ট লোকদেরকে নিমজ্জিত করলাম।

(১২১) এতে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই বিশ্বাসী নয়।

(১২২) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক যারপর নাই শক্তিশালী, অতীব করুণাময়।

(১২৩) আদ জাতি পয়গম্বরগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে।

(১২৪) তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর না?

(১২৫) নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রসূল।

(১২৬) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে মেনে চল।

(১২৭) আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার বিনিময় শুধু আল্লাহ রব্বুল আলামীনই দান করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত নূহ (আৎ)-এর ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ) যখন তাঁর জাতির হেদায়েতের ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হলেন, তখন তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে আরজী পেশ করলেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার জাতি আমাকে মিথ্যা জ্ঞান করেছে, তারা আমাকে তোমার রসূল হিসেবেই স্বীকার করে না, তাই তারা আমার হেদায়েত মানে না।

আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, হে পরওয়ারদেগার! বর্তমান অবস্থায় আমার এবং আমার জাতির মধ্যে একটি চূড়ান্ত মীমাংসা করে দিন। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَافْتَحْ بَيْنِيْ وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, চূড়ান্ত মীমাংসার তাৎপর্য হলো, এ অবাধ্য জাতির প্রতি আযাব নাযিল করুন এবং তাদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করুন।[১]

এরপর হযরত নূহ (আঃ) একথাও বলেছেন,

وَّنَجِّنِيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"এবং আমাকে ও আমার সঙ্গী মোমেনদেরকে রক্ষা করুন"।

অর্থাৎ হে পরওয়ারদেগার! এ পাপীষ্ঠদের জন্যে যে আযাব নাযিল করা হবে তা থেকে আমাকে এবং আমার প্রতি যারা ঈমান এনেছে, তাদেরকে রক্ষা করুন।[২]

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৫৫

[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৩

رَبِّ اَنِّیْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ

হে পরওয়ারদেগার! নিশ্চয় আমি বিপদগ্রস্ত, আপনি প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। আল্লাহ পাক হযরত নূহ (আঃ)-এর মোনাজাত কবুল করলেন এবং প্রলয়ংকরী বন্যার আযাব নাযিল করলেন। তদানীন্তন পৃথিবীর সকল কাফেরকে নিমজ্জিত করে ধ্বংস করলেন এবং হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে রক্ষা করলেন, তাই এরশাদ হয়েছেঃ

فَاَنْجَیْنٰهُ وَمَنْ مَّعَهٗ فِی الْفُلْكِ الْمَشْحُوْنِ

(এরপর আমি তাকে এবং তার সঙ্গীদেরকে ঐ ভরা নৌযানে রক্ষা করলাম) আল্লাহ পাক বন্যার আযাব নাযিল করার পূর্বে হযরত নূহ (আঃ)-কে আত্মরক্ষার নিমিত্তে একটি কিশতি নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন, ঐ কিশতিতে সব জীব-জন্তুকে আরোহণের সুযোগ দেয়া হলো এবং হযরত নূহ (আঃ) ও তাঁর মোমেন সাথীগণও তাতে আরোহণ করলেন।

আল্লামা সয়ুতি (রঃ) লিখেছেন, এবনে জরীর এবং এবনে আবি হাতেম "আল মাশহুন" (المشحون) শব্দের ব্যাখ্যায় হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর অর্থ হলো পরিপূর্ণ। অর্থাৎ নৌযানটি সম্পূর্ণ ভরা ছিল আরোহীদের দ্বারা, আর সে আরোহী শুধু মানুষ নয়; বরং অনেক জীব-জন্তুও।[১]

যারা কাফের ছিল তারা হযরত নূহ (আঃ)-এর কিশতিতে আরোহণ করেনি, তাই নিমজ্জিত হয়ে ধ্বংস হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ اَغْرَقْنَا بَعْدُ الْبٰقِیْنَ

"আর অবশিষ্ট লোকদেরকে নিমজ্জিত করলাম"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের البقين শব্দটি কাফেরদের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ যারা হযরত নূহ (আঃ)-এর কিশতিতে আরোহণ করেনি, তারা সবই ছিল কাফের। এ কারণে তাদের প্রতি আযাব আপতিত হয়েছে এবং তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে।[২]

اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً

(নিশ্চয় এতে রয়েছে বিরাট নিদর্শন) যারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হয়, যারা তাঁর নবীর অনুসরণ করে, তারা নাজাত পায়। দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে তাদের জন্যে রয়েছে শান্তি, মুক্তি এবং চির সাফল্যের সুসংবাদ। পক্ষান্তরে, যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ হয়, তাঁর নবীকে অস্বীকার করে, আল্লাহ পাকের বিধান অমান্য করে তাদের শাস্তি অবধারিত, তাদের ধ্বংস অনিবার্য যেমন হযরত নূহ (আঃ)-এর অবাধ্য জাতি এই একই কারণে ধ্বংস হয়েছে এবং সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্যে শিক্ষণীয় উদাহরণে পরিণত হয়েছে।

---

[১]। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৩৭

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ

"আর তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন নয়"।

বর্ণিত আছে যে, হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির মধ্য থেকে মাত্র ৪০ জন পুরুষ এবং ৪০ জন নারী তাঁর কিশতিতে আরোহণ করেছিল।

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে যে কোন সময় শাস্তি দিতে পারেন, তিনি পরম করুণাময়, তাই তিনি অনেক অপরাধীকেও অবকাশ দিয়ে থাকেন, যাতে করে সে আত্ম বিশ্লেষণ করে তওবা করার সুযোগ পায়।[১]

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ

"আদ জাতি রসূলগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে"।

এ আয়াত থেকে এ পর্যায়ে চতুর্থ ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আল্লাহ পাক হযরত হুদ (আঃ)-কে আদ জাতির হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করেন। এ জাতি ছিল অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী, শুধু নিজেদের নাম, যশ, খ্যাতি অর্জনের লক্ষ্যে তারা বৃহদাকার অট্টালিকা নির্মাণ করত, আদ জাতি আহকাফ নামক স্থানের অধিবাসী ছিল। আহকাফ ইয়েমেনের হাজরামুত এলাকায় পাহাড়ের নিকটবর্তী স্থানের নাম, সূরা আরাফে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। নূহ (আঃ)-এর জাতির পরই আদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। তাদের সম্পদ ছিল অঢেল, ক্ষেত-খামার, বাগান, ফল-ফসল, নদ-নদী, ঝর্ণা–এককথায় সর্ব প্রকার নেয়ামতই তারা আল্লাহ পাকের দরবার থেকে পেয়েছিল, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা আল্লাহ পাকের অকৃতজ্ঞ ছিল, তারা আল্লাহ পাকের সাথে শেরক করত, হযরত হুদ (আঃ)-কে তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরণ করা হয়। কিন্তু আল্লাহর নবীকে তারা মিথ্যাজ্ঞান করে, শেরক ও কুফরীতে লিপ্ত থাকে। হযরত হুদ (আঃ) তাদেরকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান এবং দুনিয়ার এ জীবন যে নিতান্ত ক্ষণস্থায়ী, অবশেষে তাদের প্রত্যেককে আল্লাহ পাকের দরবারে হাযির হতে হবে– এ বিষয়ে তাদেরকে তিনি বোঝাতে চেষ্টা করেন। কিন্তু তারা তাঁর কোন কথা মানতেই রাজী হয়নি।

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ ○ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ○ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

তখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর-না? নিশ্চয় আমি তোমাদের জন্যে বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল। মানুষকে মন্দ পথ থেকে দূরে রাখার একমাত্র পন্থা হলো আল্লাহর ভয়। যদি কেউ আল্লাহকে ভয় করার গুণ অর্জন করতে পারে, তবে তার পক্ষে নেক আমল করা এবং মন্দ কাজ পরিহার করা সহজ হয়। এজন্যে হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে আল্লাহকে ভয় করার ব্যাপারে বিশেষ তাগিদ করেছেন। তিনি আরো বলেছেন, তোমরা জান আমি আমানতদার,

[১]। হযরত নূহ (আঃ)-এর ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৭৫-৮৪

আমি বিশ্বস্ত, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল, আর যে বিষয়ে আমি তোমাদেরকে উপদেশ প্রদান করি তার উপর তোমরা আমল কর।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি এর বিনিময়ে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীনই দান করবেন"।

অর্থাৎ আমি যে তোমাদেরকে সরল সঠিক পথ প্রদর্শন করছি, এতে আমার কোন স্বার্থ নেই, কোন কিছুর লাভে বা লোভে আমি এ কাজ করছি না কেননা, স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান, অতএব তোমরা আমার কথা মেনে চল।[১]

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ﴿١٢٨﴾ وَ
تَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ ﴿١٢٩﴾ وَاِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ
جَبَّارِيْنَ ﴿١٣٠﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٣١﴾ وَاتَّقُوا الَّذِىْٓ اَمَدَّكُمْ بِمَا
تَعْلَمُوْنَ ﴿١٣٢﴾ اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ﴿١٣٣﴾ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ ﴿١٣٤﴾ اِنِّىْٓ
اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٣٥﴾ قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ
اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ ﴿١٣٦﴾ اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ ﴿١٣٧﴾ وَمَا
نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ ﴿١٣٨﴾ فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ ۗ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۗ وَ
مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٣٩﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٤٠﴾
كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٤١﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٤٢﴾

তরজমা

(১২৮) তোমরা কি প্রতিটি উচ্চ স্থানে তোমাদের খেলা-ধূলার নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করছো?

(১২৯) আর তোমরা কি এভাবে প্রাসাদ নির্মাণ করছো যে তোমরা এখানেই চিরকাল থেকে যাবে।

(১৩০) আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে।

(১৩১) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।

(১৩২) ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সে সব কিছু যা তোমরাও জান।

(১৩৩) তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন চতুঃষ্পদ জন্তু এবং সন্তান-সন্ততি।

[১]। আদ জাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-২৮৪-৯৪

(১৩৪) (আরো দান করেছেন) বাগান এবং ঝর্ণামালা।

(১৩৫) আমি তোমাদের ব্যাপারে আশঙ্কা করি এক মহা দিনের আযাবের।

(১৩৬) তারা বলে, তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্যে সমান।

(১৩৭) এ-তো পূর্ববর্তী লোকদেরই স্বভাব।

(১৩৮) আমাদের উপর কোন আযাব আসবে না।

(১৩৯) এরপর তারা আল্লাহর নবীকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তাই আমি তাদেরকে ধ্বংস করলাম। নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মোমেন নয়।

(১৪০) আর (হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব করুণাময়।

(১৪১) আর সামুদ জাতি রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

(১৪২) যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেন, তোমরা কি ভয় কর-না?

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আদ জাতির নিকট প্রেরিত নবী হযরত হুদ (আঃ)-এর উপদেশের উল্লেখ ছিল। আর এ আয়াত থেকে আদ জাতি যে সব অন্যায় এবং অহেতুক কাজ করত, সেগুলোর বিবরণ রয়েছে। আদ জাতি দুনিয়ার মায়া-মোহে মুগ্ধ হয়েছিল, তাদের প্রাসাদ নির্মাণের আগ্রহ ছিল অত্যধিক। স্থাপত্য শিল্পে তারা দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিল, সুন্দর কারুকার্য খচিত সুউচ্চ মিনারা এবং স্তম্ভ নির্মাণের নেশায় তাদের পেয়ে বসেছিল। কিন্তু কোন প্রয়োজনে তারা তা করত না; বরং শুধু নাম করার জন্যে, পরস্পরের সঙ্গে পাল্লা দেয়ার লক্ষ্যে নিতান্ত অকারণে এসব স্থাপনা নির্মাণ করত। তাদের নির্মাণ শিল্পের সাধনা দেখলে মনে হতো যে তারা চিরদিন এ পৃথিবীতে থাকবে, অথচ ক্ষণস্থায়ী এ জগতে মানুষের জীবন একান্তই ক্ষণভঙ্গুর। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

اَتَبْنُوْنَ بِكُلِّ رِيْعٍ اٰيَةً تَعْبَثُوْنَ ○ وَتَتَّخِذُوْنَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ

"তোমরা কি প্রতিটি উচ্চস্থানে তোমাদের খেলা-ধূলার নিদর্শন প্রতিষ্ঠা করছো? আর তোমরা এভাবে প্রাসাদ নির্মাণ করছো যেন তোমরা এখানেই চিরকাল থেকে যাবে"।

তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের ﴿رِيْعٍ﴾ শব্দটির ব্যাখ্যায় একাধিক মত পোষণ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ বাক্যটির ব্যাখ্যা করেছেন উচ্চ স্থান।

তফসীরকার যাহ্যাক এবং মোকতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো প্রত্যেক রাস্তা। আর উফী (রঃ) থেকে বর্ণিত, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ মতও পোষণ করতেন।

মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, ﴿رِيْعٍ﴾ শব্দটির অর্থ হলো, দু' পাহাড়ের মাঝে নির্মিত রাস্তা।

মুজাহেদ (রঃ)-এর আরেকটি কথাও বর্ণিত আছে যে, এর অর্থ হলো দৃশ্য।

বিখ্যাত আরবী অভিধান গ্রন্থ কামুসে রয়েছে, এর অর্থ হলো উচ্চ স্থান। অথবা পাহাড়ের ভেতরের পথ অথবা সুউচ্চ পাহাড়। অথবা এর অর্থ হলো প্রত্যেক উঁচু স্থান সংলগ্ন সমতল ভূমি, ইহুদীদের গীর্জা, কবুতরের প্রকোষ্ঠ।

আলোচ্য আয়াতের آيَةً শব্দটির অর্থ হলো স্মারণিক, নিদর্শন যে নিদর্শন নির্মাতার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

تعبثون

অর্থাৎ তোমরা অহেতুক কাজ করছো, সুউচ্চ প্রাসাদ বা স্তম্ভ নির্মাণ করে নিতান্ত অহেতুক কাজ করছো, আখেরাতে যার কোন ফায়দা তোমরা পাবেনা; বরং দুনিয়াতে তা অকার্যকর, নিরর্থক, উদ্দেশ্য বিহীন কাজ। অথবা আলোচ্য আয়াতের آيَةً শব্দটির অর্থ হলো, পথিক মুসাফিরদের জন্যে পথের দিক-নির্দেশনার লক্ষ্যে নির্মিত স্তম্ভ। যেহেতু আদ জাতি নক্ষত্র দেখে তাদের সফরের পথ নির্দিষ্ট করত, তাই এ স্তম্ভ নির্মাণ সম্পূর্ণ অনর্থক ছিল।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আদ জাতি উচ্চ স্থানে প্রাসাদ নির্মাণ করত, যাতে করে উঁচু স্থানে দাঁড়িয়ে পথিকদের বিদ্রুপ করতে পারে।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আদ জাতি কবুতর নিয়ে খেলা করত। এজন্যে তারা সুউচ্চ পাহাড়ের ওপরে কবুতরের প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করত। হযরত হুদ (আঃ) তাদের এসব কাজ অপছন্দ করতেন। তিনি এসব প্রকোষ্ঠ নির্মাণকে অহেতুক, নিস্প্রয়োজনীয় বলে ঘোষণা করেছেন। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে تعبثون শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে।

হযরত হুদ (আঃ) তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা এসব অট্টালিকা নির্মাণ করে যে অহেতুক কাজ করছো, তোমরা কি মনে কর যে চিরকাল তোমরা এতে থাকবে?

মূলতঃ এসব কাজ হলো তাদের, যারা আখেরাতকে ভুলে যায়, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেয়, আখেরাতের চিরস্থায়ী জীবনকে ভুলে যায়, যেহেতু এ কাজটি ছিল সম্পূর্ণ নিস্প্রয়োজনীয়, অহেতুক এবং অহংকার ভিত্তিক, তাই হুদ (আঃ) তা পছন্দ করেননি। আমাদের প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামও তা পছন্দ করতেন না, এজন্যে তিনি এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দার অকল্যাণ কামনা করেন, তখন তাকে ইট এবং সিমেন্ট-বালু মেশানোর মধ্যে মশগুল করে দেন এবং সে সুউচ্চ ইমারত নির্মাণ করতে শুরু করে। (তেবরানী)

হযরত আবুল বাশার আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ পাক যখন কোন বন্দার অবমাননা দেখতে চান তখন ঐ বন্দা ইমারত নির্মাণে তার অর্থ-সম্পদ ব্যয় করে।

হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, একবার প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বাইরে বের হলেন, তিনি (পথিমধ্যে) একটি উঁচু নির্মাণাধীন ইমারত দেখতে পেলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, এটি কার? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এটি অমুক আনসারী সাহাবীর। তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নীরব হলেন। কিন্তু তাঁর মনে এ কথাটি রয়ে গেল। যখন ঐ ইমারতের মালিক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হলেন, তখন তিনি মজলিশে ছিলেন, ঐ ব্যক্তি তাঁকে সালাম দিলেন কিন্তু তিনি তাঁর দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন, এ অবস্থা কয়েকবার হলো, তখন ঐ ব্যক্তি উপলব্ধি করলো যে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার প্রতি অসন্তুষ্ট রয়েছেন। এজন্যে তিনি আমার দিক থেকে বিমুখ হয়েছেন (কিন্তু তাঁর অসন্তুষ্টির কারণ তিনি উপলব্ধি করতে পারেননি)। তাই সাহাবায়ে কেরামকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তাঁরা বললেনঃ তিনি

একদিন বাইরে তশরিফ নিয়ে গিয়েছিলেন এবং তোমার নির্মাণাধীন ইমারত দেখেছিলেন, একথা শ্রবণ করা মাত্র তিনি সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে ফিরে আসলেন এবং ইমারতটি ভেঙে মাটির সাথে মিশিয়ে দিলেন। কিছুদিন পর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ঐ পথ দিয়ে পুনরায় গমন করলেন, কিন্তু ঐ ইমারতটি দেখা গেলনা, তাই তিনি প্রশ্ন করলেন, ইমারতটির কি হয়েছে? সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, এর মালিক আপনার অসন্তুষ্টির কারণ আমাদেরকে জিজ্ঞাসা করলে আমরা তাঁকে ঐ ইমারতের কথা জানিয়ে দিলাম, তিনি তখন ইমরাতটি ভেঙে চুরমার করে দেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, শোন! প্রত্যেক ইমরাতই তার মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে তবে সেই ইমারত নয় যা একান্ত জরুরী, যা ব্যতীত কোন গত্যন্তর নেই।

ইমাম আহমদ এবং এবনে মাজা হযরত আনাস (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলন করেছেন যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ প্রত্যেক ইমারতই কেয়ামতের দিন তার মালিকের জন্যে বিপদের কারণ হবে মসজিদ এবং বাসস্থান ব্যতীত।

مصانع

অর্থাৎ- ঝরণা, উঁচু ইমারত, মহল দুর্গ প্রভৃতি।

لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُوْنَ

তোমরা এসব আকাশচুম্বি ইমারত এ আশায় নির্মাণ করছো যেন তোমরা চিরকাল এ পৃথিবীতে বাস করবে।

বস্তুতঃ আত্মবিস্মৃত মানুষ এ ক্ষণস্থায়ী জগতকে এবং ক্ষণভঙ্গুর জীবনকে চিরস্থায়ী মনে করে তার মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা লালন করে। কোরআনে করীমে আল্লাহ পাক সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন,

(১) (সূরা নেছা) قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ

"(হে রসূল!) আপনি ঘোষণা করুন, দুনিয়ার আসবাবপত্র অতি সামান্য"।

(২) (সূরা আ'লা) وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ وَّاَبْقٰى

"আর আখেরাত উত্তম এবং চিরস্থায়ী"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, বোখারী শরীফে সংকলিত হাদীসে রয়েছে তিনি বর্ণনা করেন যে, একবার হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমার দেহের কোন অংশ স্পর্শ করে বললেন, দুনিয়াতে এভাবে জীবন-যাপন করবে যেন তুমি বিদেশী, অথবা পথিক, আর নিজেকে মৃতদের অন্তর্ভুক্ত মনে করবে। হযরত এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, একবার হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম (আমাদের বাড়ীর এলাকা) অতিক্রম করছিলেন, আমি এবং আমার মা আমাদের ঘরটি মাটি দ্বারা মেরামত করছিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আবদুল্লাহ! কি করছো? আমি আরজ করলাম ঘর মেরামত করছি, তিনি এরশাদ করলেন, তকদিরী হুকুম এর পূর্বেই আসতে পারে অর্থাৎ মৃত্যু তোমার মাথার উপরেই দন্ডায়মান, হয়তো এ ঘর মেরামতের পূর্বেই পৌঁছে যাবে। (আহমদ, তিরমিযী)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম অজুর অবশিষ্ট পানি ফেলে দিতেন, পরবর্তী মঞ্জিলে যদি পানি না পাওয়া যেত তবে তিনি তাইয়াম্মুম করে নিতেন, আমি আরজ করতাম ইয়া রসূলাল্লাহ! পানি নিকটেই আছে। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করতেন, যদি আমরা পানি পর্যন্ত না পৌঁছতে পারি অর্থাৎ পানি পর্যন্ত পৌঁছার পূর্বেই যদি মৃত্যুর অলঙ্ঘনীয় বিধান কার্যকর হয় তবে কি অবস্থা হবে।[১]

وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِيْنَ

(আর যখন তোমরা আঘাত হান তখন আঘাত হান অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে) পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আদ জাতির বিভিন্ন চারিত্রিক দুর্বলতার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, অর্থ-সম্পদের লোভ-লালসা, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের প্রতি অধিক পরিমাণে আকৃষ্ট হওয়া, পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হওয়া, আত্মম্ভরিতা, মানুষের মধ্যে নিজেদের অহমিকা এবং বড়াই প্রকাশের নিমিত্তে আকাশচুম্বি স্থাপনা নির্মাণ প্রভৃতি। আর আলোচ্য আয়াতে তাদের অন্য একটি বিশেষ চারিত্রিক দুর্বলতার উল্লেখ রয়েছে, তা হলো তাদের জুলুম অত্যাচার, তাদের নিষ্ঠুরতা। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا بَطَشْتُمْ

আর যখন তোমরা কারো প্রতি আঘাত বা কারো উপর হস্তক্ষেপ কর তখন তোমরা নিষ্ঠুর অত্যাচারীর পরিচয় দাও, তোমাদের নিষ্ঠুরতা, নির্দয়তা মানুষের জন্যে বিপদ ডেকে আনে।

فَاتَّقُوا اللهَ وَأَطِيْعُوْنِ

অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং এসব অন্যায় আচরণ পরিহার কর। মানুষের প্রতি জুলুম করার মাধ্যমে তোমরা যে ক্ষমতার দম্ভ প্রকাশ কর তা অবশেষে নিঃশেষ হয়ে যাবে, তোমাদেরকে এক আল্লাহ্ পাকের দরবারে অপরাধী হয়ে হাযির হতে হবে এবং কৃতকর্মের শাস্তি অবশ্যই তোমাদেরকে ভোগ করতে হবে। আর তোমরা আমার কথা মেনে চল, এতেই রয়েছে তোমাদের সার্বিক কল্যাণ।

وَاتَّقُوا الَّذِيْ أَمَدَّكُمْ بِمَا تَعْلَمُوْنَ

অর্থাৎ ভয় কর তাঁকে যিনি তোমাদেরকে দান করেছেন সে সব নেয়ামত সমূহ যে সম্পর্কে তোমরাও অবগত রয়েছে।

এ আয়াতে দ্বিতীয়বার আল্লাহ্ পাককে ভয় করার তাগিদ করা হয়েছে, আর আল্লাহ্ পাকের প্রদত্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। এতে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় করে জীবন-যাপন কর, তবে তোমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ অব্যাহত থাকবে।

---

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৫৭
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪০
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০০

পক্ষন্তরে, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় না কর, তবে আল্লাহ পাকের নেয়ামত থেকে তোমরা বঞ্চিত হবে।

হাকীমূল উম্মত হযরত থানভী (রঃ) এ আয়াত সমূহের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, আলোচ্য সূরায় একাধিক নবী রসূলগণের উপদেশের উল্লেখ রয়েছে এবং প্রায় একই কথা যেমন তাকওয়া পরহেযগারী অবলম্বনের কথা বারংবার বলা হয়েছে। এর কারণ এই, সকল আম্বিয়ায়ে কেরাম একই পন্থায় মানুষকে আল্লাহর দ্বীনের দিকে আহ্বান করতেন। দ্বিতীয়তঃ আদ জাতি সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণের ব্যাপারে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা তাদের প্রয়োজনের আয়োজনে করেনি; বরং তাদের অন্তরের অহমিকা প্রকাশের লক্ষ্যে লোক দেখানোর জন্যে করেছে।

تعبثون

শব্দ দ্বারা এ মর্মই উপলব্ধি করা যায়। আর তাদের এ কাজ শুধু নিষ্প্রয়োজনীয়ই ছিলনা; বরং এতে ছিল অর্থ-সম্পদের অপচয় আর অপচয়ীদেরকে পবিত্র কোরআনের ভাষায় "শয়তানের ভাই" বলা হয়েছে।[১]

আদ জাতির বিবরণে সর্বপ্রথম الا تتقون (তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর না?) শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। এতে সংক্ষিপ্তভাবে তাদের অপরাধী হবার কথা ঘোষণা করা হয়েছে। এরপর بِمَا تَعْلَمُوْنَ শব্দ দ্বারা আল্লাহ পাকের নেয়ামত সমূহ স্মরণ করা হয়েছে। যাতে করে তারা আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞ থাকে। এরপর আল্লাহ পাকের প্রদত্ত নেয়ামত সমূহের বিস্তারিত বিবরণ স্থান পেয়েছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَمَدَّكُمْ بِاَنْعَامٍ وَّبَنِيْنَ ○ وَجَنّٰتٍ وَّعُيُوْنٍ.

"তিনি তোমাদেরকে দান করেছেন চতুঃস্পদ জন্তু এবং সন্তান-সন্ততি, আরও দান করেছেন বাগান এবং ঝরণা মালা"।

বস্তুতঃ আল্লাহ পাকই মানুষকে দান করেছেন আরোহণের জন্যে চতুঃস্পদ জন্তু এবং এমনিভাবে তার সন্তান-সন্ততিও মানুষের প্রতি আল্লাহ পাকেরই দান। এমনিভাবে বাগ-বাগিচা এবং ঝরণা সমূহ এক কথায় মানুষের নিকট যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের দান। অতএব, মানুষের কর্তব্য হলো আল্লাহ পাকের দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা, তাঁর শোকর গুজার হওয়া।

কিন্তু যারা আল্লাহ পাকের অবাধ্য ও অকৃতজ্ঞ হয় তাদের উদ্দেশ্যে উচ্চারিত হয়েছে বিশেষ সতর্কবাণী। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنِّيْٓ اَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

"আমি তোমাদের ব্যাপারে এক কঠিন দিনের আযাবের আশঙ্কা করছি"।

আর এ কঠিন দিন দুনিয়াতেও হতে পারে আখেরাতেও হতে পারে। কেননা আল্লাহ পাক দান করতেও পারেন, আবার ছিনিয়েও নিতে পারেন। তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী।

---

[১]। তফসীরে বয়ানুল কোরআন, পৃষ্ঠা-৭৩২-৩৩
তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৫৪

قَالُوْا سَوَآءٌ عَلَيْنَآ اَوَعَظْتَ اَمْ لَمْ تَكُنْ مِّنَ الْوٰعِظِيْنَ

তারা বলে, তুমি উপদেশ দাও বা না-ই দাও উভয়ই আমাদের জন্যে সমান। হযরত হুদ (আঃ)-কে তাঁর জাতি একথা বলে জবাব দিল, তুমি আমাদেরকে উপদেশ দাও বা না-ই দাও আমাদের জন্যে দু'ই সমান অর্থাৎ তোমার সকল প্রচেষ্টা হবে বৃথা, আমরা যে পথে চলছি তা কখনো পরিহার করব না।

الْوٰعِظِيْنَ

ওয়াজ বলা হয় সেই কথাকে যা মানুষকে সরল সঠিক পথ গ্রহণে আকৃষ্ট করে, আর যে কথায় মানুষের অন্তর আকৃষ্ট হয়, আর যাতে ভয় এবং আশার বাণী থাকে তাকেই ওয়াজ বলা হয়।

হযরত হুদ (আঃ) তাঁর জাতিকে যে নসিহত করেছিলেন তাঁর জাতি আদৌ তা গ্রহণ করেনি, বরং তারা সুস্পষ্ট ভাষায় তাঁকে জানিয়ে দিয়েছে যে, আমরা আপনার কথা মানবো না এবং আপনাকে নবী হিসাবে স্বীকার করবো না, আর আপনার কথায় আমাদের পূর্ব পুরুষদের নীতি পরিহার করবো না।

اِنْ هٰذَآ اِلَّا خُلُقُ الْاَوَّلِيْنَ

এ-তো পূর্ববর্তী লোকদেরই স্বভাব। তারা এভাবেই মিথ্যা কথা বানিয়ে বলত, অথবা এর অর্থ হলো আমাদের যে ধর্ম তা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরও ধর্ম ছিল। আমরা সেই সনাতন ধর্মের অনুসারী, অথবা এর অর্থ হলো জীবন ও মৃত্যু আবহমান কাল ধরেই হয়ে আসছে। লোকেরা জীবন লাভ করে এবং মৃত্যুমুখে পতিত হয়, এটিই স্বাভাবিক।

অথবা এর অর্থ হলো, সৃষ্টির প্রথম দিন থেকেই এ অবস্থা অব্যাহত রয়েছে। কেউ জন্ম গ্রহণ করে আর কারও মৃত্যু হয়। আমরা জন্মগ্রহণ করেছি এবং আমাদের মৃত্যু হবে। যাদের মৃত্যু হয়েছে তারা পুনরায় ফিরে আসেনি এবং তাদের কোন হিসাব-নিকাশও হয়নি। এমনিভাবে আমাদেরও মৃত্যু হবে, আর দ্বিতীয় বার আমাদের পুনরুত্থান হবে না, আর আমাদের কোন হিসাব-নিকাশও হবে না।

وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِيْنَ

আর আমাদের উপর কোন আযাবও আপতিত হবে না। অর্থাৎ আমরা যে পন্থায় রয়েছি তার কারণে আমাদের প্রতি কোন আযাবও আসবে না।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَهْلَكْنٰهُمْ

হুদ (আঃ)-এর জাতি তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে। তাই আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। বর্ণিত আছে যে, অবাধ্য আদ জাতির উপর ভয়ংকর ঝড়-ঝঞ্ঝার আযাব আপতিত হয়, পরিণামে তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

"নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মোমেন নয়"।

এ ঘটনায় আল্লাহ পাকের বিস্ময়কর কুদরত এবং তাঁর নবীর সত্যতার বিশেষ নিদর্শন রয়েছে, বিশ্ববাসী এ ঘটনা থেকে অনেক কিছু শিখতে পারে। আর তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন ছিলনা। এ বাক্য দ্বারা এ বিষয়ে ইঙ্গিত রয়েছে, যদি আদ জাতির অধিকাংশ বা অর্ধেক লোকও ঈমান আনতো তবে তাদের উপর আযাব আসতো না।[১]

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

"আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান"। তিনি পরাক্রমশালী বলেই তো অবাধ্য আদ জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছেন। আর দয়াবান বলেই তো অনেক অবাধ্য জাতিকে অবকাশ দিয়েছেন, যেমন মক্কাবাসী কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে চরম কষ্ট দেয়, কিন্তু আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করেননি, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْلَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَآءٌ مُّؤْمِنٰتٌ .....لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا

"যদি মোমেন পুরুষ ও নারীগণ না থাকতো তবে অবশ্যই তাদের মধ্যকার কাফেরদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিতাম"।[২]

كَذَّبَتْ ثَمُوْدُ الْمُرْسَلِيْنَ

"সামুদ জাতিও নবীগণকে মিথ্যাজ্ঞান করেছে"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে।

আর এ আয়াত থেকে সামুদ জাতির উল্লেখ রয়েছে। সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আঃ) প্রেরিত হয়েছিলেন, সামুদ জাতি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল, শষ্য-শ্যামলিমায় পরিপূর্ণ ছিল তাদের এলাকা। বাগ-বাগিচা-ঝরণায় এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছিল তাদের চতুর্দিকে। কিন্তু এ হতভাগা জাতি আল্লাহ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ ছিল। মূর্তি পূজা, ডাকাতি-রাহজানিতে লিপ্ত ছিল, তাই সালেহ (আঃ) তাদেরকে উপদেশ দিয়েছিলেনঃ

اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ صٰلِحٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

যখন তাদের ভাই সালেহ তাদেরকে বলেছিলেনঃ তোমরা কি ভয় কর-না?

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪২
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪২

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ﴿١٤٣﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٤٤﴾ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ
مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٤٥﴾ أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا
آمِنِينَ ﴿١٤٦﴾ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٤٧﴾ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ﴿١٤٨﴾
وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ ﴿١٤٩﴾ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ ﴿١٥٠﴾
وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَ
لَا يُصْلِحُونَ ﴿١٥٢﴾ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٥٣﴾ مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ
مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٥٤﴾

তরজমা

(১৪৩) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রসূল।

(১৪৪) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।

(১৪৫) আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রকার বিনিময় চাইনা, আমার প্রাপ্য প্রতিদান তো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকই দান করবেন।

(১৪৫) যা এখানে আছে তাতে তোমাদেরকে কি নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে?

(১৪৭) উদ্যান এবং ঝর্ণামালার মাঝে।

(১৪৮) শষ্য ক্ষেত্রে এবং কোমলগুচ্ছ বিশিষ্ট খেজুর বাগানে?

(১৪৯) তোমরা তো অত্যন্ত নিপূণতার সাথে পাহাড় কেটে গৃহ নির্মাণ করছো।

(১৫০) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।

(১৫১) আর দুবৃত্তদের কথা মেনে চলোনা।

(১৫২) যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, শান্তি স্থাপন করে না।

(১৫৩) তারা বলে, তোমাকে তো কেউ যাদু করেছে মনে হয়।

(১৫৪) তুমি তো আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, অতএব তুমি যদি সত্যবাদী হও তবে কোন নিদর্শন পেশ কর।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন, সামুদ জাতির নিকট হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়, কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তিনি তাদেরকে আল্লাহর আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং আল্লাহকে ভয় করার উপদেশ দেন এবং পরকালীন

চিরস্থায়ী জিন্দেগীর কথা চিন্তা করে এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনয়নের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ

আমি তোমাদের নিকট প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল, তোমাদের হেদায়েতের জন্যেই আল্লাহ পাক আমাকে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছেন, আমি তোমাদের শুভ কামনা করি, তোমাদের কল্যাণের পথ প্রদর্শন করি, অতএব তোমরা এক আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আন, তাঁর আযাবকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল, কেননা আমি আল্লাহ পাকের রসূল। এরশাদ হয়েছেঃ

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর বিধান মেনে চল এবং আমার অনুসারী হও। আর আমি যে তোমাদের জন্যে ও তোমাদের সঠিক কল্যাণ সাধনের জন্যে চেষ্টা করছি, এর জন্যে তোমাদের নিকট কোন পারিশ্রমিক বা বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় বা প্রতিদান স্বয়ং আল্লাহ পাকই দান করবেন। কেননা, আমি তাঁর সত্য রসূল। এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রকার বিনিময় চাইনা, আমার প্রাপ্য প্রতিদান তো শুধু বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকই দান করবেন"।

সামুদ জাতির আবাস

সামুদ জাতি হজর নামক শহরের অধিবাসী ছিল। এ শহরটি ওয়াদিউল কোরা এবং সিরিয়ার মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত। আদ জাতির ধ্বংসের পর সামুদ জাতির অভ্যুত্থান হয়। নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাবুক অভিযানের সময় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের এলাকা অতিক্রম করেছিলেন।[১]

হযরত সালেহ (আঃ) সামুদ জাতিকে তাদের প্রতি আল্লাহ পাকের নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেন এবং তাদের ভবিষ্যত সম্পর্কে সতর্ক করেন। এরশাদ হয়েছেঃ

أَتُتْرَكُونَ فِي مَا هَاهُنَا آمِنِينَ ○ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ○ وَزُرُوعٍ وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ○ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ.

যা এখানে আছে তাতে কি তোমাদেরকে নিরাপদে থাকতে দেয়া হবে? উদ্যান এবং ঝর্ণামালার মাঝে, শষ্য ক্ষেত্রে এবং কোমলগুচ্ছ খেজুর বাগানে? তোমরা তো অত্যন্ত নিপূণতার সাথে পাহাড় কেটে সুউচ্চ অট্টালিকা নির্মাণ করছো এবং এসব বাড়ী-ঘর, অট্টালিকা নিয়ে মেতে আছ, তোমরা কি মনে করেছ যে, চিরকাল এ সুখ-সম্পদ নিয়ে নিরাপদে থাকতে পারবে? কখনো কি এ অট্টালিকা সমূহ তোমাদেরকে ত্যাগ করতে হবে না? অতএব, দুনিয়ার এ

[১]। সামুদ জাতি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৩-০৯

ক্ষণস্থায়ী জীবনের মোহ ত্যাগ কর, আল্লাহকে ভয় কর, তোমাদের এ বাগ-বাগিচা, এ শষ্য-শ্যামলিমায় পূর্ণ ফসল ক্ষেত্র সমূহ, খেজুর এবং আঙ্গুরের বাগানগুলো এর কোন কিছুই চিরস্থায়ী নয়। তোমরাও চিরস্থায়ী নও, অবশেষে তোমাদের সকলকে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে হাযির হতে হবে।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, কেননা আল্লাহ পাকের ভয় কারো অন্তরে থাকলে আল্লাহর নাফরমানী থেকে আত্মরক্ষা করা সম্ভব হয়। আর আমার অনুসরণ কর, কেননা আমি আল্লাহর নবী, আর নবীর অনুসরণের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করতে পারে।

وَلَا تُطِيْعُوْٓا اَمْرَ الْمُسْرِفِيْنَ

আর যারা সীমালঙ্ঘনকারী, তাদের অনুসারী হয়োনা। যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে, সীমালঙ্ঘন করে এবং আত্ম সংশোধনে রত হয়না।

হযরত সালেহ (আঃ) তাঁর জাতিকে বিশেষভাবে নসিহত করেন, কিন্তু তারা তাঁর নসিহতে কর্ণপাতও করেনি।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ

হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতি তাঁর জবাবে বলল, তুমি তো এমন লোক যাকে যাদু করা হয়েছে, আর যাদুগ্রস্ত লোকের কথা আমরা কি করে মেনে নেব?

مَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

এতদ্ব্যতীত, তুমি আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, আমাদের তুলনায় তোমার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নেই যে কারণে তোমাকে মেনে চলতে হবে? বিচিত্র নয় যে তুমি যা কিছু বলছো তা হয়তো যাদুর প্রভাবেই বলছো।

فَاْتِ بِاٰيَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ

তবুও যদি তুমি রেসালতের দাবীতে সত্য হও, তবে কোন নিদর্শন পেশ কর, যার দ্বারা তোমার রেসালতের সত্যতা প্রমাণিত হবে।

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ
لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ ﴿١٥٥﴾ وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ
عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿١٥٦﴾ فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ ﴿١٥٧﴾ فَاَخَذَهُمُ
الْعَذَابُ ؕ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٥٨﴾
وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٥٩﴾ كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِالْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٦٠﴾
اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿١٦١﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٦٢﴾
فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٦٣﴾ وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ
اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٤﴾ اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٦٥﴾ وَ
تَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ ﴿١٦٦﴾

তরজমা

(১৫৫) সালেহ বললেন এই উষ্ট্রী, এক দিন তার পানি পানের পালা, আর একদিন তোমাদের পালা নির্দিষ্ট হলো।

(১৫৬) আর তোমরা এর অনিষ্ট সাধন করোনা। যদি কর, তবে এক মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে।

(১৫৭) কিন্তু তারা ঐ উষ্ট্রীটিকে বধ করল, অবশেষে তারা অনুতপ্ত হলো।

(১৫৮) এরপর আযাব তাদেরকে গ্রাস করে ফেলল, নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন নয়।

(১৫৯) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক পরাক্রমশালী, অতীব দয়াময়।

(১৬০) লুতের জাতিও রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

(১৬১) তাদের ভাই লুত যখন তাদেরকে বলেছিল, তোমরা কি ভয় কর-না?

(১৬২) নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রসূল।

(১৬৩) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুগত হও।

(১৬৪) আর আমি এজন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাই না। আমার পুরস্কার তো বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকের নিকটই রয়েছে।

(১৬৫) দুনিয়াতে তোমরা কি শুধু পুরুষদের সাথেই উপগত হও?

(১৬৬) এবং তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে পত্নীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা তাদেরকে বর্জন করছো? বস্তুতঃ তোমরা সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট তাঁর রেসালতের নিদর্শন দাবী করে। এ আয়াত সমূহে সেই নিদর্শনেরই বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরশাদ হয়েছেঃ

قَالَ هٰذِهٖ نَاقَةٌ لَّهَا شِرْبٌ وَّلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ

"এই উষ্ট্রী, একদিন তার পানি পানের পালা, আরেকদিন তোমাদের পালা নির্দিষ্ট হলো"।

বর্ণিত আছে যে, হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট সামুদ জাতি বলল, এই পাথরের ভেতর থেকে একটি দশ মাসের গর্ভবতী উষ্ট্রী বের করে আন, তাহলে আমরা ঈমান আনব। হযরত সালেহ (আঃ) দু' রাকাআত নামায আদায় করে আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে একটি শব্দ শ্রুত হলো, পাথরটি ফেটে গেল, আর তার ভেতর থেকে একটি উষ্ট্রী বের হয়ে আসল, কিছুক্ষণ পর তার একটি বাচ্চাও হলো। হযরত সালেহ (আঃ) বললেন, এ উষ্ট্রীটি একদিন কূপে পানি পান করবে, সেদিন তোমাদের কোন উষ্ট্রী পানি পাবেনা, অন্যদিন তোমাদের উষ্ট্রী পানি পান করবে।

وَلَا تَمَسُّوْهَا بِسُوْٓءٍ فَيَاْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

আর তোমরা এর কোন অনিষ্ট সাধন করবেনা। যদি কর তবে এক মহাদিনের শাস্তি তোমাদের উপর আপতিত হবে। কিন্তু এ সতর্কবাণী শ্রবণ করা সত্ত্বেও তারা সতর্ক হলোনা, বরং তারা আল্লাহ পাকের কুদরতি উষ্ট্রীটিকে পেয়ে বধ করল।

فَعَقَرُوْهَا فَاَصْبَحُوْا نٰدِمِيْنَ

কিন্তু তারা ঐ উষ্ট্রীটিকে বধ করল, অবশেষে তারা অনুতপ্ত হলো, কিন্তু যা হবার হয়েই গেল, তাদের এ অন্যায়-আচরণের শাস্তি স্বরূপ তাদের প্রতি আযাব আপতিত হলো।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

নিশ্চয় এতে রয়েছে বিরাট নিদর্শন, নিঃসন্দেহে এ হলো এক বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়, আর তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন ছিলোনা।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

(হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান। যারা অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ তাদের শাস্তি বিধানে তিনি সম্পূর্ণ সক্ষম। আর যাদের সম্পর্কে তাঁর ইচ্ছা হয় তাদের প্রতি তিনি দয়াও করেন। কেননা, তিনি পরম দয়ালু।

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوْطِ ِۨالْمُرْسَلِيْنَ ○ اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوْهُمْ لُوْطٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

"লুতের জাতি রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল, যখন তাদের ভাই লুত তাদেরকে বলেছিলেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর-না"?

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে সামুদ জাতির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। আর এ আয়াত থেকে হযরত লুত (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। হযরত লুত (আঃ) হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতঃস্পুত্র ছিলেন। তাঁকে আল্লাহ পাক সাদোম এলাকার জন্যে নবী মনোনীত করে প্রেরণ করেছেন।

সাদোম শহরটি সিরিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এলাকায় অবস্থিত। এ এলাকার অধিবাসীরা শুধু যে মূর্তিপূজক ছিল তাই নয়; বরং তারা নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার হয়েছিল। তারা সমকামিতায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে অনেক উপদেশ দিয়েছেন।' কিন্তু তারা পথে আসেনি, তাঁর কোন উপদেশ তারা গ্রহণ করেনি। তাই আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছেঃ

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ ۨالْمُرْسَلِيْنَ.

"লুতের জাতিও রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল"।

হযরত লুত (আঃ)-কে সেই জাতির ভাই বলা হয়েছে তবে তিনি তাদের বংশীয় সূত্রে বা ধর্মের দিক থেকে ভাই ছিলেন না, তিনি ছিলেন তাদের দেশী ভাই। তাদেরকে মন্দ পথ পরিহার করার জন্যে তিনি উপদেশ দেন, কিন্তু তারা তাতে কর্ণপাত করেনি। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা কি আল্লাহ পাককে ভয় কর-না? কেননা, প্রত্যেকটি মানুষকে কেয়ামতের কঠিন দিনে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে তার কৃতকর্মের জন্যে অবশ্যই জবাবদিহী করতে হবে, ভাল কাজের পুরস্কার যেমন থাকবে তেমনি মন্দ কাজের শাস্তি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহের অবকাশ নেই। মন্দ কাজের পরিণতি মন্দই হয়। হযরত লুত (আঃ)-এর জাতি অমার্জনীয় অপরাধে লিপ্ত ছিল, তাই তিনি তাদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে সাবধান করেছেন।

اِنِّىْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ○ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ

"নিশ্চয় আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রসূল"। অর্থাৎ তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌঁছানোর ব্যাপারে তথা রেসালতের দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে আমি আমানতদার, অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছে দিয়েছি। অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং আমার কথা মেনে চল কেননা, জীবন-সাধনার সার্থকতায় পরকালীন জীবনে পরম সাফল্য লাভের জন্যে এটিই একমাত্র পথ।

وَمَآ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِىَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

"আর আমি এজন্যে তোমাদের নিকট কোন প্রকার প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান শুধু আল্লাহ পাকই দান করবেন"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত লুত (আঃ)-এর পুরো নাম ছিল লুত এবনে হারান এবনে আজর। হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর ভ্রাতঃস্পুত্র হযরত লুত (আঃ)-কে তাঁর জীবদ্দশায়ই আল্লাহ পাক নবী মনোনীত করেছিলেন। লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায় যখন তাদের ঘৃণ্য কুকর্ম থেকে বিরত থাকতে রাজী হলোনা, তখন আল্লাহ পাকের গজব তাদের প্রতি আপতিত হয়, এ স্থানটি আজো বিশ্ববাসীর উপদেশ গ্রহণের জন্যে একটি বিরাট পরিত্যক্ত জলাভূমিতে পরিণত হয়ে রয়েছে। অথচ এ স্থানটি লুত (আঃ)-এর জাতির আবাস-স্থল ছিল,

হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে বার বার বললেন, দেখ তোমাদের অর্থ-সম্পদের আমার কোন প্রয়োজন নেই, তোমাদের কাছে আমি কোন প্রকার প্রতিদানও চাইনা, আল্লাহ পাকের নিকটই রয়েছে আমার প্রতিদান, আমি শুধু চাই তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর নাফরমানী বর্জন কর, ঘৃণ্য কুকর্ম পরিহার কর।

اَتَاْتُوْنَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعٰلَمِيْنَ ○ وَتَذَرُوْنَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِّنْ اَزْوَاجِكُمْ ؕ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ .

হযরত লুত (আঃ) তাঁর জাতিকে ভর্ৎসনা করে বলেনঃ সারা পৃথিবীতে তোমাদের যৌন সম্ভাগের জন্যে পুরুষরাই কি রয়েছে? এ দুনিয়ায় শুধু তোমরাই এ ঘৃণ্য এবং নিন্দনীয় কুকর্মে লিপ্ত রয়েছ, তোমাদের প্রতিপালক তোমাদের জন্যে যে পত্নীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে তোমরা ত্যাগ করছো। তোমাদের এ জঘন্য আচরণ নিঃসন্দেহে মানবতা-বিরোধী কাজ। এটি শুধু যে প্রকৃতি বিরুদ্ধ কুকীর্তি তা নয়; বরং এটি হলো মানবতার অবমাননা। যাদের মানবতা লোপ পায়, মানুষ যখন হায়েনায় পরিণত হয় তখনই তারা এমন জঘন্য অপরাধ করে, সুস্থ প্রকৃতির অধিকারী কোন মানুষ এমন জঘন্য অপরাধ করতে পারেনা। তাই এরশাদ হয়েছে।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ عٰدُوْنَ .

(বরং তোমরাই হলে সীমা লঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়) আর পবিত্র কোরআনের অন্য আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ.

"নিশ্চয় আল্লাহ পাক সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না"।

قَالُوْا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ ﴿١٦٧﴾ قَالَ اِنِّيْ
لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ ﴿١٦٨﴾ رَبِّ نَجِّنِيْ وَاَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ﴿١٦٩﴾ فَنَجَّيْنٰهُ وَ
اَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ﴿١٧٠﴾ اِلَّا عَجُوْزًا فِي الْغٰبِرِيْنَ ﴿١٧١﴾ ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ﴿١٧٢﴾
وَاَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ﴿١٧٣﴾ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً ؕ
وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿١٧٤﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿١٧٥﴾
كَذَّبَ اَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿١٧٦﴾ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا
تَتَّقُوْنَ ﴿١٧٧﴾ اِنِّيْ لَكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ﴿١٧٨﴾ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ ﴿١٧٩﴾
وَمَاۤ اَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ ۚ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلٰى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿١٨٠﴾

তরজমা

(১৬৭) তারা বলে, "হে লুত! যদি তুমি বিরত না হও তবে তুমি দেশান্তরিত হবে"।

(১৬৮) লুত বললেন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কার্যকলাপে বিরক্ত বোধ করি।

(১৬৯) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তাদের জঘন্য কীর্তিকলাপ থেকে রক্ষা কর।

(১৭০) তাই আমি তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করি।

(১৭১) শুধু একটি বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত।

(১৭২) এরপর আমি অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করি।

(১৭৩) তাদের উপর এক প্রকার শাস্তিমূলক বৃষ্টি বর্ষণ করি, যাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের প্রতি বর্ষিত এ বৃষ্টি কত নিকৃষ্ট ছিল!

(১৭৪) নিশ্চয় এতে রয়েছে এক নিদর্শন, তবে তাদের অধিকাংশই মোমেন নয়।

(১৭৫) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান।

(১৭৬) আইকাবাসীরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল।

(১৭৭) যখন শোয়ায়েব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর-না?

(১৭৮) আমি তোমাদের নিকট বিশ্বস্ত রসূল।

(১৭৯) অতএব, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার কথা মেনে চল।

(১৮০) আমি এর পরিবর্তে তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চাইনা; আমার প্রতিদান একমাত্র আল্লাহ পাকই দান করবেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির ঘৃণ্য কর্মের বিবরণ রয়েছে এবং হযরত লুত (আঃ) তাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছেন তার উল্লেখ রয়েছে। হযরত লুত (আঃ)-এর নসিহতের জবাবে তাঁর পথভ্রষ্ট জাতি যে ঔদ্ধত্যপূর্ণ বক্তব্য রেখেছে, এ আয়াত সমূহে তা স্থান পেয়েছে।

قَالُوا لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يٰلُوْطُ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِيْنَ

হযরত লুত (আঃ)-এর জাতি তাঁর নছিহতের জবাবে বলে, হে লুত! তোমার এ পরহেযগারী আমরা পছন্দ করি না, আর তোমার এসব উপদেশ বাণীরও আমরা তোয়াক্কা রাখিনা, যদি তুমি তোমার নছিহত বিতরণ থেকে বিরত না হও তবে নিশ্চিতভাবে জেনে রেখ যে, আমরা তোমাকে দেশ থেকে বহিষ্কার করব।

قَالَ اِنِّيْ لِعَمَلِكُمْ مِّنَ الْقَالِيْنَ

হযরত লুত (আঃ) তাদের কথার জবাবে বললেন, মনে রেখ! আমি তোমাদের হুমকি-ধমকিকে ভয় করিনা। আর তোমরা যে কুকর্মে লিপ্ত রয়েছ, তাকে কোন ভাবেই আমি সমর্থন করতে পারিনা, আমি তোমাদের জঘন্য আচরণের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করছি এবং তোমাদেরকে

এ পাশবিক কাজ পরিহার করার উপদেশ দিচ্ছি। কিন্তু যখন ঐ হতভাগা লোকেরা তাদের মন্দ কাজ বর্জন করতে রাজী হলোনা, হযরত লুত (আঃ) তাদের উপদেশ গ্রহণের ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গেলেন, তখন তিনি আল্লাহ্ পাকের দিকে মনোনিবেশ করে মোনাজাত করলেন, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এবং আমার পরিবারবর্গকে তাদের জঘন্য কীর্তিকলাপ থেকে রক্ষা কর। আর তাদের এ অন্যায়ের পরিণামে যে আযাব আসবে, তা থেকে রক্ষা কর।

فَنَجَّيْنٰهُ وَاَهْلَهٗۤ اَجْمَعِيْنَ ○ اِلَّا عَجُوْزًا فِى الْغٰبِرِيْنَ.

(তাই আমি তাকে এবং তার পরিবারবর্গকে রক্ষা করি। শুধু একটি বৃদ্ধা ব্যতীত, সে ছিল পশ্চাতে অবস্থানকারীদের অন্তর্ভুক্ত) হযরত লুত (আঃ) দুবৃত্তদের ধ্বংসের জন্যে যখন দোয়া করলেন, আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর দোয়া কবুল হলো এবং হযরত লুত (আঃ)-এর পরিবারবর্গকে আল্লাহ্ পাক তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করলেন। যেহেতু দুবৃত্তদের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর যোগাযোগ ছিল, এজন্যে সে-ও তাদের সঙ্গে ধ্বংস হয়। তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যরা রক্ষা পান।

ثُمَّ دَمَّرْنَا الْاٰخَرِيْنَ

এরপর আমি অন্যান্য সকলকে ধ্বংস করি, এ অবাধ্য জাতির উপর পাথরের বৃষ্টিপাত হয়, এরপর তাদের সমগ্র জনপদটিকে উল্টে দেয়া হয়। এভাবে জঘন্য চরিত্রের এ জাতির মূলোৎপাটন করা হয়।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী যেহেতু কাফেরদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখত, তাই তাদের সঙ্গেই রয়ে গিয়েছিল। পরিণামে সে-ও ধ্বংস হয়েছে।

বর্ণিত আছে, হযরত লুত (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশে আযাব নাযিল হবার পূর্বে যখন জনপদ ছেড়ে চলে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর স্ত্রীও পেছনে আসছিল। কিন্তু যেহেতু তার আন্তরিক সম্পর্ক অবাধ্য জাতির সঙ্গে ছিল এবং তাদের কুকর্মকে সে পছন্দ করত, এজন্যে আকাশ থেকে যে প্রস্তর বর্ষিত হচ্ছিল তার একটি এ স্ত্রীলোকটির ওপর পড়ে, সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, সে জনপদ থেকে বের হয়নি; বরং কাফেরদের সঙ্গেই ছিল, আর তাদের সঙ্গেই সে ধ্বংস হয়।[২]

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً

নিশ্চয় এ ঘটনায় রয়েছে নিদর্শন, যারা আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত ভোগ করেও তাঁর অবাধ্য হয়, তাদের নাফরমানী ও অন্যায়-অনাচার দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তোলে তাদের এমন ভয়াবহ পরিণতিই হয়। হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির অধিকাংশ লোক মোমেন ছিলনা, তাই তাদের ধ্বংস হয়েছে অনিবার্য।

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ

১। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩১৩-১৬
২। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪৬

(হে রসূল!) আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, তিনি অত্যন্ত দয়াময়ও। তিনি যখন যাকে শাস্তি দিতে চান, তখন কেউ তাঁকে বাধা দিতে পারেনা। তাই তাঁর ইচ্ছা সর্বত্র হয় কার্যকর। এর পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত দয়াময়। তাই অনেক অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ মানুষকে তিনি দয়া করে অবকাশ দিয়ে থাকেন।

كَذَّبَ أَصْحٰبُ لْـَٔيْكَةِ الْمُرْسَلِيْنَ

"আইকাবাসীরা রসূলগণকে অস্বীকার করেছিল। যখন শোয়ায়েব তাদেরকে বললেন, তোমরা কি ভয় কর-না"?

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে আইকাবাসী বলতে মাদায়েনের অধিবাসীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। তারা আইকা নামক একটি বৃক্ষের পূজা করত, তাই তাদেরকে আইকাবাসী বলা হয়েছে। আর এ কারণেই হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে তাদের ভাই বলা হয়নি। কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন যে, হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে যেমন মাদায়েনবাসীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে, ঠিক তেমনি তাঁকে আইকাবাসীর নিকটও প্রেরণ করা হয়েছে।

একরামা (রঃ) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক কোন একজন নবীকে দু'বার প্রেরণ করেননি, শুধু হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে এ সুযোগ দেয়া হয়েছে। একবার তিনি মাদায়েনবাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছেন, এরপর তাঁকে আইকাবাসীর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।[১]

اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا تَتَّقُوْنَ

হযরত শোয়ায়েব (আঃ) যখন তাদেরকে বললেন, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর-না? আমি তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত বিশ্বস্ত রসূল। অতএব, তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তাঁর প্রতি ঈমান আন এবং তাঁর বিধান মেনে চল, আর আমার অনুসারী হও, আমি যে তোমাদের নিকট আল্লাহ পাকের বাণী পৌছে দিচ্ছি, এর জন্যে আমি তোমাদের নিকট কোন প্রকার বিনিময় চাইনা, আমার বিনিময় দান করবেন স্বয়ং বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাক রব্বুল আলামীন।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে উল্লেখ্য, পৃথিবীতে যত নবীর আগমন হয়েছে সকলেই তৌহিদ বা আল্লাহ পাকের একত্ববাদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছেন এবং শেরক না করার তাগিদ করেছেন এবং নবীর অনুসরণের আহ্বান জানিয়েছেন। যেমন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন ঃ

اِنَّآ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ كَمَآ اَوْحَيْنَآ اِلٰى نُوْحٍ وَّالنَّبِيّٖنَ مِنْۢ بَعْدِهٖ

(হে রসূল!) আপনার নিকট আমি ওহী প্রেরণ করেছি যেমন ইতিপূর্বে নূহের প্রতি এবং তারপর অন্যান্য নবীগণের নিকটও আমি ওহী প্রেরণ করেছি। এর দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে হেদায়েত দু'টি নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৪৬

(এক) তৌহিদ বা আল্লাহর একত্ববাদের বিশ্বাস স্থাপন করা। (দুই) আল্লাহর নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে তাঁর পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। এ দু'টি নীতি সর্বকালেই অপরিবর্তনীয় ছিল যেমন আজো রয়েছে। ইতিহাস সাক্ষী! যারাই এ দু'টি নীতি মেনে চলেছে তারাই দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে সাফল্য লাভ করেছে। পক্ষান্তরে, যারা এ দু'টি নীতি অমান্য করেছে তারাই ধ্বংস হয়েছে এবং ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। হযরত নূহ (আঃ)-এর জাতির পর থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটেছে।

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ﴿١٨١﴾ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ
الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ
مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾ وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْأَوَّلِينَ ﴿١٨٤﴾
قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ ﴿١٨٥﴾ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَ
إِنْ نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿١٨٦﴾ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ
إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿١٨٧﴾ قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨٨﴾ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿١٨٩﴾

তরজমা

(১৮১) আর তোমরা পরিমাপ পূর্ণ করে দিও এবং যারা পরিমাপে কম দেয় তাদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা।

(১৮২) এবং ওজন করবে সঠিকভাবে, সোজা দাঁড়ি পাল্লায়।

(১৮৩) আর মানুষকে তাদের প্রাপ্য বস্তু কম দিওনা, আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা।

(১৮৪) যিনি তোমাদেরকে এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন তাঁকে ভয় কর।

(১৮৫) তারা বলল, তোমাকে তো কেউ যাদু করেছে।

(১৮৬) তুমি তো আমাদের ন্যায় একজন মানুষই, আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদীদের অন্তর্ভুক্ত।

(১৮৭) যদি তুমি সত্য হও, তবে আমাদের উপর আকাশের একখন্ড পতিত কর।

(১৮৮) শোয়ায়েব বললেন, আমার প্রতিপালক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত।

(১৮৯) এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল, এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল। নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মাদায়েনবাসীর নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন। তারা আল্লাহ পাকের নাফরমানীতে লিপ্ত ছিল। তাই তিনি আল্লাহ পাককে ভয় করার উপদেশ দেন যার উল্লেখ ইতিপূর্বে হয়েছে।

মাদায়েনবাসী শুধু যে শেরক ও মূর্তি পূজায় লিপ্ত ছিল তাই নয়; বরং তারা মানুষের প্রতি জুলুম-অত্যাচার করতো, ওজনে ফাঁকি দিত, ছল-চাতুরী করত, চুরি-ডাকাতি-রাহজানিতেও তারা ছিল অভ্যস্ত। মানুষের প্রাপ্য না দিয়ে ওজনে ফাঁকি দিয়ে এমনকি, ডাকাতি রাহজানি করে অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধির অপপ্রয়াসে তারা লিপ্ত ছিল। হযরত শোয়ায়েব (আঃ) তাদেরকে এ সম্পর্কেও বিশেষভাবে উপদেশ দিয়েছেন। আলোচ্য আয়াত সমূহে এ উপদেশেরই উল্লেখ রয়েছে।

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُوْنُوْا مِنَ الْمُخْسِرِيْنَ

আর তোমরা পরিমাপে পুরোপুরি দিও, কারো প্রাপ্য কম দিওনা, মানুষের হক্ব বিনষ্ট করোনা। দাঁড়ি পাল্লা সোজা করে ওজন কর, সঠিক ওজন দিও, মানুষের জিনিষপত্র কম দিওনা, নিজের হক্ব যেভাবে পূর্ণ মাত্রায় নিয়ে থাক, ঠিক তেমনি অন্যের হক্বও পুরো মাত্রায়ই দিও।

وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

আর পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করোনা। ডাকাতি রাহজানির মাধ্যমে সমাজ জীবনকে অশান্ত করে তূলোনা।

وَاتَّقُوا الَّذِىْ خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّلِيْنَ

আর তোমরা আল্লাহ পাককে ভয় কর, তিনিই তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে তিনিই সৃষ্টি করেছেন। তিনিই সর্বশক্তিমান। তিনি যখন ইচ্ছা তখন তোমাদেরকে পৃথিবী থেকে চিরতরে বিদায় করতে পারেন। অতএব, তাঁর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা এবং তাঁকে ভয় করা তোমাদের একান্ত কর্তব্য।

قَالُوْٓا اِنَّمَآ اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِيْنَ ○ وَمَآ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর পথভ্রষ্ট জাতি তাঁকে বলে, আমাদের ধারণা কেউ তোমাকে যাদু করেছে, তা না হলে তুমি আমাদের অর্থনৈতিক জীবনে মন্দা ডেকে আনার চেষ্টা কেন করছো? আমাদের আর্থিক ক্ষতি সাধনে কেন তুমি প্রয়াসী হয়েছ? ওজনে ফাঁকি দিয়ে ছল-চাতুরী করে আমরা আমাদের অর্থনৈতিক পরিবৃদ্ধির চেষ্টা করছি, আর তুমি তাতে বাধা দিচ্ছ। দ্বিতীয়তঃ তুমি তো আমাদেরই ন্যায় একজন মানুষ, তুমি আবার আল্লাহর নবী হলে কি করে? আমাদের উপর তোমাকে এ প্রাধান্য কিভাবে দেয়া হলো? তাই নবুওয়্যতের দাবীতে আমরা তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

فَاَسْقِطْ عَلَيْنَا

"যদি তুমি সত্য হও তবে আমাদের উপর আকাশের এক খন্ড পতিত কর"।

অর্থাৎ যদি তুমি নবুওয়্যতের দাবীতে সত্য হও, তবে আসমানের একটি খন্ড আমাদের উপর পতিত কর, যাতে করে একথা প্রমাণিত হয় যে, তুমি সত্য নবী এবং তোমার বিরোধিতার কারণেই আমাদের উপর আযাব আপতিত হয়েছে।

قَالَ رَبِّيْٓ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ

শোয়ায়েব বললেন, "আমার প্রতিপালক তোমাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে সর্বাধিক অবগত", অর্থাৎ হযরত শোয়ায়েব (আঃ) বললেন, তোমরা যে ওজনে ফাঁকি দিয়ে থাক, চুরি-ডাকাতি, রাহজানি করে থাক তোমাদের এসব ঘৃণ্য কার্যকলাপ সম্পর্কে আমার প্রতিপালক সম্পূর্ণ অবগত। কোন কিছুই তাঁর নিকট গোপন নেই, তিনি যখন ইচ্ছা তখনই তোমাদেরকে শাস্তি দিতে পারেন। এটি তাঁর একান্ত ইচ্ছার ব্যাপার, তাতে আমার কোন হাত নেই। আমার দায়িত্ব হলো শুধু তোমাদেরকে সত্যের প্রতি আহ্বান জানানো। এরপর যদি তোমরা আমার আহ্বানে সাড়া দাও, তবে তোমাদের ভাগ্য হবে সুপ্রসন্ন। পক্ষান্তরে, যদি তোমরা আমাকে অবিশ্বাস কর, তবে তার ভয়াবহ পরিণতি তোমাদেরকেই ভোগ করতে হবে। এর শাস্তি কি হবে, আর কখন হবে এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ পাকই অবগত রয়েছেন।

فَكَذَّبُوْهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ

"এতদসত্ত্বেও তারা তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল, এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল"।

হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর নিকট থেকে সতর্কবাণী শ্রবণ করার পরও তাঁর সম্প্রদায় তাঁকে মিথ্যাজ্ঞান করল, এরপর তাদেরকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি গ্রাস করল।

আইকাবাসী ধ্বংস হলো

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে ওমর (রাঃ) বর্ণনা করেন, সাত দিন পর্যন্ত এ সম্প্রদায় তাদের এলাকায় অত্যন্ত গরমে কষ্ট পায়, সামান্য ঠান্ডা বাতাসও ছিল দুর্লভ। এরপর দেখা গেল একটি মেঘখন্ড ছায়া ফেলছে, এক ব্যক্তি ঐ ছায়ায় আশ্রয় নিয়ে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে, এ দৃশ্য দেখে সকলেই ঐ মেঘমালার ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করে, এমন সময় আকাশ থেকে অগ্নি-বৃষ্টি হতে থাকে, এদিকে ভূমিকম্প এবং ভয়ংকর গর্জনে তাদের বক্ষ বিদীর্ণ হয়, এভাবে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর অবাধ্য জাতি পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশ থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

মোহাম্মদ এবনে কা'ব কারযী (রঃ) বলেছেন, মাদায়েনবাসীর নিকট তিন প্রকার আযাব আসে, শহরে ভূমিকম্প শুরু হয়, তখন তারা আত্মরক্ষার্থে শহরের বাইরে চলে যায়। সেখানেও গরমে তারা ব্যাকুল হয়ে পড়ে, কিন্তু শহরে যাওয়ার সাহস হয়নি, ঠিক এমন সময় তারা দেখল একটি মেঘখন্ড চাঁদোয়ার ন্যায় শূণ্যে স্থাপিত হয়েছে। এক ব্যক্তি তার ছায়ায় উপস্থিত হয়ে একটু আরাম বোধ করল, ফলে ঐ ছায়ায় অন্যদেরকেও সে ডাকল। যখন সকলে একত্রিত হলো তখন ভয়ংকর গর্জন শুরু হলো, যে কারণে তাদের প্রত্যেকেরই হৃৎপিন্ড ফেটে চৌচির হয়ে গেল। আর ঐ অহংকারী, অবাধ্য জাতি ক্ষণিকের মধ্যেই মৃত লাশের স্তূপে পরিণত হলো।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, সর্বপ্রথম তাদের এলাকায় অস্বাভাবিক গরম শুরু হয় যে কারণে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট হতে থাকে, ঐ অবস্থায় তারা শহর ছেড়ে ময়দানের দিকে চলে যায়, এরপর আকাশে একটি মেঘখন্ড দেখা যায়, তারা সকলে তার ছায়ায় একত্রিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি বৃষ্টি শুরু হয়, পরিণামে তারা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়।

কোরআনে করীমে এ ঘটনাকে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি বলে অভিহিত করা হয়েছে।[১]

إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ

নিশ্চয় তা ছিল এক ভীষণ দিনের শাস্তি, যে শাস্তির কারণে একটি অবাধ্য, অকৃতজ্ঞ জাতি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যায়।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-কে দু'টি জাতির নিকট প্রেরণ করেন (১) আইকাবাসী (২) মাদায়েনবাসী। আইনকাবাসীকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করেন মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি দিয়ে আর মাদায়েনবাসীকে ধ্বংস করা হয় প্রচন্ড গর্জনের মাধ্যমে। হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যখন ভয়ংকর গর্জন করেন তখন মাদায়েনবাসীর কলিজা বিদীর্ণ হয়ে যায়। মাদায়েনবাসীকে সামুদ জাতির ন্যায় শাস্তি দেয়া হয়। যারা আল্লাহর নাফরমানী দ্বারা এ সুন্দর বসুন্ধরাকে অসুন্দর করে তোলে, অপবিত্র করে, তাদের শাস্তির ব্যবস্থা করা হয় আল্লাহ পাকের তরফ থেকে, শাস্তি বিধানের পূর্বে তাদেরকে সতর্ক করা হয়, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা যখন অন্যায়-অনাচার অব্যাহত রাখে এবং জাতির অধিকাংশ লোক অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত থাকে, তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে শাস্তি আপতিত হয়।[২]

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً ۖ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ ﴿١٩٠﴾ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ﴿١٩١﴾ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿١٩٢﴾ نَزَلَ بِهِ
الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ ﴿١٩٥﴾ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ ﴿١٩٦﴾ أَوَلَمْ يَكُن لَّهُمْ آيَةً أَن
يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلَ ﴿١٩٧﴾ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ﴿١٩٨﴾
فَقَرَأَهُ عَلَيْهِم مَّا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ﴿١٩٩﴾ كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ
الْمُجْرِمِينَ ﴿٢٠٠﴾ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ﴿٢٠١﴾ فَيَأْتِيَهُم
بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿٢٠٢﴾

১। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৪৭-৪৮
২। তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০২
তফসীরে মাজাহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪৯
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৬৪

তরজমা

(১৯০) এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে, আর তাদের অধিকাংশ লোকই মোমেন নয়।

(১৯১) (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার প্রতিপালক অত্যন্ত পরাক্রমশালী, অতীব দয়াবান।

(১৯২) আর এই কোরআনকে নিশ্চয় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাকই নাযিল করেছেন।

(১৯৩) বিশ্বস্ত ফেরেশতা (জীব্রাঈল) তা নিয়ে অবতরণ করেছে।

(১৯৪) (হে রসূল!) আপনার অন্তরে; যাতে করে আপনি ভয় প্রদর্শনকারী হতে পারেন।

(১৯৫) (পবিত্র কোরআন নাযিল হয়েছে) প্রাঞ্জল আরবী ভাষায়।

(১৯৬) পূর্ববর্তীদের কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে।

(১৯৭) বনী ইসরাঈলের (তত্ত্বজ্ঞানী) আলেমগণ যে এর খবর রাখতেন, এটি কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নিদর্শন নয়?

(১৯৮) যদি আমি ভিন্ন ভাষা ভাষী কারো উপর এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল করতাম।

(১৯৯) এরপর সে তা তাদের নিকট পাঠ করত, তবুও তারা তা বিশ্বাস করতো না।

(২০০) এভাবেই আমি পাপীষ্ঠদের অন্তরে এ অস্বীকৃতিকে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছি।

(২০১) (প্রকৃত অবস্থা এই) যতক্ষণ পর্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তারা না দেখবে, ততক্ষণ বিশ্বাস করবেনা।

(২০২) তাই তাদের উপরে অতর্কিত ভাবেই আযাব আসবে, তারা তা টেরও পাবেনা।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে হযরত শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতির প্রতি তাদের নাফরমানীর কারণে যে আযাব নাযিল হয়েছিল তার বিবরণ স্থান পেয়েছে, আর এ আয়াত সমূহে ঘোষণা করা হয়েছে, উপরোল্লিখিত ঘটনায় সমগ্র মানব জাতির জন্যে রয়েছে বিশেষ নিদর্শন, এটি সকলের জন্যে শিক্ষণীয় বিষয়, আল্লাহ্ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত অহরহ ভোগ করেও যারা আল্লাহ্ পাকের অবাধ্য অকৃতজ্ঞ হয় এমনকি, তাদের হেদায়েতের জন্যে প্রেরিত নবী রসূলগণকেও যারা অমান্য করে তাদের পরিণাম শোচনীয় হবে, এটিই স্বাভাবিক। অতএব, আলোচ্য ঘটনা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

এ সূরায় এ পর্যন্ত পূর্বকালের নবীগণের সাতটি ঘটনা সংক্ষিপ্তভাবে বর্ণিত হয়েছে, এর দ্বারা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে, তাঁর যুগের কাফেররা তাঁকে যে কষ্ট দিচ্ছিল, তার উপর তিনি যেন সবর অবলম্বন করেন, উপরোল্লিখিত ঘটনা সমূহের বর্ণনা দ্বারা এ সত্য প্রকাশিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত নবীগণের বিরোধিতা করা হয়েছে যুগে যুগে। আর নবীগণ কাফেরদের বিরুদ্ধে সত্য-সংগ্রামে সংকল্পের দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছেন। যে কোন মূল্যে তাঁরা সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন, অকথ্য নির্যাতন সহ্য করেছেন কিন্তু সত্যের পতাকাকে কখনো অবনমিত হতে দেননি, অবশেষে আল্লাহ পাকের সাহায্য এসেছে, সত্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে, বাতিল বিদায় নিয়েছে এবং সত্যদ্রোহীদেরকে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাক সর্বত্রই

নবী রসূল ও তাঁদের প্রতি বিশ্বাসীগণকে বিজয়ী করেছেন। নূহ (আঃ)-এর জাতি, আদ ও সামুদ জাতি, লুত (আঃ) ও শোয়ায়েব (আঃ)-এর জাতি সহ সকল দূরাত্মা কাফেরদের ধ্বংসের মাধ্যমে এ সত্যই বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে।

সতর্কবাণী

তফসীরকারগণ এ কথাই লিখেছেন যে, এ ঘটনা সমূহের বর্ণনায় সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করছিল এ মর্মে যে, পূর্বকালের নবী রসূলগণের বিরোধীদের যে পরিণতি হয়েছে, তোমাদেরও তেমনি ভয়াবহ পরিণতি হবে। অতএব, তোমরা সতর্ক হও।[১]

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ○ نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ ○ عَلٰى قَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِرِيْنَ.

"আর এই কোরআনকে নিশ্চয় বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকই নাযিল করেছেন। বিশ্বস্ত ফেরেশতা তা নিয়ে অবতরণ করেছে, (হে রসূল!) আপনার অন্তরে তা পৌঁছে দিয়েছে যাতে করে আপনি ভয় প্রদর্শনকারী হতে পারেন"।

পবিত্র কোরআনের মহিমা

এ সূরার প্রারম্ভে পবিত্র কোরআনের মহিমা বর্ণিত হয়েছে। এর দ্বারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের প্রমাণ উপস্থাপন করা হয়েছে। এ পর্যায়ে ইতিপূর্বে যারা নবী রসূলগণকে অমান্য করেছে তাদের শোচনীয় পরিণামের বিবরণ দেয়া হয়েছে। এ আয়াত থেকে পুনরায় পবিত্র কোরআনের সত্যতা এবং মহিমা বর্ণিত হচ্ছে। এরশাদ হয়েছে–

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ.

এই কিতাব পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাক নাযিল করেছেন। এ মহান গ্রন্থ (হে রসূল!) আপনার রেসালতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। অতএব, আপনি পবিত্র কোরআনের তবলিগ করতে থাকুন এবং মানুষকে পবিত্র কোরআনের শিক্ষা গ্রহণের আহ্বান জানাতে থাকুন এবং আল্লাহ পাকের প্রতি ভরষা রাখুন এবং কাফেরদের বিরোধিতার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না। অদূর ভবিষ্যতে তারা নিজেদের কৃতকর্মের ভয়াবহ পরিণতি ভোগ করবে। যিনি নিখিল বিশ্বের স্রষ্টা ও পালনকর্তা, তাঁরই মহান বাণী হলো পবিত্র কোরআন যা ফেরেশতাদের দলপতি জীব্রাঈল (আঃ) নিয়ে এসেছেন এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে তা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

আলোচ্য আয়াতে "রুহুল আমীন" বলা হয়েছে জীব্রাঈল (আঃ)-কে, যিনি আল্লাহ পাকের এ আমানতকে প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পবিত্র বরকতময় অন্তরে সঠিকভাবে পৌঁছে দিয়েছেন, জীব্রাঈল (আঃ)-কে বিশ্বস্ত বা আমানতদার এজন্যে বলা হয়েছে যে, তিনি আল্লাহ পাকের নিকট থেকে যা শ্রবণ করেছেন তা হুবহু হযরত

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৪৯
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৬৪

রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। সমগ্র বিশ্বের মধ্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরকেই আল্লাহ পাক তাঁর মহান বাণী অবতরণের জন্যে একমাত্র যোগ্য পাত্র হিসেবে বিবেচনা করেছেন। কেননা, তিনিই সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব, তিনিই নবী রসূলগণের দলপতি, তাই সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানী গ্রন্থ পবিত্র কোরআনকে অবতরণের জন্যে তাঁর মোবারক অন্তরকেই মনোনীত করা হয়েছে।[১]

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, অন্যান্য আসমানী কিতাব সমূহ গ্রন্থাকারে বা সহীফা হিসেবে নবী রসূলগণের নিকট নাযিল হয়। পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে আরবী ভাষায় নাযিল হয়। কোরআনে করীম আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম, তাঁর মহান বাণী, জীব্রাঈল (আঃ) আল্লাহ পাকের মহান দরবার থেকে যা কিছু শ্রবণ করেছেন তা-ই প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে পৌঁছে দিয়েছেন। বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম এবং সর্বাধিক অলংকার সমৃদ্ধ ভাষা হলো আরবী, আর এ আরবী ভাষাতেই আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন নাযিল করেছেন। আর এ আরবী ভাষাই ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মাতৃভাষা এবং জান্নাতবাসীদের ভাষাও হবে আরবী।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, পবিত্র কোরআনের শুধু মর্মই নয়; বরং এর প্রতিটি বাক্য এবং প্রতিটি শব্দও স্বয়ং আল্লাহ পাকের নিজস্ব, আর এজন্যেই বিগত চৌদ্দশ' বছর ধরে পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ সংরক্ষিত। এর আয়াত বা বাক্য তো দূরের কথা এমনকি, এর কোন যের যবরেরও এ পর্যন্ত কোন পরিবর্তন হয়নি। পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ মানুষ পবিত্র কোরআন কণ্ঠস্ত করে রেখেছেন, তাঁরা দিনরাত পবিত্র কোরআন পাঠে রত রয়েছেন। কেরাত বিশেষজ্ঞগণ তাঁদের মধুর কণ্ঠে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াতে মশগুল রয়েছেন, এমনিভাবে যারা পবিত্র কোরআনের তরজমা বা তফসীর করছেন, তারাও যত্ন সহকারে এ মহান দায়িত্ব পালন করছেন। এ পর্যন্ত পৃথিবীর চারশ' ভাষায় পবিত্র কোরআনের অনুবাদ হয়েছে। পৃথিবীর কোন মানুষ পবিত্র কোরআনের অনুরূপ ভাষায় কোন কিছু রচনা করতে পারেনা, এটি পবিত্র কোরআনের বর্ণনা-শৈলীর অন্যতম বৈশিষ্ট্য, কেননা এটি আল্লাহ পাকের মহান বাণী, কোন সৃষ্টির পক্ষে এর মোকাবেলা করা সম্ভবই নয়, আর এ কারণেই মানব জাতির ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছে পবিত্র কোরআনের মহান শিক্ষার মাধ্যমে। এ বিপ্লবের মহান নায়ক হলেন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম, আর এ বিপ্লবের সংবিধান হলো পবিত্র কোরআন।

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বিভিন্নভাবে পবিত্র কোরআন নাযিল হতো যেমন ঘন্টা ধ্বনি, এ অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মানব প্রকৃতি থেকে মুক্ত হয়ে ফেরেশতা প্রকৃতির নিকটতর হতে হতো। অর্থাৎ দৈহিক এবং পদার্থগত প্রকৃতি বিসর্জন দেয়া হতো এবং সামগ্রিকভাবে তাঁর অন্তরাত্মাকে ব্যবহার করতে হতো, তিনি তখন অন্তরের চক্ষে ফেরেশতাকে দেখতে পেতেন (চর্ম চক্ষে নয়) এবং মনের কর্ণেই ওহী শ্রবণ করতেন, আর অন্তরের শক্তিতেই পবিত্র কোরআন আয়ত্ত করতেন। আর ঐ অবস্থায়ই এক প্রকার শব্দ শ্রুত হতো যাকে ঘন্টাধ্বনি বলা হয়।

আর কখনো ফেরেশতা মানুষের বেশেই হাযির হতেন এবং আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম শুনিয়ে যেতেন। সাধারণত জীব্রাঈল (আঃ) বিখ্যাত সাহাবী হযরত দাহিয়াতুল কালবী (রাঃ)-

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৪

এর আকৃতি ধারণ করতেন। আর এ অবস্থায় ফেরেশতা তার মৌল প্রকৃতি দূরে সরিয়ে মানব প্রকৃতির নিকটতর হতেন। আর এ অবস্থায় প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম জীব্রাঈল (আৎ)-কে চর্ম-চক্ষেই দেখতে পেতেন। আর দৈহিক কর্ণেই পবিত্র কোরআন শ্রবণ করতেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পূর্বোল্লোখিত অবস্থায় ওহী আয়ত্ত করা সবচেয়ে কঠিন হতো, দ্বিতীয় অবস্থায় অপেক্ষাকৃত সহজ হতো।[১]

পবিত্র কোরআনের এত বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ এর সত্যতাকে অস্বীকার করে তবে (হে রসূল!) আপনি বলুন–

وَاِنَّهٗ لَفِیْ زُبُرِ الْاَوَّلِیْنَ

আর নিশ্চয় পূর্ববর্তীদের কিতাবে একথা লিপিবদ্ধ রয়েছে তথা এ মহান গ্রন্থ পবিত্র কোরআন সর্বশেষে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি নাযিল হবে। পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার বহু পূর্ব থেকেই পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে এর ঘোষণা স্থান পেয়েছে। আর তা একথার সুস্পষ্ট প্রমাণ যে, পবিত্র কোরআন আল্লাহর তরফ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে।

অধিকাংশ তফসীরকারগণ আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন যে, পূর্ববর্তী আসমানী কিতাব সমূহে পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়ার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেনঃ এর অর্থ হল, পূর্ববর্তী কিতাব সমূহে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আলোচনা রয়েছে। আর এখানে এ-ও উল্লেখ্য, পূর্ববর্তী আসমানী গ্রন্থ সমূহে পরবর্তীতে যত রদবদলই হোক না কেন, কিন্তু তাতে পবিত্র কোরআনের বর্ণনা অবশ্যই রয়েছে।

اَوَلَمْ یَکُنْ لَّهُمْ اٰیَةً اَنْ یَّعْلَمَهٗ عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ

"বনী ইসরাঈলের তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ যে পবিত্র কোরআনের খবর রাখতেন এটি কি তাদের পক্ষে যথেষ্ট নিদর্শন নয়"?

অর্থাৎ বনী ইসরাঈলের তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ যদিও হিংসা-বিদ্বেষের কারণে পবিত্র কোরআনের প্রতি ঈমান আনতো না, কিন্তু তাদের ঘরোয়া বৈঠকে এবং জনসাধারণের সম্মুখেও পবিত্র কোরআনের সত্যতা স্বীকার করতো। এমনকি তাদের বিখ্যাত আলেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে সালাম (রাঃ) শুধু এ কারণেই ইসলাম কবুল করেছেন। আর যারা ইসলাম কবুল করেনি, তারাও পবিত্র কোরআনের সত্যতা স্বীকার করতো। ইহুদী আলেমদের এ আন্তরিক স্বীকৃতি সত্য-সন্ধানী, বাস্তববাদী মানুষের ঈমান আনয়নের জন্যে যথেষ্ট।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, তফসীরকার আতীয়্যা বলেছেন, আলোচ্য আয়াত عُلَمٰٓؤُا بَنِیْٓ اِسْرَآءِیْلَ দ্বারা যাঁদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে তাঁরা হলেন, আবদুল্লাহ এবনে সালাম, এবনে ইয়ামীন, তায়লাবা, আসাদ, উসায়েদ।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, মক্কাবাসী কাফেররা মদীনা শরীফের ইহুদীদেরকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সম্পর্কে

---

[১]। পবিত্র কোরআন কিভাবে নাজিল হতো তা বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন, তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৯০-৯১

জিজ্ঞাসা করে। ইহুদীরা বলে সর্বশেষ নবীর আগমনের এটিই সময়, আমরা তওরাতে তা পাঠ করি।

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ عَلٰى بَعْضِ الْاَعْجَمِيْنَ ○ فَقَرَاَهٗ عَلَيْهِمْ مَّا كَانُوْا بِهٖ مُؤْمِنِيْنَ.

"যদি আমি ভিন্ন ভাষাভাষী কারো উপর এ পবিত্র গ্রন্থ নাযিল করতাম, এরপর সে তা তাদের নিকট পাঠ করতো, তবুও তারা তার উপর বিশ্বাস করতো না"।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, বনী ইসরাঈলের তত্ত্বজ্ঞানী আলেমগণ পবিত্র কোরআনের এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা ঘোষণা করেছে একথা-ই কি তাদের জন্যে নিদর্শন হিসেবে যথেষ্ট নয়? আর যেহেতু প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরবী ভাষাভাষী ছিলেন, আর আরবী ভাষায় তাঁর দক্ষতা ছিল, কাফেররা বলত পবিত্র কোরআন তাঁরই রচনা, তাই আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ (হে রসূল!) আপনি আরবী ভাষাভাষী হবার কারণেই যে মুশরেকরা পবিত্র কোরআনকে আপনার রচনা বলছে, আল্লাহ পাকের কালাম বলে অস্বীকার করছে এমন নয়; বরং সত্যদ্রোহিতা তাদের মজ্জাগত, সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই তারা হারিয়ে ফেলেছে।

وَلَوْ نَزَّلْنٰهُ

যদি এমন কোন অনারব ব্যক্তির উপর আমি কোরআন নাযিল করতাম, যে আরবী ভাষার একটি শব্দও জানেনা, তবুও এ কাফেররা তা অস্বীকার করত। অথচ তখন একথা বলা যেত না যে, এ ব্যক্তিই কোরআন রচনা করেছে। যেহেতু তাদের দুষ্ট প্রকৃতি তাদেরকে সত্য-বিরোধিতায় অনুপ্রাণিত করে, তাই তারা সত্যদ্রোহিতায় বিভিন্ন বাহানা খুঁজে বেড়ায়। বাস্তব অবস্থা হলো এই, সমগ্র বিশ্বের সকল মানব-দানব একত্রিত হয়ে তাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে যদি কোরআনের অনুরূপ গ্রন্থ রচনা করতে চায়, তবে পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতের অংশও রচনা করতে সক্ষম হবেনা। কেননা, মানুষের সৃজনশীলতা, বুদ্ধি-বিবেচনা এবং জ্ঞান ও মনীষার অনেক উর্দ্ধে পবিত্র কোরআনের মান। অতএব এটি ধ্রুব সত্য যে, পবিত্র কোরআন সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের কালাম, কোন সৃষ্টির এতে কোন অংশ মাত্রও নেই।

আলোচ্য আয়াতের اعجمين শব্দটি اعجم এর বহুবচন। اعجم বলা হয় সে ব্যক্তিকে যে বিশুদ্ধ আরবী ভাষায় কথা বলতে পারেনা, এজন্যে কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যা করেছেন, "যদি আমি এই কোরআনকে কোন অনারব ব্যক্তির প্রতি অনারবী ভাষায় নাযিল করতাম আর সে তার নিজের ভাষায় এ গ্রন্থকে পাঠ করত, তবুও তারা ঈমান আনতো না। তখন তারা বলত, আমরা এ ভাষা বুঝিনা। যেমন, অন্য আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَوْ جَعَلْنٰهُ قُرْاٰنًا اَعْجَمِيًّا لَّقَالُوْا لَوْلَا فُصِّلَتْ اٰيٰتُهٗ

যদি আমি এই কোরআনকে অনারবী ভাষায় নাযিল করতাম তবে তারা বলত, যদি এ আয়াত সমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হতো, তবে ভাল হতো। অর্থাৎ তারা কোনভাবেই ঈমান আনবেনা। এতে রয়েছে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি সান্ত্বনা, কেননা তিনি কাফেরদের হেদায়েতের জন্যে অত্যন্ত ব্যাকুল থাকতেন। আর কাফেররা যে তাঁর ব্যাপারে

ভিত্তিহীন কথাবার্তা বলত, তাতেও তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হতেন। তাই আল্লাহ পাক তাঁকে সান্ত্বনা দিয়েছেন।

كَذٰلِكَ سَلَكْنٰهُ فِيْ قُلُوْبِ الْمُجْرِمِيْنَ

"এভাবেই আমি পাপীষ্ঠদের অন্তরে এ অস্বীকৃতিকে প্রবিষ্ট করিয়ে দিয়েছি"। আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন হাসান বসরী (রঃ) এবং মুজাহেদ (রঃ)। মূলতঃ যারা সর্বদা অপরাধে লিপ্ত থাকে, অন্যায়-অনাচারে অভ্যস্ত হয়ে যায় তারা সত্য গ্রহণের যোগ্যতাই হারিয়ে ফেলে, তাই সত্যকে অস্বীকার করাই তাদের স্বভাবগত হয়ে যায়।

কোন কোন তফসীরকার سَلَكْنٰهُ শব্দের সর্বনামটি দ্বারা পবিত্র কোরআনকে উদ্দেশ্য করেছেন। এমন অবস্থায় আয়াতের অর্থ হবে, আমি কোরআনকে পাপীষ্ঠদের অন্তরে প্রবিষ্ট করে দিয়েছি, তারা পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ খুব ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করেছে, কিন্তু শুধু হিংসা-বিদ্বেষের কারণে ঈমান আনেনা।[১]

لَا يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ حَتّٰى يَرَوُا الْعَذَابَ الْاَلِيْمَ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন আল্লাহ পাকের মহান বাণী, কোন মানুষের পক্ষে এমন বাণী রচনা করা সম্ভবই নয়। একথা জানা সত্ত্বেও এ কাফেররা তাঁর প্রতি ঈমান আনবেনা, তবে ঈমান এমন সময় আনবে যখন তারা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেখতে পাবে, কিন্তু তখনকার ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হবেনা, তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

فَيَاْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

"তাদের উপর অতর্কিত ভাবেই আযাব আসবে, এমন অবস্থায় যে তারা তা টেরও পাবে না"।

অর্থাৎ এ কাফেরদের উপর যখন অতর্কিতভাবে আযাব আসবে, তথা যে আযাবের কোন পূর্বাভাস তারা পাবেনা, এমনিভাবে যখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে আযাব তাদের উপর আপতিত হবে তখন তারা ঈমান আনবে, ফলে তাদের বন্ধ চক্ষু খুলে যাবে। কিন্তু ঐ ঈমান তাদের জন্যে উপকারী হবেনা। আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে আযাবের কথা বলা হয়েছে তা মৃত্যুর পর কবরে হবে। তখন তারা আক্ষেপ করে বলবে, যদি একটু অবকাশ পেতাম, তবে আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান আনতাম এবং জীবনের আমলও ঠিক করে নিতাম। কিন্তু এ অবকাশ আর কখনও পাওয়া যাবে না।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৬
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮ পৃষ্ঠা-৫৫১-৫২
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১০৩-০৪

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ ﴿٢٠٣﴾
أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٢٠٤﴾ أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٢٠٥﴾ ثُمَّ
جَآءَهُم مَّا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٢٠٦﴾ مَآ أَغْنَىٰ عَنْهُم مَّا كَانُوا يُمَتَّعُونَ ﴿٢٠٧﴾
وَمَآ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ﴿٢٠٨﴾ ذِكْرَىٰ وَمَا كُنَّا
ظَٰلِمِينَ ﴿٢٠٩﴾ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿٢١٠﴾ وَمَا يَنۢبَغِي لَهُمْ وَمَا
يَسْتَطِيعُونَ ﴿٢١١﴾ إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُولُونَ ﴿٢١٢﴾ فَلَا تَدْعُ مَعَ
اللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ ﴿٢١٣﴾ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
الْأَقْرَبِينَ ﴿٢١٤﴾ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢١٥﴾

তরজমা

(২০৩) তখন তারা বলবে, আমাদেরকে কি অবকাশ দেয়া হবে?

(২০৪) তবে কি তারা আমার শাস্তি ত্বরান্বিত করতে চায়?

(২০৫) তুমি লক্ষ্য করে দেখতো, আমি যদি তাদেরকে দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই,

(১০৬) এরপর তাদের নিকট সে আযাব উপস্থিত হয় যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল,

(১০৭) তখন তাদের ভোগ-বিলাসের উপকরণ সমূহ তাদের কোন কাজে আসবে কি?

(২০৮) সতর্ককারী প্রেরণ না করে আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি।

(২০৯) এটি উপদেশস্বরূপ, অবিচার করা আমার কাজ নয়।

(২১০) শয়তানরা এই কোরআন নিয়ে অবতরণ করেনি।

(২১১) তারা তা করতে পারেনা এবং পারেওনি।

(২১২) নিশ্চয় তাদেরকে শ্রবণের সুযোগ থেকে দূরে রাখা হয়েছে।

(২১৩) অতএব, (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের সঙ্গে অন্য কোন কিছুকে মা'বুদ হিসেবে ডাকবেন না, নতুবা আপনিও শাস্তি প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

(২১৪) (হে রসূল!) আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন।

(২১৫) আর যে সব মোমেন আপনার অনুসরণ করে, তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করুন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে এরশাদ হয়েছেঃ যে পর্যন্ত কাফেররা কঠিন আযাব না দেখবে সে পর্যন্ত তারা ঈমান আনবেনা, আর তাদের প্রতি আযাব আসবে অতর্কিতভাবে। এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে, যখন তাদের উপর হঠাৎ আযাব আপতিত হবে তখন তারা অত্যন্ত আক্ষেপ প্রকাশ করে বলবে, হায়! যদি আমাদেরকে একটু অবকাশ দেয়া হতো, অথচ সেই সময়টি অবকাশ দেয়ারও হবেনা এবং ঈমান আনা হলে তা-ও কবুল হবেনা। তারা তখন আক্ষেপ করে একথাও বলবে যে, যদি আমাদেরকে দুনিয়াতে ফিরে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়, তবে আমরা আল্লাহ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস স্থাপন করব এবং সৎ কাজ করব। কিন্তু তাদের এ আকাঙ্ক্ষা কখনো বাস্তবায়িত হবেনা, যখন তাদের প্রতি আযাব আপতিত হবে, তখন তাদেরকে অবকাশ দেয়া হবেনা। আর তখন ঈমান আনলে তা গ্রহণযোগ্য হবেনা। এ পর্যায়ে আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) ফেরাউনের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করেছেন। হযরত মূসা (আঃ) জালেম ফেরাউনের বিরুদ্ধে বদ দোয়া করেছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের আযাব নাযিল হয়, ফেরাউন ও তার দলবলকে লোহিত সাগরে নিমজ্জিত করা হয়। ঐ বিপদ-মুহূর্তে ফেরাউন বলেছিল, আমি এখন মূসা ও হারুন (আঃ)-এর প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনি, কিন্তু তখন আল্লাহ পাকের তরফ থেকে ঘোষণা করা হয়, এখন ঈমান গ্রহণযোগ্য নয়।[১]

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ

"তবে কি তারা আমার আযাবকে ত্বরান্বিত করতে চায়"?

এ আয়াতের শানে নুযুল সম্পর্কে তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক যখন তাঁর রসূলের মাধ্যমে কাফেরদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্শন করেছেন তখন তারা বলেছে, কতকাল আর আযাবের ভয় দেখাবে? এ আযাব আসবে কবে? তখন এ আয়াত নাযিল হয়। আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করেছেন, তারা কি আমার আযাব ত্বরান্বিত করতে চায়? অথচ যখন আযাব পৌঁছে যাবে, তখন তারা অবকাশের জন্যে মিনতি করতে থাকবে। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, এ আয়াত কাফেরদের সেসব কথার প্রতি-উত্তরে নাযিল হয়েছে, যখন তারা বলেছিলো, فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوِ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ অর্থাৎ আমাদের প্রতি আসমান থেকে পাথর বর্ষণ কর, অথবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আনয়ন কর। কাফেরদের এ কথার জবাবেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

মূলতঃ কাফেররা একথা বিশ্বাসও করতো না যে, তাদের প্রতি আযাব আসবে, বরং তারা এ ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করত যে, তারা এভাবেই আনন্দ-উল্লাসে জীবন-যাপন করতে থাকবে।

তারা আখেরাতের প্রতিও বিশ্বাস করতো না, তাই সর্বদা গাফলতের আবর্তে নিপতিত থাকত, আর তাদেরকে আযাবের ভয় প্রদর্মন করলে তারা জিজ্ঞাসা করত, এ আযাব কবে আসবে?[২]

أَفَرَءَيْتَ إِن مَّتَّعْنَٰهُمْ سِنِينَ

---

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৪৯
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫২-৫৩

তুমি লক্ষ্য করে দেখতো, যদি আমি তাদেরকে বছরের পর বছর তথা দীর্ঘকাল ভোগ-বিলাস করতে দেই, এরপর তাদের নিকট সে আযাব উপস্থিত হয় যে সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল, তখন ভোগ-বিলাসের উপকরণ সমূহ তাদের কোন উপকারে আসবে কি? তারা কি ভোগ-বিলাসের উপকরণ দ্বারা আসমানী গজব থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে?

আয়াতের মর্মকথা

পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে, যখন কাফেরদের উপর অতর্কিতে আযাব আসবে তখন তারা অবকাশ লাভের জন্যে মিনতি জানাতে থাকবে, কিন্তু তাদেরকে তখন কোন অবকাশ দেয়া হবেনা। আর এ আয়াতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, যদি আল্লাহ পাক দয়া করে তাদেরকে বছরের পর বছর অবকাশ দিয়েও দেন, তবে কি তারা তাদের সুখ-সামগ্রী দ্বারা আযাবে এলাহী থেকে আত্মরক্ষা করতে পারবে? অথবা প্রচন্ড আযাবকে কিছুটা লাঘব করতে পারবে? এর কোনটিই সম্ভব হবেনা; বরং ঐ আযাব এতো বিপজ্জনক হবে যার কারণে মানুষ সারা জীবনের আনন্দ-উল্লাসের কথা ভুলে যাবে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কাফেরদেরকে কেয়ামতের দিন হাযির করা হবে এবং দোযখে নিক্ষেপ করে তুলে আনা হবে এবং জিজ্ঞাসা করা হবে, তুমি কখনও কি আরাম-আয়েশ দেখেছিলে? সে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো আরাম-আয়েশ দেখিনি। এরপর এমন এক ব্যক্তিকে হাযির করা হবে যে সারা জীবন আরাম-আয়েশ দেখেনি, তাকে জান্নাতের বাতাস পৌঁছানো হবে এবং প্রশ্ন করা হবে, তুমি কি কখনো জীবনে কষ্ট দেখেছ? সে বলবে, আল্লাহর শপথ! আমি কখনো কোন কষ্ট দেখিনি। এজন্যে হযরত ওমর (রাঃ) বলতেন, যখন তুমি তোমার মঞ্জিলে মকসুদে পৌঁছে যাবে তখন এমন মনে হবে যে, কখনো কোন কষ্টের কথা তুমি শ্রবণও কর নাই।[১]

وَمَآ اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا لَهَا مُنْذِرُوْنَ

"সতর্ককারী প্রেরণ না করে আমি কোন জনপদই ধ্বংস করিনি"।

আল্লাহ পাকের ন্যায় বিচার

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদের শাস্তির কথা ঘোষণা করা হয়েছে, আর এ আয়াতে আল্লাহ পাকের ন্যায় বিচারের কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আল্লাহ পাক কারো প্রতি কখনো জুলুম করেন না, এজন্যে প্রত্যেক জনপদের অধিবাসীদের জন্যে তিনি সতর্ককারী নবী রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। তাঁরা তাদের হেদায়েতের সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু তারা নবী রসূলগণকে শুধু অবিশ্বাসই করেনি; বরং তাঁদের প্রতি অকথ্য জুলুম-অত্যাচার করেছে, নবী রসূলগণ সবর অবলম্বন করেছেন এতেও কাফেররা ক্ষান্ত হয়নি; বরং তারা বলেছে, যে আযাবের ব্যাপারে আমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করা হয় তা আসবে কবে? অবশেষে আম্বিয়ায়ে কেরাম আল্লাহ পাকের দরবারে আরযী পেশ করেছেন, আল্লাহ পাক তাঁদের আরযী কবুল করেছেন এবং কাফেরদের ব্যাপারে আযাবের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে এবং আল্লাহ পাক যখন পছন্দ করেছেন তখন অবাধ্য জালেম কাফেরদের উপর আযাব নাযিল করেছেন। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে, পৃথিবীর যে সব জাতির প্রতি আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হয়েছে, তাদের একটিও এমন

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৫০

নয় যে, যথাসময়ে তাদের কুকীর্তির ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে তাদেরকে অবগত করা হয়নি এবং অতর্কিতে আযাব এসেছে; বরং প্রত্যেকটি জাতিকে যথাসময়ে তাদের অন্যায়-আচরণের শাস্তি সম্পর্কে সাবধান করা হয়েছে। হযরত মূসা (আঃ) ফেরাউন ও তার দলবলকে সাবধান করার পর তাদের ব্যাপারে আল্লাহ পাকের দরবারে বদ দোয়া করেছেন। এ বদদোয়া কবুল হবারও চল্লিশ বছর পর ফেরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গদের উপর আযাব এসেছে। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

ذِكْرٰى ۛ وَمَا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ

"এটি উপদেশ স্বরূপ, অবিচার করা আমার কাজ নয়"।

অর্থাৎ কোন জাতিকে যখন ধ্বংস করা হয়, তাদের দ্বারা অন্যদেরকে উপদেশ গ্রহণের সুযোগ দেয়া হয় যেন অন্যরা তাদের মত নাফরমানীতে লিপ্ত না হয় এবং আযাবের ঘটনা অন্যদের জন্যে শিক্ষণীয় তথা উপদেশ স্বরূপ। আল্লাহ পাক কখনো জুলুম করেন না, তিনি পরম করুণাময়, তাঁর দয়ামায়া অনন্ত অসীম, যারা অপরাধী নয়, যারা বিদ্রোহী নয়, তাদেরকে কখনও তিনি শাস্তি দেন না।[১]

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ

"শয়তানরা এই কোরআন নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি"।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতার প্রমাণ স্বরূপ ঘোষণা করা হয়েছে, এই কোরআন বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের তরফ থেকে বিশ্বনবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অন্তরে নাযিল করা হয়েছে।

শানে নুযুল

পবিত্র কোরআনের ভাষার অলংকার দেখে কাফেররা বিস্মিত হতো, কেননা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কখনো কারো নিকট কোন কিছু শিক্ষা গ্রহণ করেননি, অথচ তাঁর জবান মোবারক থেকে এক অদ্বিতীয় কালাম বের হয়ে আসছে, তাই কোন কোন কাফের বলতে লাগল যে, হয়তো কোন জ্বীন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে কোরআনে করীম শিখিয়ে যায়। ঘটনাক্রমে কিছুদিন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ওহীর আগমন বন্ধ ছিল, তখন এক কাফের মহিলা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিল, "আপনার শয়তানটি কি আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে"? কাফেরদের এ ভ্রান্ত ধারণা নিরসন-কল্পেই আলোচ্য আয়াত নাযিল হয়েছে।

وَمَا تَنَزَّلَتْ

অর্থাৎ পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের মহান বাণী, এটি কোন জ্বীন বা শয়তানের কথা নয় কেননা, শয়তান বা জ্বীনেরা সর্বদা মন্দ কাজের কথা বলে, অথচ পবিত্র কোরআন হল হেদায়েতের মূল উৎস। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বাক্য হেদায়েতের আলোকবর্তিকা। পবিত্র কোরআনের শিক্ষার কারণেই সাহাবায়ে কেরাম সমগ্র বিশ্ববাসীর

[১]। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৭১

সামনে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক গুণাবলীর এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। বিশ্ববাসী তাঁদের দৃষ্টান্ত আর কখনও দেখেনি। পক্ষান্তরে, শয়তান হল পথভ্রষ্টতার মূল উৎস। সে মানুষকে মন্দ কাজের প্ররোচনা দেয়, সৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে সচেষ্ট থাকে, অতএব পবিত্র কোরআন সম্পর্কে কাফেরদের এসব কথা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন, অবাস্তব, অকল্পনীয়।

দ্বিতীয়তঃ শয়তানের পক্ষে পবিত্র কোরআন শ্রবণ করাও সম্ভব নয়। পবিত্র কোরআন অবতরণ কালে জ্বীন শয়তানদেরকে দূরে সরিয়ে দেয়া হয়। হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ পবিত্র কোরআন অবতরণ শুরু হওয়ার পূর্বে জ্বীন শয়তানেরা আসমানে যাওয়ার সুযোগ পেত। সেখান থেকে কোন কথা শ্রবণ করে গণকদেরকে বলতো। আর গণকরা ঐ একটি কথার সঙ্গে একশটি মিথ্যা কথা মিশিয়ে মানুষকে বলতো কিন্তু যখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আবির্ভাব হয়, পবিত্র কোরআন নাযিল হওয়া শুরু হয়, তখন আসমানে প্রহরার ব্যবস্থা করা হয় এবং জ্বীন শয়তানদের আসমানে গমন চিরতরে বন্ধ করে দেয়া হয়। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

وَمَا يَنْبَغِيْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ○ اِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُوْلُوْنَ.

"আর তারা কোরআন নিয়ে অবতরণ করেনি, আর তাতে তারা সক্ষমও হয়নি। নিশ্চয় শয়তানদেরকে আসমানী কথা শ্রবণের সুযোগ থেকে সম্পূর্ণ দূরে রাখা হয়েছে"।

অতএব, পবিত্র কোরআন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাকের কালাম, তাঁর মহান বাণী, পবিত্র কোরআনের অনুশীলন এবং অনুসরণ মানুষ মাত্রেরই একান্ত কর্তব্য।[১]

পবিত্র কোরআনের শিক্ষা

পবিত্র কোরআনের মৌলিক শিক্ষা হল তৌহিদ। তাই তৌহিদের উপর সুদৃঢ় এবং সুপ্রতিষ্ঠিত থাকার তাগিদ করে এরশাদ হয়েছেঃ

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَكُوْنَ مِنَ الْمُعَذَّبِيْنَ

"অতএব (হে রসূল!) আপনি আল্লাহ পাকের সাথে অন্য কোন মা'বুদকে ডাকবেন না, নতুবা আপনিও শাস্তি প্রাপ্ত লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবেন"

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, যদিও এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে শেরক না করার এবং তৌহিদের প্রতি সুদৃঢ় থাকার তাগিদ রয়েছে, কিন্তু মূলতঃ এর দ্বারা পৃথিবী সমস্ত মানুষকে ভয় প্রদর্শন করা হয়েছে। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে একথা বলার তাৎপর্য হল, আল্লাহ পাক যেন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে বলেছেন, (হে রসূল!) সমগ্র মানব জাতির মধ্যে আপনি আমার সর্বাধিক প্রিয়, আমার দরবারে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ মর্যাদার অধিকারী, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আপনি যদি শেরক করেন তবে আমি আপনাকেও শাস্তি দেব।[২]

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৭-৪৮
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৭১

[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫৪

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

"(হে রসূল!) আপনার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করুন"।

পূর্ববর্তী আয়াতে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানানো হয়েছে, শেরক থেকে বিরত থাকার তাগিদ করা হয়েছে এবং শেরকের ভয়াবহ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করা হয়েছে। আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে এ মর্মে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনার নিকটাত্মীয়-স্বজনদের সতর্ক করুন। সমাজের অন্য লোকদের পূর্বে আপনার নিকটাত্মীয়-স্বজনকে তৌহিদে বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান এবং পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে সাবধান করুন। অন্যদের তুলনায় নিকটাত্মীয়-স্বজনের দাবী নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। দ্বিতীয়তঃ ঘর ঠিক থাকলে মানুষ বাইরে কাজ করতে পারে। তাই যে যত বেশী নিকটাত্মীয় তার হেদায়েতের ব্যাপারেই সর্বপ্রথম চেষ্টা করা উচিত। তৃতীয়তঃ কোন মানুষ যখন অন্য মানুষকে আহ্বান জানায় তখন তার সততা, সত্যবাদীতা, আমানতদারী এবং সাধুতার বিচার করা হয় তার আত্মীয়-স্বজনের আচরণের মাধ্যমে। এজন্যে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আদেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর আত্মীয়-স্বজনকে আখেরাত সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করেন। আর এজন্যেও এ নির্দেশ দেয়া হয়েছে যেন সকলে এ সত্য উপলব্ধি করে যে, আল্লাহ পাকের আযাব থেকে কেউ রক্ষা পাবেনা। অতএব, প্রত্যেকের কর্তব্য হল, আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান বা বিশ্বাস স্থাপন করা, আল্লাহ পাকের পবিত্র কালাম কোরআনে করীমের মহান শিক্ষা গ্রহণ করা এবং প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ করা। এটিই হল নাজাতের পথ, এটিই দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানে সার্বিক সাফল্য লাভের পন্থা।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, মোহাম্মদ এবনে এসহাক হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আলী (রাঃ) বলেছেন, যখন এ আয়াত নাযিল হয় তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আমাকে তলব করেন, আমি হাযির হলে তিনি এরশাদ করেন, হে আলী! আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন, আমি যেন নিকটাত্মীয়-স্বজনকে আল্লাহর আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করি। এ আদেশ পাওয়ার পর আমি চিন্তা করছি যে কি করবো। যদি আমাদের আত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করি তবে তারা এমন আচরণ করবে, যা আমার অপছন্দনীয় হবে এজন্যে আমি নীরব ছিলাম। কিন্তু এই মাত্র জীব্রাঈল (আঃ) এসে আমাকে বললেন, হে মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম)! যদি আপনি আপনার নিকটাত্মীয়-স্বজনদেরকে আল্লাহ পাকের আযাব সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন না করেন, তবে আপনার প্রতি আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হবে। অতএব তুমি এক ছা' (প্রায় সোয়া তিন কেজি) আটার রুটি তৈরী করাও[১], বকরীর একটি রানের গোশ্ত রান্না করে আন এবং একটি পাত্র পূর্ণ করে দুধ আন। এরপর আবদুল মোত্তালেবের সন্তান-সন্ততিদেরকে একত্রিত কর, তাহলে আমাকে যে বিষয়ের আদেশ দেয়া হয়েছে তাদেরকে তা আমি পৌঁছে দেব।

হযরত আলী (রাঃ) বর্ণনা করেন আমি আদেশ পালন করি, সকলকে দাওয়াত করি, তারা সকলেই সমবেত হয়। তাদের মধ্যে হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের

[১]। ছা' আরব দেশে প্রচলিত ওজনের পরিভাষা। হযরত ইমাম আবু হানিফা (রঃ)-এর মতে ২৭০ তোলায় এক ছা' হয়, এর ভিত্তিতে আমাদের পরিমাপ মোতাবেক এক ছা' প্রায় সোয়া ৩ কেজি হয়।

পিতৃব্য আবু তালেব, হামজা, আব্বাস, আবু লাহাব ছিলেন, ঐ মজলিশে প্রায় ৪০ জন লোক উপস্থিত ছিলেন। যখন সবাই একত্রিত হলেন তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাবার পরিবেশনের আদেশ দিলেন। আমি যা তৈরী করেছিলাম সব মেহমানদের সম্মুখে রেখে দিলাম। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম গোশ্‌তের একটি টুকরা মুখে নিয়ে দাঁত দিয়ে কেটে তা পুনরায় পাত্রে রেখে দিলেন এবং বললেন, বিসমিল্লাহ, শুরু করুন। সকলেই উদর পূর্ণ করে আহার করলো, আল্লাহর শপথ! আমি যা খাবার তৈরী করেছিলাম তা একজনই খেতে পারে। কিন্তু ঐ খাবারে এত বরকত হয়েছিল যে, সকলের উদর পূর্ণ হল, সকলে খেয়ে তৃপ্তি লাভ করলো, আর খাবারের কোন প্রয়োজনই রইল না। এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আদেশ দিলেন এদেরকে দুধ পান করাও, আমি তাদের সম্মুখে দুধের পাত্রটি রেখে দিলাম, আল্লাহর শপথ! দুধ এতখানি ছিল যে, একজনই পান করতে পারে। কিন্তু সকলেই ঐ দুধ পান করলো এবং তৃপ্তি লাভ করলো। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাদের সঙ্গে কথা বলার ইচ্ছা করলেন, কিন্তু কথা শুরুর পূর্বেই আবু লাহাব বলল, তোমাদের সাথী তোমাদের প্রতি যাদু করেছে, একথা শ্রবণের সঙ্গে সঙ্গে সব লোক বেরিয়ে গেল, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কোন কথাই বলতে পারলেন না। দ্বিতীয় দিন হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, হে আলী! তুমি জান এ ব্যক্তি আমার বক্তব্য রাখার পূর্বেই কথা বলল এবং লোকেরা চলে গেল, এখন পুনরায় তুমি সেভাবেই খাবার তৈরী করাও যেমন কাল করেছিলে এবং লোকদেরকে একত্রিত কর। আমি আদেশ পালন করলাম, পুনরায় লোকদেরকে একত্রিত করলাম, হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম খাবার পরিবেশনের নির্দেশ প্রদান করলেন, আমি তাই করলাম, আমি সকলের সম্মুখে খাবার রেখে দিলাম, তিনি পূর্বের ন্যায় গোশ্‌তের একটি টুকরো দাঁত দিয়ে দু'ভাগ করে রেখে দিলেন, এরপর সকলেই পানাহার করল। আহার পর্ব শেষ হবার পর হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম উপস্থিত লোকদেরকে সম্বোধন করে বললেন, হে আবদুল মোত্তালেবের সন্তানেরা! আমি তোমাদের নিকট দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের কল্যাণ নিয়ে এসেছি, আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি তোমাদেরকে আহ্বান জানাই, তোমাদের মধ্যে কে আছ যে আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করবে এবং আমার ভাই ও প্রতিনিধি হবে। লোকেরা একথা শুনে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলো। আমি ছিলাম তাদের মধ্যে সর্ব কনিষ্ঠ। আমি বললাম, হে আল্লাহর নবী! আমি এ কাজে আপনার সাহায্যকারী হবো, একথা শ্রবণ করে তিনি আমার কাঁধে স্বীয় দস্তে মোবারক স্থাপন করে এরশাদ করলেন, এ হলো আমার ভাই, আমার প্রতিনিধি, তোমরা তার কথা শ্রবণ কর, লোকেরা হাসতে হাসতে উঠে চলে গেল এবং একথা বলতে লাগল এই ব্যক্তি আমাদেরকে আদেশ দিয়েছে, আমরা যেন আলীর কথা শুনি, আর তাঁর অনুগত হই।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ)-এর সূত্রে হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলিত হয়েছে। যখন

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

আয়াতখানি নাযিল হলো, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সাফা পাহাড়ের উপরে আরোহণ করে বিভিন্ন গোত্রের নাম ধরে ডাকলেন, হে ফাহারের সন্তানেরা! হে বনী আদী! প্রভৃতি। তাঁর কথা শুনে সকলে সমবেত হলো আর যে আসতে পারেনি সে তার প্রতিনিধি

প্রেরণ করল। যারা হাযির হয়েছিল, তাদের মধ্যে আবু লাহাব সহ কোরায়শ গোত্রের অন্যান্য ব্যক্তিরাও ছিল। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, যদি আমি বলি পাহাড়ের অপর দিকে কিছু অশ্বারোহী রয়েছে, তারা তোমাদের উপর আক্রমণ করতে চায়, তবে কি তোমরা আমার একথার প্রতি আস্থা স্থাপন করবে? সকলে বলল জ্বী-হ্যাঁ। আমরা কখনো আপনাকে মিথ্যাবাদী হিসেবে পাইনি, এটি আমাদের অভিজ্ঞতা, তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তাহলে কঠিন আযাব আসার পূর্বে আমি তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করি। সে আযাব অবশ্যই আসবে, তখন আবু লাহব বলল, তোমার ধ্বংস হোক, তুমি কি এজন্যেই আমাদেরকে একত্রিত করেছ? তখন সূরা লাহাব নাযিল হয়।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে যে, যখন আলোচ্য আয়াত وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দাঁড়ালেন এবং এরশাদ করলেন, হে কোরায়শ গোত্র! তোমরা তোমাদের প্রাণগুলো ক্রয় কর অর্থাৎ নিজেদেরকে আসন্ন আযাব থেকে রক্ষা কর। আমি আল্লাহ পাকের আযাবের ব্যাপারে তোমাদের কোন প্রকার সাহায্য করতে পারব না। হে আবদে মনাফের সন্তানেরা! আমি আল্লাহ পাকের আযাবের ব্যাপারে তোমাদের কোন প্রকার সাহায্যকারী হতে পারব না। হে আব্বাস এবনে আবদুল মোত্তালেব! আল্লাহ পাকের আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার ব্যাপারে আমি কোন উপকার করতে পারব না। হে সাফীয়্যা! আমি তোমাকে আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা করতে পারব না। হে মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের কন্যা ফাতেমা! তুমি আমার ধন-সম্পদ যা চাও নিয়ে যাও, কিন্তু আল্লাহ পাকের আযাবের মোকাবেলায় আমি তোমার কোন উপকার করতে পারব না।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আবদুল্লাহ এবনে হামার মোজাশয়ীর সূত্রে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যে এলম তিনি আমাকে দান করেছেন, সে সম্পর্কে তুমি অবগত নও, আমি যেন সে সম্পর্কে তোমাকে অবগত করি। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ আমি যে ধন-সম্পদ বন্দাকে দান করেছি, তা তার জন্যে হালাল হবে। আমি আমার বন্দাকে তৌহিদপন্থী হিসেবে সৃষ্টি করেছি, কিন্তু শয়তান তার নিকট পৌঁছে তাকে পথভ্রষ্ট করেছে। যে জিনিষ আমি তার জন্যে হালাল করেছি, শয়তান সেই জিনিষগুলোকে হারাম করে দিয়েছে। আমি আদেশ দিয়েছি, কোন কিছুকে আমার সাথে শরীক করোনা, আল্লাহ পাক বিশ্ববাসীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, সব কিছুকে ঘৃণা করেছেন, আরব হোক কী অনারব, তবে আহলে কেতাব য়ারা সত্যিকার দ্বীনের উপর কায়েম রয়েছে তারা ব্যতীত। আল্লাহ পাক আমাকে আদেশ দিয়েছেন যেন আমি (আল্লাহ পাকের নাফরমানী এবং তাঁর আযাব সম্পর্কে) কোরায়শকে ভীতি প্রদর্শন করি। আমি আরজ করলাম, হে পরওয়ারদেগার! তারা তো আমাকে শেষ করে দেবে, আল্লাহ পাক এরশাদ করলেন, আমি তোমাকে এজন্যে প্রেরণ করেছি যে তোমাকে পরীক্ষা করি এবং তোমার মাধ্যমে অন্যকেও পরীক্ষা করি, আমি তোমার প্রতি একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাকে পানি ধুয়ে ফেলতে পারেনা। তা তুমি স্বপ্নে জাগরণে পাঠ করতে থাক, তাদের সাথে জেহাদ কর, তুমি সফলকাম হবে। তুমি (আল্লাহর বন্দাদের প্রতি) ব্যয় কর তাহলে (আল্লাহ পাকের তরফ

১। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫৪-৫৬
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৫১-৫৩

থেকে) তোমার প্রতি ব্যয় করা হবে। (কাফেরদের মোকাবেলা করার জন্যে) তুমি একটি সৈন্যবাহিনী তৈরী কর, তাহলে আমি তার চেয়ে পাঁচ গুণ সৈন্য দ্বারা তোমার সাহায্য করব। যারা তোমার অনুসারী তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে অবাধ্য নাফরমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

এরপর এরশাদ করেছেন, জান্নাতবাসী তিন প্রকার (১) ন্যায় বিচারকারী ক্ষমতাবান ব্যক্তি, (২) আত্মীয়-স্বজন এবং মুসলমানদের প্রতি দয়াদ্র এবং বিনম্র স্বভাবের অধিকারী ব্যক্তি (৩) নৈতিক গুণের অধিকারী সম্পদশালী ব্যক্তি, যে নিজেকে পবিত্র রাখতে চায় এবং অন্যদেরকে দান-খয়রাত করে। পাঁচটি দল দোযখী। (এক) দুর্বল নির্বোধ ব্যক্তি যে মন্দকে প্রতিরোধ করার অনুভূতিও রাখেনা এবং শুধু অন্যের পেছনে লেগে থাকে, (দুই) সে ব্যক্তি যে সকালে উঠে তোমার সম্পদ এবং সন্তান-সন্ততির ব্যাপারে প্রতারণা করে, (তিন) সে ব্যক্তি যার লোভ তাকে নিজের সাথে নিয়ে যায় আর সেই লোভ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন। (চার) সে ব্যক্তি যে চরিত্রহীন এবং অশ্লীল কথা এবং মন্দ কাজে লিপ্ত। (পাঁচ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কৃপণতা এবং মিথ্যাবাদিতার কথাও উল্লেখ করেছেন।

এবনে জরীর জোরায়েযের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ নাযিল হয়, তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজন তথা কোরায়শদেরকে তৌহিদের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান জানান। অন্যথায় আল্লাহ পাকের আযাব ভোগ করার ব্যাপারে সাবধান করেন। এমনকি, তাঁর কন্যা ফাতেমা, ফুফু সাফীয়্যাকে পর্যন্ত তিনি সতর্ক করেন এবং দোযখের আগুন থেকে আত্মরক্ষার জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করেন। আর একথাও বলেন, যদি তোমরা আখেরাতের নাজাতের জন্যে সচেষ্ট না হও, তবে আমি আল্লাহ পাকের দরবারে তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারবনা।[১]

وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ

"(হে রসূল!) যে সব মোমেন আপনার অনুসরণ করে তাদের প্রতি বিনম্র ব্যবহার করুন"।

আল্লাহর রহমত লাভের পূর্বশর্ত

পূর্ববর্তী আয়াতে কাফেরদেরকে আল্লাহর আযাবের ব্যাপারে ভয় প্রদর্শনের নির্দেশ ছিল। আর এ আয়াতে মোমেনদের সাথে বিনম্র ব্যবহারের নির্দেশ রয়েছে। যারা ঈমানের সম্পদে সমৃদ্ধশালী হয়েছে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অনুসরণের সৌভাগ্য অর্জন করেছে তাদের সাথে বিনম্র ব্যবহার তথা মধুর ব্যবহারের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, (হে রসূল!) আপনার অনুসরণকারী মোমেনদেরকে আপনি স্নেহের কোলে টেনে নিন। দয়ামায়ার ডোরে আবদ্ধ করুন। এটি বিশ্ব প্রতিপালক, সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের নির্দেশ। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ পাকের রহমত লাভের দু'টি পূর্বশর্ত রয়েছে, (এক) ঈমান (দুই) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ অনুসরণ। যারা এ দু'টি শর্ত পূর্ণ করবে তাদের ভাগ্য সুপ্রসন্ন। পক্ষান্তরে, যারা এ শর্ত পূরণে অবহেলা করবে তাদের বিপর্যয় অনিবার্য।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫৬-৫৭

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ ﴿٢١٦﴾ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ
الرَّحِيمِ ﴿٢١٧﴾ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ ﴿٢١٨﴾ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ ﴿٢١٩﴾
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿٢٢٠﴾ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَن تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ﴿٢٢١﴾
تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ ﴿٢٢٢﴾ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ ﴿٢٢٣﴾
وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴿٢٢٤﴾ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ
يَهِيمُونَ ﴿٢٢٥﴾ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ﴿٢٢٦﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا
وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا
ظُلِمُوا ۗ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ ﴿٢٢٧﴾

তরজমা

(২১৬) আর যদি তারা আপনার কথা না মানে (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাজের জন্যে দায়ী নই।

(২১৭) আর আপনি ভরসা করুন সেই আল্লাহ পাকের প্রতি যিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়াময়।

(২১৮) যিনি আপনাকে দেখেন, যখন আপনি নামাযের জন্যে দন্ডায়মান হন,

(২১৯) যিনি দেখেন সেজদাকারীদের সঙ্গে আপনার ওঠা-বসা.

(২২০) নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাত।

(২২১) আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব শয়তানরা কার নিকট অবতীর্ণ হয়?

(২২২) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকটই তারা অবতীর্ণ হয়।

(২২৩) তারা কান পেতে থাকে আর তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী।

(২২৪) এবং পথভ্রষ্ট লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে।

(২২৫) তুমি কি লক্ষ্য করোনি তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়।

(২২৬) এবং তারা যা করে না, তা বলে থাকে।

(২২৭) কিন্তু সে সব লোক ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং নির্যাতত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারীরা অচিরেই জানতে পারবে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মোমেনদের সঙ্গে মধুর ব্যবহার করার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, আর এ আয়াতে এরশাদ হয়েছে তাদের কথা, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের অবাধ্য হয়। এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ

"আর যদি তারা আপনার কথা না মানে (হে রসূল!) আপনি বলুন, নিশ্চয় আমি তোমাদের কাজের জন্যে দায়ী নই"।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, এ আয়াতে গুনাহর কাজ থেকে দূরে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, কিন্তু গুনাহগারদের থেকে দূরে থাকার হুকুম দেয়া হয়নি। যেমন পূর্বের আয়াতে মোমেনদের সাথে মধুর ব্যবহার করার নির্দেশ রয়েছে। সুফীবাদের ভাষায় এ কাজটিকে حب فى الله তথা আল্লাহর জন্যে মহব্বত বলা হয়। এর পাশাপাশি এরশাদ হয়েছেঃ

فَإِنْ عَصَوْكَ

(হে রসূল!) যদি তারা আপনার অনুসারী না হয় তথা আপনার অবাধ্য হয় তবে আপনি বলুন, আমি তোমাদের কৃতকর্মের উপর অসন্তুষ্ট এবং তোমাদের এসব কার্যকলাপের জন্যে আমি দায়ী নই। সুফিবাদে একে بغض فى الله বলা হয়। অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যেই কোন কাজকে অপছন্দ করা।

যেহেতু মুসলিম জীবনের উদ্দেশ্য হল এক আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি লাভ করা, তাই মুসলমানের পছন্দ-অপছন্দ নির্ভর করে আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির ওপর, যে কাজ আল্লাহ পাকের দরবারে পছন্দনীয় সে কাজকে পছন্দ করা, আর যে কাজ আল্লাহ পাকের অসন্তুষ্টির কারণ হয় তাকে অপছন্দ করা মুসলমান মাত্রেরই কর্তব্য।

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

"আর (হে রসূল!) আপনি এক আল্লাহ পাকের প্রতিই ভরসা রাখুন, যিনি পরাক্রমশালী, যিনি পরম করুণাময়"।

ভরসা শুধু এক আল্লাহ পাকের প্রতি

যেহেতু এক আল্লাহ পাকের সাথে আপনার সম্পর্ক, তাই সত্য-সাধনায় দ্বীন ইসলাম প্রতিষ্ঠায় আপনি এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করুন, কেননা তিনি পরাক্রমশালী, তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, তিনি ইচ্ছা করলে যে কোন সময় নাফরমানদের শাস্তি বিধান করতে পারেন কিন্তু তা করেন না, কেননা তিনি পরম করুণাময়, তাঁর করুণার কারণেই তিনি কাফের মুশরেকদের অবকাশ দিয়ে থাকেন। অতএব, এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করাই হলো সাফল্য লাভের পন্থা। অথবা এ বাক্যটির আরও একটি ব্যাখ্যা করা যায়, (হে রসূল!) আপনি ভরসা করুন আল্লাহ পাকের প্রতি, যিনি পরাক্রমশালী, তিনি যে কোন সময় অবাধ্য কাফেরকে

নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারেন, আর যিনি আপন প্রিয় বন্দাদের প্রতি সর্বদাই দয়া করে থাকেন, যেমন তিনি (হে রসূল!) আপনার প্রতি এবং আপনার অনুসারীদের প্রতি সম্পূর্ণ দয়াবান।

الَّذِىْ يَرٰىكَ حِيْنَ تَقُوْمُ

"যিনি আপনাকে দেখেন যখন আপনি দন্ডায়মান হন"।

অর্থাৎ (হে রসূল!) যখন আপনি মানুষকে তৌহিদের উপর বিশ্বাস স্থাপনের আহ্বান করার জন্যে দন্ডায়মান হন, অথবা কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদের জন্যে দন্ডায়মান হন, অথবা নামাযের জন্যে দন্ডায়মান হন, সর্বাবস্থায়ই আল্লাহ পাক আপনাকে দেখেন।

وَتَقَلُّبَكَ فِى السّٰجِدِيْنَ

"আর যিনি দেখেন নামাযীদের সাথে আপনার ওঠা-বসা"।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নামাযের রুকু সেজদায় যে ওঠা-বসা হয়, তাই এর দ্বারা উদ্দেশ্য।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, আল্লাহ পাক আপনাকে তখনও দেখেন যখন আপনি একা নামায আদায় করেন, আর যখন আপনি অন্যদের সঙ্গে জামাতে নামায আদায় করেন, তখনও দেখেন।

তফসীরকার মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, এ আয়াতের অর্থ হল (হে রসূল!) আপনি যে আপনার পেছনে নামায আদায়কারীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন তা-ও আল্লাহ পাক লক্ষ্য রাখেন। কেননা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যেভাবে সম্মুখের দিকে দেখতেন, ঠিক তেমনি তিনি পেছনের দিকেও দেখতে পেতেন, তাই তিনি তাঁর পেছনে দন্ডায়মান মুসল্লীদের অবস্থাও পর্যবেক্ষণ করতেন। আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেন, (হে রসূল!) আমি আপনার এ কাজটিও দেখি।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ তোমরা মনে কর যে আমি সামনের দিকে দেখি, কিন্তু আল্লাহর শপথ! তোমাদের মনের বিনয়ও আমার নিকট গোপন নেই, আমি তোমাদের পেছন দিকেও দেখি। (বগভী)

হযরত হাসান বসরী (রঃ) বলেছেন এর অর্থ হল, আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ মোমেনদের মধ্যে আমি আপনার গমনাগমনকে লক্ষ্য করি।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে سجدين শব্দ দ্বারা আম্বিয়ায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, অর্থাৎ যেভাবে অন্যান্য আম্বিয়ায়ে কেরামের বিভিন্ন অবস্থা ছিল, আল্লাহ পাক তা দেখতেন এমনিভাবে আল্লাহ পাক (হে রসূল!) আপনার অবস্থাও দেখেন।

কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেভাবে (হে রসূল!) আপনি তাহাজ্জুদ গুজার লোকদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে যে আসা-যাওয়া করেন, আল্লাহ পাক তা-ও দেখেন।[১]

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৫৮-৫৯

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, যে রাতে তাহাজ্জুদের নামাযের ফরজ হওয়া বাতিল হয়, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওযাসাল্লাম সে রাতে সাহাবায়ে কেরামের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্যে বের হয়ে পড়লেন। কেননা, সাহাবায়ে কেরাম এবাদতে মশগুল থাকলে তিনি অত্যন্ত খুশি হতেন। সাহাবায়ে কেরামকে তিনি আল্লাহর জিকরে, তেলাওয়াতে কোরআনে মগ্ন পেয়েছেন। বস্তুতঃ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিশেষ বিশেষ অবস্থা ছিল। এ আয়াতে সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে তাঁর গমনাগমনের অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। কেননা, তাঁর এ কাজটি সাহাবায়ে কেরামের জন্যে আল্লাহ পাকের রহমতের কারণ ছিল।[১]

এ আয়াতে আল্লাহ পাক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বিশেষভাবে নির্দেশ প্রদান করেছেন, (হে রসূল!) আপনি সর্ব শক্তিমান আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা রাখুন, তিনি পরম করুণাময়, আপনার প্রতিটি আচরণের প্রতি তিনি লক্ষ্য রাখেন, আপনি যখন নামায আদায় করেন, যখন আপনার সাহাবাদের খবর নেন, যখন আপনি নামাযে রুকু সেজদায় রত হন, এক কথায় আপনার সকল অবস্থা সম্পর্কে আল্লাহ পাক সম্পূর্ণ অবগত। অতএব, আপনি এক আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করুন।

إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

নিশ্চয় আল্লাহ পাক সর্বশ্রোতা, সর্ববিষয়ে মহাজ্ঞানী। তিনি সকলের কথা শ্রবণ করেন, সকলের যাবতীয় কর্মকান্ড প্রত্যক্ষ করেন এবং সকলের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠের কথাও তিনি জানেন। সব কিছুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত তাঁর হাতে, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী তিনিই।

অতএব, তাঁর প্রতি ভরসা করাই একান্ত করণীয় কাজ।

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ

আমি কি তোমাদেরকে জানিয়ে দেব শয়তান কার নিকট অবতীর্ণ হয়? কাফেররা পবিত্র কোরআনের সত্যতা সম্পর্কে আপত্তিকর মন্তব্য করত, কখনো বলত, (হযরত) মোহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) নিজেই এ গ্রন্থ রচনা করেছেন, আর কখনো বলত, তাঁর নিকট কোন জ্বীন শয়তান আসে, সে এসব কথা শিখিয়ে দেয়, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের এসব ভ্রান্ত মতের বাতুলতা ঘোষণা করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম বর্ণনা করা হয়েছে। কাফেরদের উপরোক্ত কথা বানোয়াট, মিথ্যা, ভিত্তিহীন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট জ্বীন শয়তান আসতেই পারেনা, কেননা জ্বীন শয়তানরা মানুষকে মন্দ কথার প্ররোচনা দেয়, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম সর্বদা সত্যের দিকে মানুষকে আহ্বান জানান.। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ

"আমি কি বলবো তোমায় শয়তান কার উপর অবতীর্ণ হয়"?

تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৪৮

প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীষ্ঠ ব্যক্তির নিকটই তারা অবতীর্ণ হয়। যিনি সর্বদা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের প্রতি ভরসা করেন, তাঁর স্মরণে তন্ময় থাকেন, যিনি দিবা-রাত্রি আল্লাহ পাকের এবাদতে মশগুল থাকেন, যিনি সর্বক্ষণ আল্লাহ পাকের মহান বাণী প্রচারে ব্যস্ত থাকেন, তাঁর নিকট শয়তান কখনো আসতে পারেনা। শয়তান আসে মিথ্যাবাদী, পাপাচারী লোকদের কাছে।

يُلْقُوْنَ السَّمْعَ وَاَكْثَرُهُمْ كٰذِبُوْنَ

ঐ পাপীষ্ঠ লোকেরা শয়তানের কথা শুনবার জন্যে কান পেতে থাকে, তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী, অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সততা, সত্যবাদিতা এবং সাধুতা সর্বজন-বিদিত, দিবালোকের মত সুস্পষ্ট। আরবের জনসাধারণই তাঁকে الصادق الامين (সত্যবাদী বিশ্বস্ত) উপাধি দ্বারা ভূষিত করেছে।

অতএব, তাঁর নিকট জ্বীন শয়তান আসতেই পারেনা। মূলতঃ পবিত্র কোরআন হলো সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, আল্লাহ পাকের মহান বাণী যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট ফেরেশতা শ্রেষ্ঠ জীব্রাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে অবতীর্ণ হয়।

উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, কিছু লোক প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট গণকদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করল, তিনি বললেনঃ 'এরা কিছুই নয়'। তখন আরজ করা হলো, ইয়া রসূলাল্লাহ! কখনো তারা এমন কথাও বলে যা সত্য হয়ে যায়। তখন তিনি এরশাদ করেন, ফেরেশতাগণ যখন এমন বিষয়ে পরস্পর কথা বলে যে সম্পর্কে আল্লাহ পাকের দরবারে সিদ্ধান্ত হয়েছে, শয়তান মেঘমালার কাছে গিয়ে তাদের দু' একটি কথা শুনে ফেলে আর সে কথা গণকদের কানে কানে বলে যায়, তখন গণকরা আরো একশ'টি মিথ্যা কথা তার সঙ্গে মিশিয়ে বলে।

বোখারী শরীফে সংকলিত একখানি হাদীসে রয়েছে, আল্লাহ পাক যখন আসমানে কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন ফেরেশতাগণ বিনয়ী হয়ে তাদের ডানা ঝুকিয়ে দেন, তখন একটি শব্দ শ্রুত হয়, যেমন কোন ময়দানে যদি জিঞ্জির বাজানো হয়। যখন ফেরেশতাদের ভয়-ভীতি দূরীভূত হয়, তখন তারা পরস্পরকে জিজ্ঞাসা করেন, আমাদের পরওয়ারদেগারের কি হুকুম জারী হয়েছে? তখন অন্য ফেরেশতা জবাব দেন, তিনি মহান, তাঁর শান সর্বোচ্চে। এ সময় জ্বীন শয়তান কোন কথা শুনে ফেলে আর তা গণকদের পৌছে দেয়।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) একজন আনসারী সাহাবীর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আমরা এক রাতে হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট বসেছিলাম, এমন সময় একটি তারা পড়তে দেখলাম এবং তার আলো বিচ্ছুরিত হলো। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, জাহেলিয়াতের যুগে এভাবে তারা নিক্ষিপ্ত হলে তোমরা কি বলতে? উপস্থিত সাহাবায়ে কেরাম আরজ করলেন, আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নিজেই জানেন যে আমরা তখন কি বলতাম যে, আজ রাতে কোন উঁচু স্তরের ব্যক্তি জন্মগ্রহণ করেছে।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এ তারা কারো মৃত্যু বা জীবনের ব্যাপারে নিক্ষিপ্ত হয় না; বরং আমাদের প্রতিপালক যখন কোন বিষয়ের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, তখন আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণ তসবীহ পাঠ করেন। এরপর তাদের নিকটস্থ

আসমানের ফেরেশতাগণ তসবীহ পাঠ করেন। এমনিভাবে দুনিয়ার নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত এ তসবীহের আওয়াজ পৌঁছে। এরপর আরশ বহনকারী ফেরেশতাগণকে নিকটস্থ আসমানের ফেরেশতাগণ জিজ্ঞাসা করেন, তোমাদের প্রতিপালক কি বলেছেন? তারা বলে, আল্লাহ পাক একথা বলেছেন। এভাবে একের পর এক আসমানবাসীগণ তার নিকটস্থ আসমানবাসীগণকে জিজ্ঞাসা করতে থাকে, অবশেষে একথাটি দুনিয়ার নিকটস্থ আসমান পর্যন্ত পৌঁছে। আর সেখান থেকে জ্বীনেরা এসব কথা শুনে পলায়ন করে এবং তাদের বন্ধুদের নিকট তারা সে কথা বর্ণনা করে, এরপর গণকরা সেকথা বাড়িয়ে মানুষকে বলে।[১] (মুসলিম শরীফ)

যাহোক, অদৃশ্য জগতের কথা চুরি করার জন্যে শয়তানরা যে চেষ্টা করে, তাদের প্রতি তারকা নিক্ষেপ করা হয়।

وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ

"আর পথভ্রষ্ট লোকেরাই কবিদের অনুসরণ করে থাকে"।

পবিত্র কোরআন কাব্য নয়, আল্লাহ পাকের মহান বাণী

কাফেররা প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ পাকের প্রেরিত নবী হিসেবে মানত না, কখনো তাঁকে গণক বলত, আর কখনো কবি।

পূর্ববর্তী আয়াতে তাদের এ ভিত্তিহীন কথার প্রতিবাদ করে ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি আদৌ গণক নন, তিনি আল্লাহ পাকের সত্য রসূল, গণকদেরকে শয়তানরা বানোয়াট কথা বলে, অথচ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম মানুষকে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের মহান বাণী পৌঁছিয়ে থাকেন, আলোচ্য আয়াতে কাফেরদের একথার প্রতিবাদ করা হয়েছে, তারা বলত তিনি কবি, তাই ঘোষণা করা হয়েছে, পথভ্রষ্ট লোকেরাই কবিদের অনুসারী হয়ে থাকে। কবিদের কথা বাস্তবভিত্তিক নয়; বরং কল্পনা প্রসূত। কবিদের অধিকাংশ কথাই অলীক, অবাস্তব এবং মিথ্যা। কবিদের কষ্ট-কল্পনা, তাদের কাব্যচর্চা মানব মনে কখনো কোন স্থায়ী প্রভাব ফেলতে পারেনা। ক্ষণিকের জন্যে মানুষকে আনন্দ দিতে পারে মাত্র। মানবতার উৎকর্ষ সাধনে, মানবতার মনোন্নয়নে কবিদের অবদান সামান্য বললে অত্যুক্তি হবেনা। কেননা, কারো কাব্যের মাধ্যমে হেদায়েত লাভ করা সম্ভব হয় না।

পক্ষান্তরে, পবিত্র কোরআন মানুষের মনোজগতে এক বিস্ময়কর বিপ্লব এনে দিয়েছে। মানুষের চিন্তা-চেতনায়, ধ্যান-ধারণায় অভূতপূর্ব পরিবর্তন এনে দিয়েছে। তাই পবিত্র কোরআনকে কবির কাব্য এবং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানবকে কবি বলার ন্যায় ধৃষ্টতা আর কিছুই হতে পারেনা। এজন্যে পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اَنَّهُمْ فِىْ كُلِّ وَادٍ يَّهِيْمُوْنَ ۝ وَاَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ مَا لَا يَفْعَلُوْنَ.

"তুমি কি লক্ষ্য করোনি যে, তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায় এবং তারা যা করে না, তাই বলে থাকে"।

অতএব, পবিত্র কোরআন কাব্য নয়, কারো কল্পনা নয়; বরং বাস্তব সত্য, আল্লাহ পাকের মহান বাণী, আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কবি নন, বরং আল্লাহ পাকের প্রিয়

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৫৬১-৬২

রসূল, তিনি মানুষকে আল্লাহ পাকের দিকে আহ্বান করেন এবং ক্ষণস্থায়ী জগতের প্রতি আকৃষ্ট না হয়ে পরকালীন চিরস্থায়ী জীবনের জন্যে সম্বল সংগ্রহে অনুপ্রাণিত করেন। আর তিনি যা করেন তাই বলেন। আর কখনো এমন কথা বলেননি যা করেননি। অথচ কবিরা এমন কথা বলে যা তারা করে না।[১]

একটি ঘটনা

খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ) হযরত নোমান এবনে আদী এবনে ফোজলাকে ইরাকের মাইছান এলাকার গভর্ণর নিযুক্ত করেছিলেন; তিনি একজন কবি ছিলেন, তিনি একটি কবিতায় মদ্যপান, নাচ-গানের উল্লেখ করেছিলেন, ঘটনাক্রমে তাঁর সেই কবিতা খলীফাতুল মুসলেমীন হযরত ওমর (রাঃ)-এর নিকট পৌঁছে, হযরত ওমর (রাঃ) সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে বরখাস্ত করেন এবং সূরা হা-মীমের প্রথম তিনখানি আয়াতের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন, তোমার কবিতা আমার জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হয়েছে, তাই তোমাকে আমি বরখাস্ত করলাম। হযরত নোমান খলীফাতুল মুসলেমীনের খেদমতে হাযির হয়ে বললেন, হে আমীরুল মোমিনীন, এটি ছিল আমার কবিতা, বাস্তবের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। আমি কখনো জীবনে মদ স্পর্শ করিনি, নাচ গানের প্রতিও আকৃষ্ট হইনি, কাব্য চর্চার খাতিরেই এর অবতারণা, কিন্তু হযরত ওমর (রাঃ) তাঁকে আর ঐ পদে বহাল করেননি।

আলোচ্য আয়াতের যে ব্যাখ্যা ইতিপূর্বে করা হয়েছে, যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে আল্লামা বগভী (রঃ) তার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। আর আতীয়্যা (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

অন্যান্য তফসীরকারগণ বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে যে কবিদের উল্লেখ করা হয়েছে, তারা হলো সে সব কবি যারা কাফেরদের পক্ষে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমালোচনায় কাব্য রচনা করত।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) তাদের নামোল্লেখ করেছেন যেমন আবদুল্লাহ এবনে যোবায়ের সাহমী, হোবায়রা এবনে আবি ওয়াহাব মাখজুমী, শাফে এবনে আবদে মনাফ, আবু ইজ্জা আবদুল্লাহ এবনে ওমর হাজমী, উমাইয়া এবনে সলাত সখফী। তদানীন্তন কালে আরবের এ কবিরাই কাফেরদের সমর্থনে এবং হুজুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সমালোচনায় কাব্য রচনা করত, সাহাবায়ে কেরামের বিরুদ্ধেও তারা কবিতা রচনা করত। এ পথভ্রষ্ট কবিরা যে কবিতা রচনা করত, তাদের গোত্রীয় লোকেরা তা আবৃত্তি করে বেড়াত। এভাবে ইসলাম এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা ষড়যন্ত্র করত। আলোচ্য আয়াতে তাদের এ পথভ্রষ্টতার কথাই বলা হয়েছে।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের الغاوون শব্দটির অর্থ হলো শয়তান, এ শয়তানরাই মানুষকে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দিত।

أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ

[১] তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৭৫
ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৮৮
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৫৬
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫০-৫১

অর্থাৎ কবিরা সব ক্ষেত্রেই নাক গলায়, কারো প্রশংসা করলে তাকে আকাশে তুলে দেয়, আর কারো সমালোচনা করলে তাকে পাতালে পৌঁছে দেয়। যার কোন অস্তিত্ব নেই তার অস্তিত্ব প্রমাণ করা, আর যা কিছু আছে তাকে নেই বলে দাবী করা তাদের অভ্যাস। কখনও কারো প্রশংসায় তারা মুগ্ধ, আর কখনও কারো নিন্দায় লিপ্ত। এভাবে তাদের কথা ও কাজে কখনও কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায়না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতের هَائِمُ শব্দটির অর্থ হল উদভ্রান্ত, অর্থাৎ কবিরা কখনও কোন সীমার মধ্যে থাকেনা, এমনকি মিথ্যা বলতেও দ্বিধা করেনা, আর তাদের বহু কথায় তারা কল্পনার ঘোড়া দৌড়ায়। বাস্তবের সাথে কোন সম্পর্ক থাকেনা।

তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, কবিরা প্রশংসার ক্ষেত্রেও মিথ্যা বলে, আর নিন্দাবাদের ক্ষেত্রেও অবাস্তব কথা বলে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যারা কথার মধ্যে অত্যন্ত বেশী সীমালঙ্ঘন করে তথা বাড়াবাড়ি করে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। তিনি কথাটি তিনবার বলেছেন।

হযরত আবু সালাবা খাশানী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমার নিকট সবচেয়ে প্রিয় এবং কেয়ামতের দিন আমার সবচেয়ে নিকটতর তোমাদের মধ্যে সে সব লোক হবে যাদের চরিত্র ভাল, যাদের নৈতিক মান উন্নত, আর আমার নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য এবং কেয়ামতের দিন আমার নিকট থেকে সর্বাধিক দূরে তোমাদের মধ্যে সে সব লোক হবে যাদের চরিত্র ভাল নয়, যারা অহেতুক বকা-বাদ্য করে, যারা অসতর্ক হয়ে চিৎকার দিয়ে কথা বলে।

তফসীরকারগণ বলেছেন, কোন কোন কবির এ অবস্থাই হয়। হযরত আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ যে রাতে আমাকে মে'রাজে নিয়ে যাওয়া হয় সে রাতে আমি কিছু লোক দেখেছি যাদের ঠোঁট অগ্নির কেচি দ্বারা কাটা হয়, আমি জীব্রাঈলকে জিজ্ঞাসা করলাম, এরা কারা? জীব্রাঈল বললেন, এরা আপনার উম্মতের সে সব বক্তা, যারা এমন কথা বলতো, যা নিজেরা করতো না। (তিরমিযী)

শানে নুযুল

এবনে আবি হাতেম, এবনে জরীর এবং হাকেম আবু হাসান বোরাদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, যখন আলোচ্য আয়াত (وَالشُّعَرَآءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوٗنَ) নাযিল হয় তখন আদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ), কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) এবং হাসসান এবনে সাবেত (রাঃ) প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ পাক এ আয়াত নাযিল করেছেন, আর তিনি জানেন আমরা কবি, এ অবস্থায় আমরা তো ধ্বংস হয়ে গেলাম। তখন নাযিল হল,

اِلَّا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَذَكَرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّانْتَصَرُوْا

"কিন্তু সে সব লোক ব্যতীত যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং আল্লাহ পাককে অধিক পরিমাণে স্মরণ করে এবং নির্যাতিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে"।

অর্থাৎ পূর্ববর্তী আয়াতে কবিদের সম্পর্কে যে ঘোষণা রয়েছে তাতে সে সব কবি অন্তর্ভুক্ত নয় যারা ঈমানদার হয়, যারা নেক আমল করে, যারা আল্লাহ পারেক হাম্‌দ বা প্রশংসা বর্ণনা

করে, যারা সৎ কাজের জন্যে মানুষকে অনুপ্রাণিত করে, যারা অধিক পরিমাণে আল্লাহকে স্মরণ করে অর্থাৎ তাদের কাব্য চর্চা আল্লাহ্ পাকের জিকর থেকে বিরত রাখেনা। অথবা এর অর্থ হল, তাদের অধিকাংশ কবিতায় তারা আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ এবং তাঁর হাম্দ ও সানা বর্ণনা করে এবং আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশের জন্যে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে।

তফসীরকার আবু ইয়াজিদ বলেছেন, অধিক পরিমাণে জিকর সংখ্যার আধিক্যে হয় না; বরং হুজুরে ক্বলব বা মনের একাগ্রতার মাধ্যমে হয়।

وَّانْتَصَرُوْا

অর্থাৎ যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরামের এবং ইসলামের নিন্দা করে তাদের মোকাবেলায় কাফেরদের নিন্দা যারা করে এবং তাদের দাঁতভাঙা জবাব যারা দেয়, তারা যেন নিন্দাকারী কাফেরদের থেকে তাদের জুলুমের প্রতিশোধ গ্রহণ করে।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরয করলেন, হে আল্লাহর নবী! কবিদের সম্পর্কে আল্লাহ পাক যা এরশাদ করেছেন তা সর্বজন-বিদিত, (এমন অবস্থায় আমাদের কি হবে) তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, মোমেন তলোয়ার দ্বারা (জেহাদ করে), আর রসনা দ্বারা (জেহাদ করে)। শপথ সেই পবিত্র সত্ত্বার! যাঁর হাতে রয়েছে আমার প্রাণ, তোমরা (রসনা দ্বারা) তাদের প্রতি যে তীর নিক্ষেপ কর, তা কামানের তীরের ন্যায়ই হয়।

আবদুল বার লিখেছেন, হযরত কা'ব (রাঃ) আরজ করেছেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! কাব্য সম্পর্কে আপনার অভিমত কি? তখন তিনি এরশাদ করেন, মোমেন তার তলোয়ার দ্বারা জেহাদ করে এবং রসনা দ্বারাও।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম কাযা ওমরা আদায় করার জন্যে যখন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় প্রবেশ করেন তখন হযরত আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহা (রাঃ) হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আগে চলছিলেন এবং হরমের মধ্যেই কবিতা পাঠ করছিলেন, তিনি তখন হযরত ওমরকে (রাঃ) লক্ষ্য করে বললেন, ওমর! তাকে কবিতা পাঠ করতে দাও কেননা, এ কবিতাগুলো কামানোর তীরের চেয়েও অধিকতর ক্ষুরধার এবং তাদের উপর প্রতিক্রিয়াকারী।

বোখারী শরীফ ও মুসলিম শরীফে সংকলিত এবং হযরত বরা এবনে আযব (রাঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে রয়েছে, বনী কোরায়জার যুদ্ধের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসল্লাম হযরত হাস্সান এবনে সাবেত (রাঃ)-কে বলেন, মুশরেকদের নিন্দাবাদ কর, জীব্রাঈল (সাহায্যের জন্যে) তোমাদের সঙ্গে রয়েছেন। আর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্সানকে একথাও বলেছিলেন, আমার পক্ষ থেকে তাদেরকে জবাব দাও, হে আল্লাহ! জীব্রাঈলের মাধ্যমে তাকে সাহায্য কর।

মুসলিম শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোরায়শের নিন্দা কর, তোমাদের পক্ষ থেকে এ নিন্দাবাদ কোরায়শের জন্যে তীরবিদ্ধ হবার চেয়েও কষ্টদায়ক। আর হযরত আয়েশা (রাঃ) একথাও বর্ণনা করেছেন, আমি শুনেছি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্সান (রাঃ)-কে বলেছেন, জীব্রাঈল সর্বদা তোমার সাহায্য করতে থাকবে, যখন তুমি আল্লাহ পাক এবং আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি-উত্তর দিতে থাকবে।

বোখারী শরীফে হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত হাস্‌সানের জন্যে মসজিদে মিম্বর স্থাপন করিয়ে দিতেন, যার উপর দাঁড়িয়ে তিনি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে কাফেরদের কথার জবার দিতেন কবিতার মাধ্যমে। আর তখন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম বলতেন, আল্লাহ পাক জীব্রাঈল (আঃ)-এর দ্বারা হাস্‌সানের সাহায্য করেন, যতক্ষণ সে আল্লাহর রসূলের পক্ষ থেকে কাফেরদের প্রতি-উত্তর দিয়ে থাকে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাস্‌সান তাদের নিন্দাবাদের জবাব দিয়েছে, রোগ দূরীভূত করেছে, রোগ দূরীভূত করার মত বিষয় বর্ণনা করেছে।

আল্লামা বগভী (রঃ) হযরত আযেশা (রাঃ)-এর আরেকটি বর্ণনার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, কোরায়শের (কাফেরদের) নিন্দা কর (কবিতার মাধ্যমে)। এ পন্থা তাদের জন্যে তীরের চেয়েও অধিকতর কষ্টদায়ক। এরপর তিনি আবদুল্লাহ এবনে রওয়াহাকে খবর দেন এবং তাঁকে আদেশ দেন কাফেরদের কথার প্রতি-উত্তর দাও, এ পর্যায়ে তাদের সঙ্গে মোকাবেলা কর, কিন্তু তিনি হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের পছন্দ মোতাবেক কাফেরদের প্রতি-উত্তর দিতে পারেননি। এরপর কা'ব এবনে মালেক (রাঃ)-কে ডাকলেন, এরপর হাস্‌সান এবনে সাবেত (রাঃ)-কে ডাকলেন, যখন হাস্‌সান এবনে সাবেত (রাঃ) আসলেন তখন তিনি এরশাদ করলেন, এখন সময় এসে গেছে যে তুমি ঐ বাঘের দিকে তীর নিক্ষেপ কর যে লেজ নেড়েছে (হামলায় উদ্দত)। তখন হযরত হাস্‌সান (রাঃ) তাঁর মুখ থেকে জিহ্বা বের করে তা নাড়া দিয়ে বললেন, শপথ সেই আল্লাহ পাকের, যিনি আপনাকে সত্য দ্বীন নিয়ে প্রেরণ করেছেন, আমি রসনা দ্বারা তাদেরকে চামড়ার ন্যায় ছিড়ে ফেলব। হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন, তুমি তাড়াহুড়া করোনা, আবু বকর কোরায়শের বংশধারা সম্পর্কে অধিকতর অবগত। আমার বংশ-সূত্র কোরায়শের মধ্যেই রয়েছে। আবুবকর আমার বংশ-সূত্রকে কোরায়েশ থেকে আলাদা করে দেবে; তখন হাস্‌সান (রাঃ) হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর নিকট গমন করলেন এবং ফিরে এসে আরজ করলেন, ইয়া রসূলাল্লাহ! আবু বকর (রাঃ) আপনার বংশ-সূত্রকে আলাদা করে দিয়েছেন। শপথ সেই আল্লাহর পাকের, যিনি আপনাকে সত্য নবী করে প্রেরণ করেছেন, আমি আপনাকে তাদের থেকে এভাবে আলাদা রাখবো যেভাবে আটা থেকে চুলকে বের করা হয়। তখন হাস্‌সান (রাঃ) এভাবে কবিতা আবৃত্তি করলেন,

هجوت محمدا فاجبت عنه = وعند الله فى ذاك الجزاء

তুমি হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিন্দা করেছ, আমি তাঁর পক্ষ থেকে জবাব দিয়েছি। আল্লাহ পাকের দরবারে এর জন্যে উত্তম বিনিময় রয়েছে।

هجوت محمدا برا تقيا = رسول الله شيمته الوفاء

যিনি পবিত্র, যিনি মহান, যিনি পরহেযগার, তাঁর নিন্দা করেছ তুমি, অথচ তিনি আল্লাহর রসূল, অঙ্গীকার রক্ষা করা যাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

فان ابى ووالدتى وعرضى = لعرض محمد منكم وقاء

আমার পিতা-মাতা এবং আমার ইজ্জত তোমাদের থেকে হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের ইজ্জত রক্ষাকারী, অর্থাৎ হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে

ওয়াসাল্লামের ইজ্জত সম্মান রক্ষার জন্যে আমার পিতা-মাতা সহ আমরা সকলেই কোরবান হতে প্রস্তুত।

جبرئيل رسول الله فينا - وروح القدس ليس له كفاء

আল্লাহর প্রেরিত জীব্রাঈল আমাদের মধ্যে রয়েছেন, আর জীব্রাঈলের কোন প্রতিদ্বন্দ্বী নেই।

এবনে সিরীনের একটি বর্ণনায় রয়েছে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম হযরত কা'ব এবনে মালেক (রাঃ)-কে বলেছেন, 'নিয়ে আস'। হযরত কা'ব (রাঃ) তখন তাঁকে একটি কবিতা শুনিয়ে দিলেন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেনঃ এটি তাদের (কোরায়েশ) জন্যে তীর নিক্ষিপ্ত হবার চেয়েও বেশী ক্ষুরধার।

এই হাদীস সমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, কবিতায় যদি মিথ্যা এবং অবৈধ কিছু না থাকে, তবে এমন কবিতায় কোন ক্ষতি নেই।

দারে কুতনী হযরত আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা সংকলন করেছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট কবিতার বৈধতার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, এটি হলো কথা, ভালও হয়, মন্দও হয়। যা ভাল তা গ্রহণ কর, যা মন্দ তা বর্জন কর। হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সর্বোত্তম কথা যা কোন কবি বলেছেন, তা হলো লবীদের কথা– الا كل شيئ ما خلا الله باطل

"জেনে রাখ, আল্লাহ পাক ব্যতীত আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব থাকবেনা"।

প্রণিধানযোগ্য

যদি কবিতায় আল্লাহ পাকের জিকর থাকে, দ্বীনি এলম থাকে এবং মুসলমানদের জন্যে উপদেশ থাকে, তবে এমন কাব্য রচনা এবাদতের অন্তর্ভুক্ত।

হযরত উবাই এবনে কা'ব (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন কোন কবিতা হেকমতপূর্ণ হয়। (বোখারী শরীফ)

সখর এবনে আবদুল্লাহ এবনে বোরায়দা বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ কোন কোন বর্ণনায় যাদু থাকে, আর কোন কোন জ্ঞানেও মূর্খতা থাকে, আর কোন কোন কবিতা হেকমতপূর্ণ হয়। (আবু দাউদ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে যে, কোন কোন বর্ণনায় যাদু থাকে, আর কোন কোন কবিতাও হেকমতপূর্ণ হয়।[১]

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَىَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

"আর জালেমরা অচিরেই জানতে পাররে কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল"।

কাফেরদের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী

এ সূরার সর্বশেষ আয়াতে জালেমদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করা হয়েছে, যারা শেরক করে অথবা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে, অথবা

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৬৪-৬৭
তফসীরে তাবারী খন্ড-১৭, পৃষ্ঠা-৮০

মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে তারা অদূর ভবিষ্যতে জানতে পারবে, তাদের গন্তব্যস্থল কোথায়? অর্থাৎ মৃত্যুর পর তাদের ঠিকানা কোথায় হবে তা তারা জানতে পারবে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, তাদের ঠিকানা যে দোযখ এতে কোন সন্দেহ নেই, তা কত বিপজ্জনক তা তারা মৃত্যুর পরই বুঝতে পারবে।

আল্লামা বয়যাভী (রঃ) লিখেছেন, এ আয়াতে অত্যন্ত কঠোর হুশিয়ারী বাণী উচ্চারিত হয়েছে এ মর্মে যে, কাফেররা মনে করে তাদের তেমন কোন শাস্তি হবেনা, কিন্তু তারা অচিরেই জানতে পারবে কত কঠিন এবং কঠোর শাস্তি তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমরা জুলুম করা থেকে আত্মরক্ষা কর কেননা, জুলুমের কারণে তোমরা কেয়ামতের ময়দানে অন্ধকারে থেকে যাবে।[১]

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, এ সূরার পরিসমাপ্তি হয়েছে এ আয়াত দ্বারা যাতে সে সব লোকদের উদ্দেশ্যে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারিত হয়েছে, যারা আল্লাহ পাকের আয়াত সমূহ থেকে বিমুখ থাকে তথা এর দ্বারা শিক্ষা গ্রহণ করে না, তারা অবশ্যই অদূর ভবিষ্যতে তাদের ভয়াবহ পরিণাম দেখতে পাবে।[২]

হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর ওসিয়ত

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, আমার আব্বাজান তাঁর ওসিয়তনামায় দু'টি ছত্র লিখেছেনঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম, এ হলো সেই ওসিয়ত যা আবু বকর এবনে আবু কোহাফা দুনিয়া থেকে বিদায়ের সময় লিপিবদ্ধ করেছে, এটি এমন এক সময় যখন কাফেরও ঈমান আনে, বদকার লোকও নেককার হয়ে যায়, আর মিথ্যাবাদী ব্যক্তিও সত্য কথা বলে, আমি তোমাদের উপর ওমর এবনুল খাত্তাবকে (রাঃ) আমার স্থলাভিষিক্ত করেছি, যদি তিনি ন্যায় বিচার কায়েম করেন, আর তাঁর ব্যাপারে আমি তাই আশা করি। পক্ষান্তরে, যদি তিনি জুলুম করেন তবে

وَسَيَعْلَمُ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْٓا اَيَّ مُنْقَلَبٍ يَّنْقَلِبُوْنَ

"অচিরেই জালেমরা জানতে পারবে, কোথায় তাদের গন্তব্যস্থল"।[৩]

আলহামদুলিল্লাহ! অদ্য ২৮ শাওয়াল ১৪১৪ হিঃ মোতাবেক ১০ এপ্রিল ১৯৯৪ ইং রোজ রোববার সূরা শুআরার তফসীর সমাপ্ত হলো। এটি আল্লাহ পাকের রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়। হে আল্লাহ! তফসীরে নূরুল কোরআন সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর। এ সাধনাকে কবুল কর, আমীন।

১। তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৭৬
২। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৫৬৮
৩। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৫৭

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

সূরা নাম্‌ল

سُوْرَةُ النَّمْلِ مَكِّيَّةٌ وَّهِيَ ثَلٰثٌ وَّتِسْعُوْنَ اٰيَةً وَّسَبْعُ رُكُوْعَاتٍ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ○

طٰسٓ ۚ تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ ۙ﴿١﴾ هُدًى وَّبُشْرٰى
لِلْمُؤْمِنِيْنَ ۙ﴿٢﴾ الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ وَ
هُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ۙ﴿٣﴾ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ
زَيَّنَّا لَهُمْ اَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُوْنَ ۙ﴿٤﴾ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ
لَهُمْ سُوْٓءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمُ الْاَخْسَرُوْنَ ۝﴿٥﴾

পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে শুরু করছি

তরজমা

(১) তোয়া সিন, এ আয়াত সমূহ পবিত্র কোরআনের এবং সুস্পষ্ট কিতাবের।

(২) মোমেনদের জন্যে তা হেদায়েত এবং সুসংবাদ,

(৩) (প্রকৃত মোমেন তারাই) যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত আদায় করে, আর যারা আখেরাতে পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

(৪) (পক্ষান্তরে) যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে সুন্দর করে দিয়েছি, তাই তারা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়।

(৫) তাদের জন্যেই রয়েছে জঘন্যতম আযাব, আর তারাই হবে আখেরাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত।

সূরা নাম্‌ল প্রসঙ্গে

এ সূরা মক্কায় অবতীর্ণ। এতে ৯৩ আয়াতে, ৭ রুকু, ১১৪৯ বাক্য এবং ৪৭৬৭ অক্ষর রয়েছে। নাম্‌ল শব্দটির অর্থ হলো পিপীলিকা। যেহেতু এ সূরায় নাম্‌ল বা পিপীলিকার একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, তাই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে আন্ নাম্‌ল। পিপীলিকার এ ঘটনা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রমাণ বহন করে, তাই এ ঘটনার গুরুত্ব সমধিক। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের হিজরতের রাতে যখন তিনি মক্কার অদূরে অবস্থিত সওর পাহাড়ের গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, তখন আল্লাহ পাকের হুকুমে ক্ষণিকের মধ্যে ঐ গুহার মুখে মাকড়শা

তার জাল বিস্তার করেছিল, আর তা ছিল প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের মোজেযা এবং তাঁর নবুওয়্যতের দলিল, ঠিক তেমনি হুদহুদ নামক পাখির চিঠি নিয়ে যাওয়ার ঘটনা এবং বিলকিস রাণীর সিংহাসন তুলে আনা প্রভৃতি ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। এ সূরায় আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর তবলীগের পন্থার উল্লেখ করেছেন। পিপীলিকার এ ঘটনা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী মাত্রই এ সম্পর্কে অবগত যে, আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাথীগণ কোন প্রাণীকে কষ্ট দেন না।

এ সূরায় তৌহিদ এবং নবুওয়্যত সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। এবনে মরদবিয়া এবং বায়হাকী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, এ সূরা মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় নাযিল হয়েছে।[১]

এই সূরার আমল

যদি কেউ এ সূরা হরিণের চামড়ার উপর লিপিবদ্ধ করে স্বগৃহে হেফাজত করে তবে সেই গৃহ সাপ বিচ্ছু সহ সর্বপ্রকার কষ্টদায়ক প্রাণী থেকে সংরক্ষিত থাকবে। (দোরারুন নাজিম)

স্বপ্নের তা'বীর

যদি কেউ স্বপ্নে এ সূরা পাঠ করতে দেখে তবে সে তার সমাজের নেতৃত্ব লাভ করবে।-সুফুরী (রঃ)

পূর্ববর্তী সূরার সাথে সম্পর্ক

পূর্ববর্তী সূরার ন্যায় এ সূরাও শুরু করা হয়েছে পবিত্র কোরআন ও প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের রেসালতের সত্যতা সম্পর্কীয় আলোচনা দ্বারা। এ প্রসঙ্গে পূর্বকালের নবীগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। রেসালাতের প্রমাণ বর্ণিত হবার পর তৌহিদ এবং তার দলিলের বিবরণ স্থাপন পেয়েছে। পরে রয়েছে আখেরাত সম্পর্কীয় আলোচনা।

তফসীরুল কোরআন

طٰسٓ

এ অক্ষর সমূহকে মুকাত্তায়াত বলা হয়, এর অর্থ আল্লাহ পাকই জানেন। এ সম্পর্কে ইতিপূর্বে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।[২]

আল্লামা সয়ুতী (রহঃ) লিখেছেন, এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া সীন" হলো আল্লাহ পাকের ইসমে আজম।

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৫৪
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১১
তফসীরে হক্কানী পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৩৭
তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩১৫

[২]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩

আবদুর রাজ্জাক, আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে আবি হাতেম তফসীরকার কাতাদা (রহঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, "তোয়া সীন" হলো পবিত্র কোরআনের নাম সমূহের অন্যতম।[১]

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَكِتَابٍ مُّبِيْنٍ

এ সূরার আয়াত সমূহ পবিত্র কোরআনের এবং এই সুস্পষ্ট গ্রন্থের যা আল্লাহ পাকের মহান বাণী, কোন কবির কাব্য নয়।

পবিত্র কোরআন দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট

কোরআনে করীমের পর 'কিতাবুন মুবীন' শব্দটি সংযোজনের তাৎপর্য হলো, এই কিতাবে হালাল-হারাম, সত্য-অসত্য সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে। এতে কোন অসস্পষ্টতা নেই, বুদ্ধিমান মাত্রই এ সত্য উপলব্ধি করে, এতে কারো কোন সন্দেহ থাকে না, অবশ্য এর জন্যে পূর্ব শর্ত হলো অন্তর-দৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া, কেননা এমন ব্যক্তির নিকট এ সত্য দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট, এজন্যেই পরবর্তী বাক্যে এরশাদ হয়েছেঃ

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এই কোরআন পথ প্রদর্শক এবং সুসংবাদ মোমেনদের জন্যে, অর্থাৎ নিঃসন্দেহে কোরআনে করীম সমগ্র মানব জাতির হেদায়েতের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে শুধু সে সব লোক যাদের মধ্যে রয়েছে সততা, সাধুতা, যারা আল্লাহ পাক এবং তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান তথা বিশ্বাস স্থাপন করে, তাদের জন্যে পবিত্র কোরআন হয় পথ-প্রদর্শক এবং সুসংবাদ।[২]

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী আলোচ্য আয়াতের ব্যাখ্যা এভাবে করেছেন, এ আয়াত সমূহ যে গ্রন্থের তা হলো পবিত্র কোরআন। এ গ্রন্থ সত্য-অসত্যের বিবরণে অত্যন্ত সুস্পষ্ট, আর এ গ্রন্থের আয়াত সমূহে ঈমানদারদের জন্যে রয়েছে হেদায়েত এবং সুসংবাদ।[৩]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) লিখেছেন, اٰيٰت দ্বারা এ সূরার আয়াত সমূহের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর كتاب مبين দ্বারা লওহে মাহফুজকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, যার মধ্যে পৃথিবীতে যা কিছু হবে সব কিছু লিপিবদ্ধ রয়েছে। যদিও কোরআনে করীমের নাযিল হওয়ার বহু পূর্বেই লওহে মাহফুজ তৈরী হয়ে আছে, কিন্তু মানব জাতির এলমের সম্পর্ক কোরআনের সাথেই রয়েছে, লওহে মাহফুজের সাথে নয়। তাই কোরআনের উল্লেখ আগে করা হয়েছে।

১। তফসীরে আদ দদুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১১
২। তফসীরে হক্কানী, পারা ১৯, পৃষ্ঠা-৩৭
৩। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৬২

অথবা 'কিতাবুন মুবীন' দ্বারাও কোরআনে করীমই উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর যেহেতু কোরআনে করীমে হালাল-হারামের বিবরণকে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, তাই কিতাবের পরে গুণবাচক শব্দ "মুবীন" ব্যবহার করা হয়েছে। যেহেতু কোরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ তাই এর প্রত্যেকটি বিষয় যেমন বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট, তেমনি সন্দেহাতীত। আর এর মোকাবেলা করা কারো পক্ষেই সম্ভব নয়। এতদ্ব্যতীত, কোরআন এবং কিতাব দু'টি শব্দ অর্থের দিক থেকেও অনেক কাছাকাছি এবং অতি সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোরআন অর্থাৎ যা পাঠ করা হয়, বস্তুতঃ পৃথিবীর সকল যুগে সর্বাধিক পঠিত গ্রন্থ পবিত্র কোরআনই আর কিতাব অর্থাৎ যা লিপিবদ্ধ হয়– এ উভয় শব্দই আল্লাহর কিতাব পবিত্র কোরআনেরই নাম। অতএব, আয়াতের অর্থ হলো এ আয়াত সমূহ পবিত্র কোরআন তথা সুস্পষ্ট গ্রন্থেরই।

هُدًى وَّبُشْرٰى لِلْمُؤْمِنِيْنَ

এ গ্রন্থ পথ প্রদর্শক- তথা এটি হেদায়েতের মূর্ত প্রতীক, আর বিশেষতঃ মোমেনদের জন্যে এতে রয়েছে সুসংবাদ। অর্থাৎ এই কিতাব সকলের জন্যেই পথ প্রদর্শক বা হেদায়েত নামা কিন্তু যারা এ মহান গ্রন্থ থেকে হেদায়েত গ্রহণ না করে তারা হেদায়েত পায়না। আর যারা এ গ্রন্থে বর্ণিত বিধান মেনে চলে তথা মোমেনগণ, তাদের জন্য রয়েছে এতে সুসংবাদ, কিন্তু মৌখিক মোমেন হওয়া যথেষ্ট নয়, বরং বাস্তব ক্ষেত্রে ঈমানের পরিচয় দিতে হবে তথা কার্যতঃ মোমেন হতে হবে, তাই পরবর্তী আয়াতে মোমেনদের পরিচয় ঘোষণা করা হয়েছে।

الَّذِيْنَ يُقِيْمُوْنَ الصَّلٰوةَ

প্রকৃত মোমেনের পরিচয়

যারা যথানিয়মে নামায কায়েম করে অর্থাৎ- নামাযের ফরজ, ওয়াজিব, সুন্নত তথা যাবতীয় আরকান-আহকাম যথারীতি পালন করে।

এতে একথা প্রমাণিত হয়, যারা নামাযের সকল শর্ত, নিয়ম-কানুন সঠিক ভাবে আদায় না করে, তারা পূর্ণ মোমেন হতে পারেনা।

وَيُؤْتُوْنَ الزَّكٰوةَ

অর্থাৎ- যারা যথা নিয়মে যাকাত আদায় করে। এভাবে শারীরিক এবং আর্থিক এবাদত করা প্রকৃত মোমেন হওয়ার পূর্ব শর্ত বলে প্রমাণিত হয়। এর পাশাপাশি আরেকটি শর্তও রয়েছে আর তা হলো, আখেরাতের প্রতি পরিপূর্ণ বিশ্বাস। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَهُمْ بِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ

অর্থাৎ তারা আখেরাতের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রাখে।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, তদানীন্তন কালে মক্কার কিছু লোক আল্লাহ পাকের প্রতি বিশ্বাস করতো, এমনকি আল্লাহ পাকের কিছু গুণাবলীর প্রতিও তাদের আস্থা ছিল, কিন্তু আখেরাতকে তারা অবিশ্বাস করতো। তাই সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হয়েছে, পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী তথা হাশর, নশর, হিসাব-কিতাব, জান্নাত, দোযখ সব কিছুর উপর পরিপূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা প্রকৃত মোমেন হওয়ার পূর্ব শর্ত।

কোন কোন তফসীরকার লিখেছেন, যারা যথা নিয়মে নামায এবং যাকাত আদায় করে, তথা ঈমান আনয়নের পর যাবতীয় নেক আমল করে তা একথার প্রমাণ যে তারা আখেরাতে বিশ্বাস করে। যাদের মাঝে উপরোক্ত গুণাবলী বিদ্যমান থাকে, তারাই প্রকৃত মোমেন। আর তাদের জন্যেই রয়েছে সুসংবাদ।

পক্ষন্তরে যারা আল্লাহ পাক ও তাঁর রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের প্রতি ঈমান আনেনা, আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, অবশ্যই তাদের পরিণাম হবে শোচনীয়।[১]

এরশাদ হয়েছে,

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ

"নিশ্চয় যারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা, আমি তাদের দৃষ্টিতে তাদের কর্মকে সুন্দর করে দিয়েছি, তাই তারা বিভ্রান্ত ও দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়ায়"।

এ আয়াতে আখেরাতকে অস্বীকার করার ভয়াবহ পরিণতি বর্ণিত হয়েছে, আখেরাতে অবিশ্বাসের কারণে তাদের মন্দ ও নিন্দনীয় কাজগুলোও তাদের দৃষ্টিতে সুন্দর এবং শোভনীয় মনে হয়। কুপ্রবৃত্তি তাদেরকে পেয়ে বসে, পরিণামে অত্যন্ত মন্দ কাজও তাদের কাছে পছন্দনীয় মনে হয়। তারা লোভ ও মোহে আচ্ছন্ন থাকে, স্বপ্নের ঘোরে জীবন অতিবাহিত করতে চায়। তাই নবী রসূলগণের ঘুম ভাঙানো ডাক তারা শ্রবণ করেনা, নবী রসূলগণের উপদেশকে তারা উপহাস করতে দ্বিধাবোধ করে না।

أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ

(এরাই সে সব লোক, যাদের জন্যে রয়েছে জঘন্যতম আযাব) অর্থাৎ দুনিয়াতে হত্যা, কারাবরণ এবং অপমানজনক শাস্তি।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এতে বদরের যুদ্ধের ঘটনা সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে। কেননা ইসলামের ইতিহাসের প্রথম জেহাদ যা বদর প্রান্তরে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তাতে ৭০ জন কাফের বন্দী হয়েছে, আর ৭০ জন নিহত হয়েছে। অথচ মুসলমানের সংখ্যা ছিল কাফেরদের অনুপাতে অনেক কম।

وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ

"আর তারাই হবে আখেরাতে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত"।

আল্লাহ পাক তাদেরকে সম্মান দিয়েছিলেন, তাদের মাঝেই স্বীয় রসূল পয়দা করেছেন। আর তিনি এমন রসূল, যিনি সমস্ত নবী রসূলগণের দলপতি, যিনি ছিলেন

[১]। আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১, পৃষ্ঠা-৩১-৫০

তাদের জন্যে হিতৈষী, দুনিয়া-আখেরাত উভয় জাহানে তাদেরকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্যে তিনি ছিলেন প্রয়াসী। কিন্তু তারা আল্লাহর নবীর উপদেশকে উপহাস করে, আসমানী কিতাব সম্পর্কে তারা আপত্তিকর মন্তব্য করে, তাদের এ মন্দ আচরণ তাদের নিকট অত্যন্ত সুন্দর, শোভনীয় মনে হয়। ফলে কখনও তা পরিত্যাগ করার কথা তারা চিন্তাও করেনি। এমন অবস্থায় আখেরাতে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। পৃথিবীর যে সব জাতি আখেরাতের প্রতি বিশ্বাস করেনা, তাদের সমস্ত শক্তি এ ক্ষণস্থায়ী জগৎ ও জীবনের উন্নতি সাধনে ব্যয় হয়। যেহেতু তারা আখেরাতে বিশ্বাস করেনা এজন্যে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগী সম্পর্কে তারা কোন প্রস্তুতিও গ্রহণ করেনা। ইউরোপ, আমেরিকা সহ সারা পৃথিবীর একই দুর্গতি, তাদের চোখ ঝলসানো উন্নতি-অগ্রগতি, তাদের মনে শান্তি এনে দিতে পারেনি। তাদের নতুন নতুন মতবাদ তাদেরকে চিন্তার গোলক ধাঁধায় আষ্টে পৃষ্ঠে বেধে রেখেছে, কিন্তু পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে তাদের অশান্তি এতটুকুও কমেনি, আর আখেরাতের কঠিন আযাব তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।[১]

وَإِنَّكَ لَتُلَقَّى الْقُرْآنَ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ ﴿٦﴾ إِذْ قَالَ مُوسَىٰ
لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ
لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿٧﴾ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَ
مَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨﴾ يَا مُوسَىٰ إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ
الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ﴿٩﴾ وَأَلْقِ عَصَاكَ ۚ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ
وَلَّىٰ مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ ۚ يَا مُوسَىٰ لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ
الْمُرْسَلُونَ ﴿١٠﴾ إِلَّا مَن ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي
غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١﴾

তরজমা

(৬) আর (হে রসূল!) নিশ্চয় আপনার নিকট পবিত্র কোরআন এক প্রজ্ঞাময় সর্বজ্ঞ তত্ত্ববিদের নিকট থেকে প্রদত্ত হচ্ছে।

(৭) স্মরণ কর সে সময়কে যখন মূসা তার পরিবারবর্গকে বলেছিলেন, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, অতিসত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর নিয়ে আসবো, অথবা তোমাদের জন্যে আনবো জ্বলন্ত অংগার যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৬৩

(৮) অতঃপর যখন সে তার নিকট পৌঁছে, তখন ঘোষণা করা হয়, ধন্য সে, যে রয়েছে এ অগ্নির মধ্যে এবং যারা আছে তার চারপাশে, বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ্ পাক পবিত্র ও মহিমান্বিত।

(৯) হে মূসা! নিশ্চয় আমি আল্লাহ, পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১০) তুমি তোমার লাঠিটি ফেলে দাও, এরপর যখন সে তাকে সাপের ন্যায় ছুটাছুটি করতে দেখে তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে এবং পেছনের দিকে ফিরেও দেখেনা। হে মূসা! ভয় করোনা। আমার সমীপে রসূলগণ ভয় পায়না।

(১১) কিন্তু হ্যাঁ যদি কারো দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায় এবং সে মন্দ কাজের পর এর পরিবর্তে ভাল কাজ করে, তবে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াময়।

তফসীরুল কোরআন

যারা আখেরাতকে অবিশ্বাস করে, যারা গোমরাহীর অন্ধকারে আছন্ন থাকে, যারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আহ্বানে সাড়া দেয়না, যারা এ ক্ষণস্থায়ী জগত ও ক্ষণভঙ্গুর জীবন নিয়ে ব্যস্ত মুগ্ধ থাকে তাদের শোচনীয় পরিণামের কথা পূর্ববর্তী আয়াতে ঘোষণা করা হয়েছে।

পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ঘোষণা

আর এ আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে পবিত্র কোরআনের মাহাত্ম ঘোষণা করা হয়েছে এ মর্মে যে, (হে রসূল!) যদি দূরাত্মা কাফেররা আপনার হেদায়েত না মানে, যদি তারা পবিত্র কোরআনের মহান বাণী গ্রহণ না করে তবে তাদের জন্যে চিন্তিত হবেন না। কেননা, সর্বশক্তিমান মহান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে মহাগ্রন্থ পবিত্র কোরআন আপনার প্রতি অহরহ নাযিল হচ্ছে। যিনি পরাক্রমশালী, যিনি সর্বজ্ঞ, যাঁর প্রতিটি বিধি-নিষেধ সম্পূর্ণ হেকমতপূর্ণ এবং তাৎপর্য মন্ডিত এবং যিনি তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত পবিত্র কোরআন তাঁরই মহান বাণী যা আপনাকে তিনি দান করছেন। পবিত্র কোরআন সমগ্র মানব জাতির জন্যে চির মুক্তি লাভের মহা সনদ, যা মানুষকে সার্বিক কল্যাণ লাভে উদ্বুদ্ধ করে এবং সর্ব প্রকার অকল্যাণ থেকে আত্মরক্ষা করার পথ নির্দেশ করে। হে নবী! পবিত্র কোরআন আপনাকে আমার নিকট থেকেই প্রদান করা হচ্ছে আর আমি সমগ্র সৃষ্টি জগৎ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত। তাই পবিত্র কোরআনের প্রতিটি নির্দেশ অতুলনীয়, আর এর প্রতিটি বিধান হেকমত পূর্ণ। পবিত্র কোরআনের প্রতিটি বাক্য থেকে জ্ঞানের ফল্গুধারা প্রবাহিত হয়, এতে পূর্বকালের নবী রসূলগণের ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। যেহেতু আপনি আমার সত্য নবী, তাই আপনার নিকট অতীতের ঘটনাবলীর এল্‌ম পৌঁছানো হয়।

বস্তুতঃ পবিত্র কোরআনে একদিকে এ জগত ও জীবন সম্পর্কীয় বিধান পেশ করা হয়েছে, অন্যদিকে পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর জন্যে প্রস্তুতি গ্রহণের পথ-নির্দেশ করা হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ পূর্বকালের নবী রসূলগণের ঘটনাবলী বর্ণনা করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে এ মর্মে যে, যদিও মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে অমান্য করে যার পর নাই কষ্ট দিচ্ছে, কিন্তু এ অবস্থা নতুন কিছু নয়; বরং ইতিপূর্বেও নবী রসূলগণকে এভাবেই কষ্ট দেয়া হয়েছে। এরপর পাঁচটি ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে, যা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ হিসাবে পরিগণিত। এ পর্যায়ে পরবর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ রয়েছে।[১]

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا

স্মরণ কর সেই সময়কে যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বলেছিলেন, আমি আগুন দেখতে পেয়েছি, অতি সত্বর আমি সেখান থেকে তোমাদের জন্যে কোন খবর নিয়ে আসব, অথবা তোমাদের জন্যে আনব জ্বলন্ত অংগার যেন তোমরা আগুন পোহাতে পার।

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন, কিভাবে আল্লাহ পাক তাঁকে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, কিভাবে আল্লাহ পাক তাঁর সঙ্গে কথা বলেছেন এবং তাঁকে বিস্ময়কর মোজেযা দান করেছেন, ফেরাউনের নিকট তাঁকে রসূল হিসেবে প্রেরণ করেছেন, কিন্তু ফেরাউন ও তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা তাঁর নবুওয়্যতকে অস্বীকার করেছে, তারা অহংকার করেছে, হযরত মূসা (আঃ)-এর অনুসরণ করতে রাজী হয়নি তাই এরশাদ হয়েছেঃ

إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ

অর্থাৎ সেই সময়কে স্মরণ কর যখন মূসা তাঁর পরিবারবর্গকে বললেন, আমি আগুন দেখতে পাচ্ছি, সেখান থেকে তোমাদের নিকট কোন খবর অথবা অংগার নিয়ে আসব। বস্তুতঃ হযরত মূসা (আঃ)-এর এ ঘটনায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত হেকমতের বহু জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় এবং সত্য উপলব্ধি করার জন্যে এমন ঘটনার গুরুত্ব সমধিক। হযরত মূসা (আঃ) মাদীয়ান থেকে সপরিবারে মিশর প্রত্যাবর্তন করছিলেন, শীতের রাতে দারুণ অন্ধকার, এমন অবস্থায় হযরত মূসা (আঃ) পথ হারিয়ে ফেলেন, এ সময় তিনি একটু আগুন দেখতে পেলেন, তাই অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে বললেন, তোমরা এখানে অপেক্ষা করো,

سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ

আমি সেখান থেকে তোমাদের নিকট কোন খবর বা জ্বলন্ত অংগার নিয়ে আসব, কেননা পথ হারা হওয়ার কারণে সঠিক পথের সন্ধান করা ছিল একান্ত জরুরী।

১। তানবীরুল মেকবাস মিন তফসীরে এবনে আব্বাস, পৃষ্ঠা-৩১৫
তফসীরে হক্কানী পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৩৮

এতদ্ব্যতীত, তুহিন শীতের মধ্যে তাঁর স্ত্রীর জন্যে একটু আগুনেরও প্রয়োজন অত্যন্ত বেশী।

এদিকে হযরত মূসা (আঃ)-এর সঙ্গে ছাগলের যে পাল ছিল, তা-ও ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। তদুপরি, ঐ অন্ধকার রাতে তাঁর স্ত্রীর প্রসব বেদনা ওঠে, এমন সময় হযরত মূসা (আঃ) কতখানি অস্থির হয়েছিলেন, তা সহজেই অনুমেয়।

فَلَمَّا جَآءَهَا نُوْدِيَ اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا

যখন মূসা (আঃ) আগুনের নিকট পৌঁছেন তখন ঘোষণা করা হয়, আগুন এবং আগুনের আশে পাশে যে কেউ আছে তার উপর বরকত রয়েছে। অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ) যখন আগুনের কাছে পৌঁছলেন তখন তিনি দেখলেন, এ আগুন দুনিয়ার সাধারণ আগুন নয়; বরং তা গায়বী আগুন। আর যে আলো দেখা যায়, তা আদৌ আগুনের আলো নয়; বরং নূরের তাজাল্লী, আল্লাহ পাকের নূর তাতে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। ঐ সময় হযরত মূসা (আঃ) একটি ঘোষণা শুনলেন তা হলো, এই আগুন যে ভূ-খণ্ডে প্রজ্বলিত হয়েছে এর মধ্যকার তাজাল্লী এবং এর আশে পাশে উপস্থিত সকলেই মোবারক, সকলেই ধন্য।

বর্ণিত আছে যে, হযরত মূসা (আঃ) আগুনের কাছে গিয়ে একটি বিস্ময়কর বৃক্ষ দেখলেন, যার উপর থেকে নীচে ছিল সবুজ, অথচ সেই বৃক্ষটি আগুন ছড়াচ্ছিল, আর আগুন যত বৃদ্ধি পাচ্ছিল, বৃক্ষটি ততই সজীব এবং প্রাণবন্ত হচ্ছিল। এরপর হযরত মূসা (আঃ)-কে আল্লাহ পাক ডাক দিয়ে বললেন,

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

"হে মুসা! নিশ্চয় আমিই আল্লাহ, সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান, মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়"।[১]

আর তিনি শুনিয়েছেন তাঁকে অভিনন্দন বাণী, তবে এর পাশাপাশি একথাও মনে রাখতে হবে, আল্লাহ পাক পবিত্র, মহান, তিনি মহিমময়, তিনি সব কিছুর উর্দ্ধে, ঐ আগুনের মধ্যে তাঁর তাজাল্লী প্রকাশ পেয়েছে মাত্র, তিনি তাতে প্রবিষ্ট হননি, কেননা

اَللّٰهُ نُوْرُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

"অর্থাৎ আল্লাহ পাক আসমান জমীনের নূর"।[২]

তিনিই আলোর প্রাণকেন্দ্র। আয়নার সূর্যের প্রতিবিম্ব দেখা যায়, কিন্তু তাই বলে আয়নায় সূর্য প্রবিষ্ট হয়না, এজন্যেই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

---

[১]। হযরত মুসা (আঃ)-এর এ ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-১৬, পৃষ্ঠা-২০১-০৫

[২]। এ বাক্যটির ব্যাখ্যা বিস্তারিত ভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড ১৮, পৃষ্ঠা-২৩৬-৫৬

পবিত্র আল্লাহ পাক, তিনি বিশ্ব প্রতিপালক, তিনি মহান, তিনি সর্বত্র বিরাজমান।

মুসলিম শরীফে হযরত আবু মূসা আশআরী (রাঃ) বর্ণিত হাদীস সংকলিত হয়েছে, তিনি বলেছেন, একটি মজলিশে দাঁড়িয়ে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম পাঁচটি কথা বলেছেন, আল্লাহ পাক নিদ্রিত হননা, আর নিদ্রা তাঁর শানের পরিপন্থী, তিনিই দাঁড়িপাল্লাকে উঁচু-নীচু করেন (অর্থাৎ কারো নেয়ামত কমিয়ে দেন, কারো বাড়িয়ে দেন, কাউকে অপমানিত করেন আবার কাউকে সম্মানিত করেন)। তাঁর সমীপে মানুষের রাতের আমল দিনের আমলের পূর্বে এবং দিনের আমল রাতের আমলের পূর্বে পেশ করা হয়। তাঁর হিজাব হলো নূর, যদি তা উম্মুক্ত হয় তবে যে পর্যন্ত তাঁর দৃষ্টি পৌঁছে, সে পর্যন্ত (সমগ্র বিশ্ব) জ্বলে ছাই হয়ে যাবে।[১] বিখ্যাত তফসীরকার সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন হযরত মূসা (আঃ) যা দেখেছিলেন, তা বস্তুতঃ অগ্নিই ছিল যা আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার জন্যে হিজাব ছিল। যেহেতু এ আয়াতের ব্যাখ্যায় কারো মনে এ সন্দেহ হতে পারে যে, আল্লাহ পাকের পবিত্র সত্ত্বার জন্যে কোন স্থান বা আকৃতির প্রয়োজন রয়েছে, অথচ আল্লাহ পাক সকল ত্রুটি থেকে পবিত্র, তাঁর পবিত্র সত্ত্বার জন্যে তাঁর বিশেষ কোন স্থান বা আকৃতির প্রয়োজন হয় না, এজন্যেই এরশাদ হয়েছেঃ

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

পবিত্র মহান আল্লাহ পাক, তিনিই সমগ্র বিশ্ব জগতের প্রতিপালক।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের بُوْرِكَ مَنْ فِى النَّارِ এর অর্থ হলো, بُوْرِكَ مَنْ فِى طَلَبِ النَّارِ অর্থাৎ যে আগুনের অনুসন্ধানে রয়েছে সে মোবারক, এমন অবস্থায় এর দ্বারা হযরত মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ যারা তার চারিপার্শ্বে রয়েছে, এর দ্বারা ফেরেশতাদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে এ বাক্যটির মাধ্যমে হযরত মূসা (আঃ)-কে বরকতের বাণী তথা অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়েছে, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী রয়েছেন, مَنْ فِى النَّارِ (যে আগুনে রয়েছে) দ্বারা ফেরেশতাদেরকে বোঝানো হয়েছে কেননা, ফেরেশতাগণ ঐ অগ্নির মধ্যে আল্লাহ পাকের হাম্‌দ ও তসবীহ বর্ণনায় মশগুল ছিল।

وَمَنْ حَوْلَهَا

অর্থাৎ আগুনের চারিপার্শ্বে যা রয়েছে বলে হযরত মূসা (আঃ)-কে উদ্দেশ্য করা হয়েছে, কেননা তিনিই আগুনের কাছে ছিলেন। এ আয়াতের মধ্যে হযরত মূসা (আঃ)-এর জন্যে রয়েছে সুসংবাদ। আর وَمَنْ حَوْلَهَا শব্দ দ্বারা সমগ্র সিরিয়াকে বোঝানো

[১]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৫৯
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২০

হয়েছে, এর দ্বারা ইঙ্গিত করা হয়েছে হযরত মূসা (আঃ)-কে এ মর্মে যে, তোমার ঘটনা হবে অত্যন্ত তাৎপর্যবহ আর তোমার বরকত সমগ্র সিরিয়ায় সম্প্রসারিত হবে। এরপর

وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

দ্বারা আল্লাহ পাকের পবিত্রতা ঘোষণা করা হয়েছে যে, তিনি সর্ব প্রকার ত্রুটি থেকে মুক্ত এবং পবিত্র এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর ঘটনা যা পরবর্তীতে ঘটবে, তার শ্রেষ্ঠত্বও সকলে উপলব্ধি করবে।

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

হে মূসা! এটিই বাস্তব, আমিই স্বয়ং আল্লাহ, মহা পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, আমার প্রতিটি কথা, কাজ এবং সিদ্ধান্ত এমনি হেকমত পূর্ণ যে, অন্যদের জন্যে তা সম্পূর্ণ অচিন্তনীয়। যেমন, একটি লাঠিকে অজগরে পরিণত করে দেয়া।

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, نودى অর্থাৎ হযরত মূসা (আঃ)-কে আহ্বান করা হয়েছে, স্বভাবতঃ তাঁর মনে এ প্রশ্ন উত্থিত হয়েছে, কে ডাক দিয়েছে? তারই জবাবে আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

يٰمُوْسٰٓى اِنَّهٗٓ اَنَا اللّٰهُ

"হে মূসা! তোমাকে আহ্বানকারী আমিই আল্লাহ"।

الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

(আমি তোমার প্রতিপালক) আমি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়, যিনি তোমাকে আহ্বান করে সম্মানিত করেছেন এবং তোমাকে স্বীয় নবী ও রসূল মনোনীত করেছেন। মানুষকে সত্য পথের সন্ধান দেয়া তোমার দায়িত্ব। আমার ইচ্ছা হলো নবুওয়্যত ও রেসালতের প্রমাণ হিসেবে তোমাকে কিছু মোজেযা প্রদান করি, এরশাদ হয়েছেঃ

وَاَلْقِ عَصَاكَ

হে মূসা! তোমার লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও,

فَلَمَّا رَاٰهَا تَهْتَزُّ كَاَنَّهَا جَآنٌّ

এরপর যখন সে তাকে সাপের ন্যায় ছুটোছুটি করতে দেখে তখন সে পৃষ্ঠ-প্রদর্শন করে পলায়ন করে, ক্ষণিকের মধ্যে ঐ লাঠিটি সাপের মত ফণা তুলে এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে থাকে এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই বিরাট অজগরের আকার ধারণ করে ফেলে, স্বভাবতঃই এমন ভয়াবহ দৃশ্য দেখলে ভয় পাওয়ার কথা, এমন ভয় পয়গম্বরীর মর্যাদার পরিপন্থীও নয়, তাই এরশাদ হয়েছে,

وَّلّٰى مُدْبِرًا وَّلَمْ يُعَقِّبْ

অর্থাৎ তখন সে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করে এবং পেছনের দিকে ফিরেও দেখেনা, এমন অবস্থায় আল্লাহ্ পাক হযরত মূসা (আঃ)-কে অভয় দান করে এরশাদ করেনঃ

يٰمُوْسٰى لَا تَخَفْ

(হে মূসা! ভয় করোনা)

اِنِّىْ لَا يَخَافُ لَدَىَّ الْمُرْسَلُوْنَ

"আমার সান্নিধ্যে পয়গম্বরগণ কোন কিছুকেই ভয় করেনা"।

অর্থাৎ যে পয়গম্বর আমার বাণী মানুষকে পৌঁছে দেয়, সে শুধু আমাকেই ভয় করে, অন্য কিছুকে নয়। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

انا اخشىٰكم بالله

'আমি আল্লাহ্ পাককে তোমাদের চেয়ে অধিকতর ভয় করি'। এর তাৎপর্য কি? তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, পয়গম্বরগণ আল্লাহ্ পাককে সবচেয়ে বেশী ভয় করেন কেননা, আল্লাহ্ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে তাঁরা সবচেয়ে বেশী অবগত। কিন্তু যখন কোন নবী রসূল আল্লাহ্ পাকের নৈকট্য-ধন্য হন, তখন আল্লাহ্ পাক ব্যতীত অন্য কোন সৃষ্টিকে তাঁরা ভয় করেন না। অথবা এর অর্থ হলো, যখন তাঁদের উপর কোন ওহী নাযিল হয়, তখন তাঁরা এতো তন্ময় হয়ে পড়েন যে তাঁদের কোন ভয়ই থাকে না।

অথবা এর অর্থ হলো, নবী রসূলগণের অবস্থা এই যে, তাদের পরিণাম মন্দ হবার কোন আশঙ্কা থাকে না, কেননা তাঁরা আল্লাহ্ পাকের এত নৈকট্য-ধন্য হন যে, তাঁদের পরিণাম কখনো মন্দ হয় না।[১]

اِلَّا مَنْ ظَلَمَ ثُمَّ بَدَّلَ حُسْنًا بَعْدَ سُوْٓءٍ فَاِنِّىْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

"কিন্তু হ্যাঁ যদি কারো দ্বারা কোন ত্রুটি হয়ে যায় এবং সে মন্দ কাজের পর এর পরিবর্তে ভাল কাজ করে তবে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান"।

অর্থাৎ যারা অপরাধী, যারা জুলুম করে, যারা সীমা লঙ্ঘন করে তারাই ভয় করে, তবে তাদের জন্যে ক্ষমা লাভের ব্যবস্থা রয়েছে, যদি তারা মন্দ কাজ থেকে তওবা করে এবং মন্দ কাজের পর ভাল কাজ করে, আত্মশুদ্ধি লাভ করে এবং তওবা করে তবে আমি তাকে ক্ষমা করি, নিশ্চয় আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-২২

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, এ বাক্যে ইঙ্গিত রয়েছে হযরত মূসা (আঃ)-এর জীবনের একটি ঘটনার দিকে। হযরত মূসা (আঃ) এক কিবতীকে আঘাত করেছিলেন, ঘটনাক্রমে সেই আঘাতে লোকটি মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এটি ছিল তাঁর অনিচ্ছাকৃত একটি কাজ, ঐ ব্যক্তি হযরত মূসা (আঃ)-এর সম্প্রদায় বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তির উপর জুলুম করছিল, হযরত মূসা (আঃ) তাকে ঐ জুলুম থেকে বিরত রাখার জন্যে মৃদু আঘাত করেছিলেন, কিন্তু ঐ আঘাতেই লোকটির মৃত্যু হয়। লোকটিকে হত্যার ইচ্ছা কোনভাবেই হযরত মূসা (আঃ)-এর ছিলনা, ভুলবশতঃ এ কাজটি হযরত মূসা (আঃ)-এর দ্বারা হয়ে যায়, তাঁর অন্তরে এ বিষয়েরই ভয় ছিল। তাই আল্লাহ পাক এরশাদ করেছেনঃ

إِلَّا مَنْ ظَلَمَ

তবে হ্যাঁ যে জুলুম করে, তথা যার দ্বারা ভুল-ত্রুটি হয়ে যায় এবং সে তওবা করে ফেলে, আর আত্ম সংশোধন করে, তবে আল্লাহ পাক তাকে ক্ষমা করে দেন। কেননা, তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল, অতীব দয়াবান।

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجْ بَيْضَاءَ مِنْ
غَيْرِ سُوءٍ ۖ فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا فَاسِقِينَ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَٰذَا
سِحْرٌ مُبِينٌ ﴿١٣﴾ وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ۚ
فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ﴿١٤﴾ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَ
سُلَيْمَانَ عِلْمًا ۖ وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَىٰ كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ
الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا
مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۖ إِنَّ هَٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

তরজমা

(১২) এবং তোমার হাত তোমার বক্ষ পার্শ্বে জামার ভেতর প্রবেশ করাও, তা নির্দোষ অবস্থায় সমুজ্জ্বল হয়ে বেরিয়ে আসবে। এ দু'টি সহ নয়টি মোজেযা নিয়ে ফেরাউন ও তার জাতির নিকট যাও, নিশ্চয় তারা নাফরমান জাতি।

(১৩) এরপর যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শন সমূহ পৌঁছলো, তখন তারা বললো এ-তো সুস্পষ্ট যাদু।

(১৪) তারা অন্যায় এবং অহংকার করে ঐ নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করলো, যদিও তাদের অন্তর এগুলোকে সত্য বলে গ্রহণ করেছিল, অতএব অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল তা লক্ষ্য করে দেখ।

(১৫) আর নিশ্চয় আমি দাউদ এবং সোলায়মানকে জ্ঞান দান করি এবং তারা উভয়ে বলেঃ সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ পাকের জন্যে, যিনি তাঁর বহু মোমেন বন্দার উপর আমাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(১৬) আর সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হয় এবং সে বলেছিল, হে জনগণ! আমাকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে, আর আমাকে সব কিছু থেকে দেয়া হয়েছে, নিশ্চয় এটি প্রকাশ্য মর্যাদা, সুস্পষ্ট অনুগ্রহ।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত মূসা (আঃ)-এর লাঠির মোজেযার উল্লেখ ছিল, আর এ আয়াতে তাঁর হাত শুভ্র ও জ্যোতির্ময় হবার বিবরণ রয়েছে। যদিও ইতিপূর্বে সূরা আ'রাফ, সূরা তোয়াহা এবং সূরা শুআরায় এ মোজেযার বিবরণ বিস্তারিত ভাবে স্থান পেয়েছে, কিন্তু এ আয়াতে এ মোজেযার এক বিশেষ দিকের উল্লেখ করা হয়েছে তা হলো, হযরত মূসা (আঃ) যখন তাঁর হাতটি বের করলেন তখন তা ছিল অত্যন্ত আলোকময়, এমনকি সূর্যের কিরণের চেয়েও অধিকতর আলোকময়। হযরত মূসা (আঃ)-এর হাত জামার ভেতর থেকে বের হবার সঙ্গে সঙ্গে এত শুভ্র সুন্দর হতো যে, যে দেখতো সে-ই আকৃষ্ট হতো।

مِنْ غَيْرِ سُوْٓءٍ

আর তা কোন দোষ বা রোগের কারণে নয়; কেননা শ্বেত রোগ হেতুও কখনো মানব দেহের অংশ বিশেষ সাদা হয়ে যায়। কিন্তু হযরত মূসা (আঃ)-এর হাত সমুজ্জ্বল হওয়া কোন রোগের কারণে ছিলনা; বরং এটি ছিল আল্লাহ পাকের কুদরতের বহিঃপ্রকাশ এবং হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা।

فِيْ تِسْعِ اٰيٰتٍ اِلٰى فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهٖ

অর্থাৎ-উপরোল্লিখিত দু'টি মোজেযা সহ আরো সাতটি মোজেযা হযরত মূসা (আঃ)-কে দেয়া হয়েছিল। মোট এই নয়টি মোজেযা নিয়ে ফেরাউনের নিকট যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করা হয়েছিল হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি।

اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا فٰسِقِيْنَ

কেননা, তারা ছিল অত্যন্ত অপরাধী জাতি। এ বাক্যে হযরত মূসা (আঃ)-কে ফেরাউনের নিকট প্রেরণের কারণ বর্ণিত হয়েছে, কেননা আল্লাহ পাক অন্য আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا

(সূরা বনী ইসরাঈল)

"আর আমি কোন জাতিকে শাস্তি প্রদান করি না, যে পর্যন্ত না তাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করি"।

অর্থাৎ কোন জাতি যখন সামগ্রিক ভাবে অপরাধে লিপ্ত হয় এবং তা শাস্তিযোগ্য বলে বিবেচিত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ্ পাক তাদের শাস্তি বিধান করেন না; বরং তিনি তাদের হেদায়েতের উদ্দেশ্যে রসূল প্রেরণ করেন, তাঁদেরকে মোজেযা দান করা হয় যাতে করে তাঁদের প্রতি ঈমান আনয়ন সহজ হয়, কিন্তু যখন কোন জাতি নবী রসূলগণকে অমান্য করে, তাঁদের মোজেযাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কোন অবস্থাতেই সঠিক পথ গ্রহণে প্রস্তুত না হয়, তখন তাদের ব্যাপারে শাস্তি বিধানের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ফেরাউন ও তার জাতির ব্যাপারেও তাই হয়েছিল।

فَلَمَّا جَآءَتْهُمْ اٰيٰتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوْا هٰذَا سِحْرٌ مُّبِيْنٌ

"এরপর যখন তাদের নিকট আমার নিদর্শন সমূহ পৌঁছল তখন তারা বলল, এ-তো সুস্পষ্ট যাদু"।

আয়াতের মর্মকথা

হযরত মূসা (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে আদেশ হয়েছে যে, তোমার হাতের লাঠিটি মাটিতে ফেলে দাও, তিনি আদেশ পালন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে লাঠিটি এক বিরাট অজগরে পরিণত হলো এবং এদিক সেদিক ছুটোছুটি করতে লাগল, এরপর আল্লাহ্ পাক আদেশ দিলেন, হে মূসা! তোমার হাতটি বক্ষ পার্শ্বে জামার ভেতর প্রবেশ করাও, যখন হাত বের করলেন, তখন তা ছিল অত্যন্ত সমুজ্জ্বল এবং জ্যোতির্ময়। তখন আল্লাহ্ পাক আদেশ দিলেন, এ দু'টি মোজেযা এবং অন্যান্য মোজেযা সহ তুমি ফেরাউনের নিকট যাও এবং তাদেরকে সরল সঠিক পথ গ্রহণের আহ্বান জানাও। হযরত মূসা (আঃ) আল্লাহ্ পাকের নির্দেশ মোতাবেক ফেরাউনে নিকট গমন করলেন এবং তাকে সত্য গ্রহণের আহ্বান জানালেন, কিন্তু তারা সে আহ্বানে সাড়া দিতে রাজী হলোনা; বরং তারা হযরত মূসা (আঃ)-কে মিথ্যাজ্ঞান করল, তাই এরশাদ হয়েছে।

وَجَحَدُوْا بِهَا

তারা এ নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করল, অর্থাৎ এসব কিছু যে মহান আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকে একথা তারা বিশ্বাস করলো না।

وَاسْتَيْقَنَتْهَآ اَنْفُسُهُمْ

অথচ তাদের মনের গোপনতম প্রকোষ্ঠে এ বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছিল যে, হযরত মূসা (আঃ)-এর মাধ্যমে যে সব অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে, তা সবই আল্লাহ্ পাকের তরফ

থেকে হয়েছে এবং সবই সত্য, কিন্তু এতদসত্ত্বেও তারা এ সত্য গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়, আর এ অস্বীকৃতি দু'টি কারণ ছিল,

ظُلْمًا وَّ عُلُوًّا

এক, জুলুম অত্যাচার দুই, অহংকার, যে কারণে তারা সত্য গ্রহণ অস্বীকৃতি জানিয়েছে। আর এ জুলুম তারা নিজেদের প্রতিই নিজেরা করেছে। কেননা, হযরত মূসা (আঃ)-কে অবিশ্বাস করার কারণে তারা চিরদিন দোযখের শাস্তি ভোগ করবে। আর তাদের অন্তর্নিহিত অহংকারের কারণে তারা সত্যকে অস্বীকার করল।

অর্থাৎ- হযরত মূসা (আঃ)-এর মোজেযা দেখার পর তাদের অন্তরে বিশ্বাস জন্মেছিল, কিন্তু তাদের অহংকারী মন কোন অবস্থাতেই তাঁকে আল্লাহর রসূল মেনে নিতে প্রস্তুত হলোনা। হযরত মূসা (আঃ)-কে স্বীকৃতি দিতে তারা তাদের অপমান মনে করতো, অবশেষে আল্লাহ পাকের হুকুমে তাদের সকল অহংকার দূরীভূত হলো, লোহিত সাগরের অতল তলে তারা নিমজ্জিত হলো।

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِيْنَ

অতএব, প্রত্যেকেরই লক্ষ্য করা উচিত যে, অশান্তি সৃষ্টিকারী দূরাত্মা কাফেরদের পরিণাম কত ভয়াবহ হয়েছে। দুনিয়াতে লোহিত সাগরে ডুবিয়ে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে এবং এরপর দোযখে পৌঁছে দেয়া হয়েছে।

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

"আর নিশ্চয় আমি দাউদ এবং সোলায়মানকে জ্ঞান দান করি"।

আল্লাহ্ পাকের বিশেষ দান

এ আয়াত সমূহে আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ) এবং তাঁর সুযোগ্য পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে যে অনন্য-সাধারণ গুণ জ্ঞান এবং অসংখ্য নেয়ামত দানে ভূষিত করেছিলেন তার উল্লেখ করেছেন।

আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে নবুওয়্যত, শরীয়তের এলম এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তথা রাজত্বও দান করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত, তাঁকে বিশেষভাবে অনেক অলৌকিক ক্ষমতাও দান করেছিলেন, তিনি যখন লৌহ খন্ডকে স্পর্শ করতেন, তা নরম হয়ে যেত এবং যুদ্ধ-সামগ্রী তৈরী করা সহজ হতো এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে জেহাদে সহায়ক হতো। এভাবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক পাখীদের ভাষা বুঝবার ক্ষমতা দিয়েছিলেন এবং জ্বীনদেরকে তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন, আর বাতাসকে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন করে দিয়েছিলেন। এতদ্ব্যতীত, আল্লাহ পাক আরও বহু মোজেযা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে দিয়েছিলেন। এসবই ছিল হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ। আর তাঁদেরকে যে রাজত্ব দেয়া হয়েছিল তা দুনিয়ার অন্যান্য রাজত্বের ন্যায় ছিলনা; বরং ঐ রাজত্ব ছিল তাঁদের প্রতি আল্লাহ

পাকের বিশেষ দান এবং তাঁদের মোজেযা, আর তাঁদের নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ। তাঁদেরকে আল্লাহ্ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের নেয়ামতকে একত্রিত করে দিয়েছিলেন। তাই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ) ও সোলায়মান (আঃ)-কে শুধু যে অনন্ত অসীম নেয়ামত দান করেছেন তাই নয়; বরং তাঁদেরকে এজন্যে শোকর গুজারীরও তৌফিক দান করেছেন, তাঁরা উভয়ে সর্বদা আল্লাহ্ পাকের নেয়ামতের শোকর গুজারীতে রত থাকতেন। তাই আল্লাহ্ পাক তাঁদের শোকর গুজারীর কথা এরশাদ করেছেনঃ

وَقَالَا الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ فَضَّلَنَا عَلٰى كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِيْنَ

"আর তারা বলে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্ পাকের, যিনি আমাদেরকে তাঁর বহু মোমেন বন্দাদের উপর বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন"।

শোকর গুজারীর মাহাত্ম

হযরত ওমর এবনে আবদুল আজীজ (রঃ) বলেছেন, আল্লাহ্ পাক যদি কোন বন্দাকে কোন নেয়ামত দান করেন, আর সে বন্দা আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ পেশ করে তবে তাকে প্রদত্ত নেয়ামতের চেয়েও ঐ হাম্‌দ উত্তম বলে বিবেচিত হয়। এরপর তিনি আলোচ্য আয়াতের উল্লেখ করেন এবং বলেন যে, আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি তাঁর নেয়ামত উল্লেখের পাশাপাশি তাঁদের শোকর গুজারীর কথাও উল্লেখ করেছেন, আর আল্লাহ্ পাক একথাও বলেছেন,

لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ

"যদি তোমরা আমার শোকর আদায় কর, তবে আমি তোমাদের প্রতি আমার নেয়ামত বৃদ্ধি করে দেব"।

বর্ণিত আছে, হযরত দাউদ (আঃ)-কে আল্লাহ্ পাক একবার নির্দেশ দিয়েছিলেন, হে দাউদ! তোমাকে আমি অনেক নেয়ামত দান করেছি, তুমি আমার শোকর আদায় কর। হযরত দাউদ (আঃ) আরজী পেশ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার প্রতি তোমার নেয়ামত অনন্ত অসীম, কিন্তু এতদসত্ত্বেও আমি শোকর আদায় করতে অক্ষম। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেন, হে দাউদ! তোমাকে আমি এত নেয়ামত দান করেছি, তবুও আমার শোকর গুজারীতে তুমি কেন অক্ষম? দাউদ (আঃ) আরজ করলেন, হে পরওয়ারদেগার! আমি যখন তোমার কোন নেয়ামতের শোকর গুজারীর ইচ্ছা করি, তখন দেখি তোমার তরফ থেকে তৌফিক না পেয়ে শোকর আদায় করতে পারি না, অতএব, তোমার শোকর গুজারীর তৌফিকও একটি স্বতন্ত্র নেয়ামত, এভাবে যখনই আমি তোমার কোন নেয়ামতের শোকর আদায় করতে চাই তখন দেখি তোমার নেয়ামতের ফিরিস্তি সুদীর্ঘ হয়ে যায়, আর আমার শোকর গুজারীর শক্তি সংকুচিত হয়ে যায়, আর এ কারণেই তোমার শোকর গুজারীর হক্ব আদায় করতে আমি অক্ষম।

তখন আল্লাহ্ পাক এরশাদ করলেনঃ হে দাউদ! তুমি যে আমার শোকর আদায় করতে অক্ষম বলে উপলব্ধি কর, এটিই আমার শোকর গুজারী।

আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোয়লামান (আঃ)-কে গুণ জ্ঞানে ভূষিত করার কথা ঘোষণা করেছেন। অর্থাৎ মহান আল্লাহ্ পাকের পবিত্র সত্ত্বা ও গুণাবলী সম্পর্কে মানুষের পক্ষে যা জানা সম্ভব এমন এলম তাদেরকে প্রদান করা হয়েছে। এমনিভাবে শরীয়তের বিধান হালাল হারামের বিবরণ, আখেরাত তথা পরকালীন চিরস্থায়ী জিন্দেগীর অবস্থা, পশু-পক্ষীর ভাষা, পাহাড়-পর্বতের তসবীহ্ পাঠের এলম এবং লোহাকে নরম করার বিশেষ জ্ঞান সবই আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে দান করেছেন। আল্লামা সানাউল্লাহ্ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, আলোচ্য আয়াতে قالا শব্দের পূর্বে ف হওয়া স্বাভাবিক ছিল, কিন্তু যেহেতু এই শব্দটির পূর্বে ف ব্যবহৃত হয়নি তাই একথা প্রমাণিত হয়, এখানে কোন কথা গুপ্ত আছে, এর পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, আমি দাউদ ও সোলায়মান (আঃ)-কে এলম দান করেছি, আর গুপ্ত কথাটি হলোঃ এবং তারা উভয়ে ঐ এলম মোতাবেক আমল করেছে এবং নেয়ামতের হক্ব উপলব্ধি করে উভয়ে আল্লাহর শোকর আদায় করে বলেছে, আলহামদুলিল্লাহ!

এলমের ফজিলত

এ আয়াত দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় যে, এলমের মর্যাদা সর্বাধিক কেননা, আল্লাহ্ পাক হযরত দাউদ (আঃ) ও সোলায়মান (আঃ)-কে অনেক নেয়ামত দান করেছেন, এমনকি রাজত্বও দান করেছেন, কিন্তু আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁদেরকে এলম প্রদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন। এভাবে এর দ্বারা অন্যদের উপর ওলামায়ে কেরামের ফজিলত প্রমাণিত হয়। হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, একজন এবাদতকারীর উপর আলেমের ফজিলত এমনই যেমন অন্যান্য তারকার উপর চৌদ্দ তারিখের চন্দ্রের ফজিলত রয়েছে।

এতদ্ব্যতীত, আলেমগণ আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী হন। আম্বিয়ায়ে কেরাম ধন-দৌলত রেখে যান না। তাঁরা রেখে যান এলম, যারা খাঁটি আলেম হয় তারাই আম্বিয়ায়ে কেরামের উত্তরাধিকারী হয়, অতএব তারা হয় অত্যন্ত ভাগ্যবান, কেননা তারা অত্যন্ত বড় উত্তরাধিকার লাভ করে। (আহমদ, তিরমিযী, আবু দাউদ, এবনে মাজা)

প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ একজন এবাদতকারীর উপর আলেমের ফজিলত এমনই, যেমন একজন সাধারণ মানুষের উপর আমার (প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের) ফজিলত। (তিরমিযী)

আলোচ্য আয়াতে এলমের নেয়ামতের শোকর আদায় করার জন্যে বিশেষভাবে উদ্বুদ্ধ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি এ শিক্ষাও দেয়া হয়েছে যে, মানুষ যত মর্যাদাই লাভ করুক না কেন তার কর্তব্য হল বিনয়ী হওয়া, কেননা প্রত্যেকেরই এ সত্য উপলব্ধি করা দরকার যে, অনেক লোকের এলম তার চেয়ে বেশী রয়েছে, প্রত্যেক আলেমের চেয়ে বড় আলেম রয়েছে।[১]

---

[১]। আরও বিস্তারিতভাবে জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খণ্ড-১৭, পৃষ্ঠা-১০৫-১৪
তফসীরে মাজহারী, খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬

فوق كل ذى علم عليم

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

এবং সোলায়মান দাউদের উত্তরাধিকারী হন এবং বলেন, আমাকে পাখীর ভাষা শেখানো হয়েছে, আর আমাকে প্রদান করা হয়েছে সব কিছু।

তফসীরকারগণ এ সম্পর্কে সম্পূর্ণ একমত যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর নবুওয়্যত, এলম, হেকমত এবং বাদশাহাতের উত্তরাধিকারী ছিলেন। আল্লাহ পাক তাঁকে নবুওয়্যত ও রাজত্ব দু'ই দান করেছিলেন। ইতিপূর্বে বা তাঁর পরেও কেউ এমন সৌভাগ্য লাভ করেননি, আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এর চেয়ে বাড়তি আরও কিছু দিয়েছিলেন, আর তা হল দুর্বৃত্ত জ্বীন সম্প্রদায়কে এবং উড়ন্ত পাখীগুলোকে তাঁর একান্ত অনুগত করে দিয়েছিলেন। বাতাসকে করেছিলেন তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন, এসবই ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মোজেযা, তাঁর প্রতি আল্লাহ পাকের বিশেষ দান। আর তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوٗدَ

হযরত সোলায়মান (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর উত্তরাধিকারী হয়েছেন। প্রশ্ন হল কিসের উত্তরাধিকারী হয়েছেন? হযরত দাউদ (আঃ)-এর অর্থ-সম্পদের? না অন্য কিছুর। ইতিহাসবেত্তাগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হযরত দাউদ (আঃ)-এর পুত্রদের সংখ্যা ছিল ১৯ জন। পিতার অর্থ-সম্পদের উত্তরাধিকারী হন সকল সন্তান, আর এটি স্বাভাবিক নিয়ম। এমন অবস্থায় কোরআনে করীমের এ আয়াতে উত্তরাধিকারীত্বের খবর দেয়ার আদৌ প্রয়োজন হয়না। এতে একথাই প্রমাণিত হচ্ছে হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পিতা দাউদ (আঃ)-এর এলম, হেকমত, নবুওয়্যত তথা যাবতীয় গুণ জ্ঞানের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন, কেননা পিতার মৃত্যুর পর সন্তানেরা তার এলম এবং গুণাবলীর উত্তরাধিকারী হবে এটি জরুরী নয়, ক্ষেত্রেবিশেষে হতেও পারে, না-ও হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেন হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর পিতার এলম হেকমত ও নবুওয়্যতের উত্তরাধিকারী হয়েছিলেন। হযরত দাউদ (আঃ) এবং তাঁর পুত্র হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামতের জন্যে সর্বদা শোকর গুজার থাকতেন।[১]

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-কে যে সব নেয়ামত দান করেছেন, তা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কেও দান করেছিলেন।

তফসীরে কবীর খণ্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৮৫

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-২৬-২৭
তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬১-৬২
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খণ্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১২

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্ব আরও বেশী সম্প্রসারিত ছিল। হযরত দাউদ (আঃ) ও হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক দুনিয়া আখেরাত উভয় জাহানের নেয়ামত দান করেছিলেন।

وَقَالَ يَاأَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেছিলেন যে, "হে জনগণ! আমাকে পাখীদের ভাষা শেখানো হয়েছে"।

ইমাম রাজী (রঃ) এ আয়াতের তফসীরে লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর জনগণকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাকের নেয়ামতের প্রচার করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করেছিলেন।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) এভাবে একদিকে আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করছিলেন, অন্যদিকে তাঁর এ মোজেযার সত্যতা উল্লেখ করে মানুষকে বিশ্বাস করার আহ্বান জানিয়েছিলেন।

পাখীদের ভাষা

হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীদের ভাষা বুঝতেন। তিনি পাখীদের আওয়াজ শ্রবণ করে তার অর্থ অনুধাবন করতেন। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত কা'ব (রাঃ) বলেছেনঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট অরণ্যের কবুতর আওয়াজ দিল। তিনি লোকদেরকে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান সে কি বলেছে? উপস্থিত লোকেরা বলল না। তখন তিনি বললেন এ কবুতরটি বলেছে মৃত্যুবরণ করার জন্যেই জীবন-যাপন কর, আর বিরাণ হওয়ার জন্যেই ইমারত নির্মাণ কর।

আরেকটি পাখী চিৎকার দিল, হযরত সোলায়মান (আঃ) জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান? সে কি বলেছে। তারা বলল, না। তিনি বললেন সে বলেছে হায় আক্ষেপ! যদি বিশ্ব জগত সৃষ্টি না করা হত।

এরপর ময়ুর চিৎকার দিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেনঃ তোমরা কি জান? সে কি বলেছে। উত্তরে তারা বললো না। তিনি বললেন ঃ সে বলেছে, তোমরা অন্যদের সঙ্গে যেমন ব্যবহার করবে তোমাদের সাথেও তেমনি ব্যবহার করা হবে।

এরপর হুদ হুদ কথা বলল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জান? সে কি বলেছে? উপস্থিত লোকেরা বলল না, তিনি বললেনঃ সে বলেছে যে দয়া করে না, তার প্রতিও দয়া করা হবে না।

এরপর আরেকটি পাখী আওয়াজ দিল, তিনি বললেনঃ তোমরা কি জান সে কি বলেছে? তারা বলল না। তখন তিনি বললেন, সে বলেছে হে পাপীষ্ঠরা! আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থী হও।

এরপর আরেকটি পাখী চিৎকার দিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কি জান? সে কি বলেছে? তারা বলল না। তখন তিনি বললেন, সে বলেছে প্রত্যেক জীবিত ব্যক্তিই মৃত্যুমুখে পতিত হবে এবং প্রত্যেক নতুন বস্তু পুরাতন হবে।

এরপর আরেকটি পাখী চিৎকার দিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জান সে কি বলেছে? লোকেরা বলল, না। তখন তিনি বললেন ঃ সে বলেছে পূর্বাহ্নে নেক আমল করে পাঠাও, সেখানে পেয়ে যাবে।

এরপর আরেকটি পাখী আওয়াজ দিল, হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন তোমরা কি জান সে কি বলেছে? লোকেরা বলল না। তখন তিনি বললেন, সে বলেছে আমার প্রতিপালকের এত পবিত্রতা বর্ণনা কর যা আসমান ও জমিনকে পরিপূর্ণ করে দেয়।

এভাবে কাক যখন আওয়াজ দেয় তখন তিনি বলেন, সরকারী কর আদায়কারীকে সে বদ দোয়া দেয়। আর চিল বলে, আল্লাহ্ পাক ব্যতীত আর সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অন্য একটি পাখী কথা বললে, তিনি বললেন, সে বলেছে যে নীরব রয়েছে সে নিরাপদ রয়েছে।

আর তোতা বলেছে, ধ্বংস সে ব্যক্তির জন্যে, শুধু দুনিয়াই যার উদ্দেশ্য।

আর অন্য একটি পাখী বলেছে, আমার প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা কর। তাঁর প্রশংসা কর, যার আলোচনা সকলের রসনায় রয়েছে।

তফসীরকার মকহুল (রঃ) বলেছেনঃ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট একটি পাখী চিৎকার দিল, তিনি জিজ্ঞাসা করলেন তোমরা কি জান পাখীটি কি বলেছে? লোকেরা বলল না, তখন তিনি বললেন, সে বলেছে দয়াময় আল্লাহ পাক আরশের উপর আসন গ্রহণ করেছেন। হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাঃ) তাঁর পিতার সূত্রে তাঁর পিতামহ হযরত ইমাম হোসাইন (আঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, তিনি বলেছেন, গাধা যখন চিৎকার করে তখন সে বলে, হে আদম সন্তান! যে ক'দিন তোমার সময় আছে জীবন-যাপন কর, অবশেষে মৃত্যু অবশ্যম্ভারী।

ঈগল চিৎকার দিয়ে বলে, মানুষ থেকে দূরে থাকার মধ্যেই রয়েছে নিরাপত্তা।

অন্য একটি পাখী বলে হে আল্লাহ! হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বংশধরদের সাথে যে দুশমনি রাখে তাদের প্রতি লা'নত প্রেরণ কর।

وَاُوْتِيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ

আর আমাদেরকে সব কিছুই প্রদান করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামত আমাদেরকে দান করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের নেয়ামত প্রদান করা হয়েছে। আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হল নবুওয়্যত, হুকুমত এবং দুবৃত্ত জ্বীনদের অনুগত হওয়া এবং বাতাসের নিয়ন্ত্রণাধীন হওয়া প্রভৃতি।

إِنَّ هٰذَا لَهُوَ الْفَضْلُ الْمُبِيْنُ

(নিশ্চয় এটি প্রকাশ্য মর্যাদা, সুস্পষ্ট অনুগ্রহ) বস্তুতঃ এসব আল্লাহ পাকের বিশেষ দান ব্যতীত আর কিছুই নয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করার জন্যে একথা বলেছেন, গর্ব করার জন্যে নয়। যেমন হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ আমি আদম সন্তানদের সরদার, আর একথা গর্বের উদ্দেশ্যে নয়।

এভাবে তিনি আরও বলেছেনঃ কেয়ামতের দিন সকলে আমার পতাকা তলে থাকবে, এটিও গর্বের বিষয় নয় ঠিক এভাবেই হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেছেন নিশ্চয় এটি হল প্রকাশ্য মর্যাদা অর্থাৎ এটি নিতান্ত আল্লাহ পাকের দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।

আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) সারা পৃথিবীর উপর সাতশ' বছর ছয়মাস যাবত ক্ষমতা পরিচালনা করেছেন। মানব ও জ্বীন জাতি সহ পশু-পক্ষী, জীব-জন্তু সবই তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন ছিল। সব কিছুকেই আল্লাহ পাক তাঁর অনুগত করে দিয়েছিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর মৃত্যু

হযরত দাউদ (আঃ) যখন গৃহ থেকে বাইরে গমন করতেন তখন গৃহের দ্বার বন্ধ হয়ে যেত, তাঁর অনুপস্থিত কালে কারো জন্যে গৃহে প্রবেশের অনুমতি ছিলনা।

একবার তিনি কোথাও গমন করেছেন, যথারীতি গৃহের দ্বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। একটু পরেই তাঁর একজন স্ত্রী লক্ষ্য করলেন যে, এক ব্যক্তি গৃহের অভ্যন্তরে দাঁড়িয়ে আছে। তিনি অন্যদেরকেও দেখালেন সকলেই আশ্চর্য্যন্বিত হল যে, গৃহের দ্বার রুদ্ধ, এমন অবস্থায় এ ব্যক্তি কিভাবে গৃহে প্রবেশ করল? এতদ্ব্যতীত, হযরত দাউদ (আঃ)-এর নিকট আমাদের অপমানও হবে। এমন সময় হযরত দাউদ (আঃ) আগমন করলেন এবং তাঁকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন তুমি কে? সে বলল, আমি সেই ব্যক্তি যাকে কেউ বাধা দিতে পারে না, যাকে কেউ প্রতিরোধ করতে পারে না, যে যত বড়ই হোক সে কাউকে পরোয়া করেনা।

হযরত দাউদ (আঃ) বুঝলেনঃ এবং বললেন মারহারা, মারহাবা, আপনি মালাকুল মউত-যমদূত। ঐ মুহূতেই হযরত আজরাঈল (আঃ) হযরত দাউদ (আঃ)-এর রুহ কবজ করলেন, তখন সূর্য উদিত হল এবং তাঁর উপর সূর্যের আলোক রশ্মি পড়তে লাগল, হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীদেরকে আদেশ দিলেন যেন তাঁর উপর ছায়া ফেলে, তখন পাখীরা ডানা মেলে তাঁর উপর ছায়া ফেলে।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩০
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৮৬
তফসীরে আদ দূররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৩

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ مِنَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ ﴿١٧﴾
حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ ۙ قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا
مَسٰكِنَكُمْ ۚ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿١٨﴾
فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْٓ اَنْ اَشْكُرَ
نِعْمَتَكَ الَّتِيْٓ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلٰى وَالِدَيَّ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا
تَرْضٰىهُ وَاَدْخِلْنِيْ بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿١٩﴾ وَتَفَقَّدَ
الطَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَآ اَرَى الْهُدْهُدَ ۖ اَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ ﴿٢٠﴾
لَاُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا اَوْ لَاَاْذْبَحَنَّهٗٓ اَوْ لَيَاْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ
مُّبِيْنٍ ﴿٢١﴾

তরজমা

(১৭) সোলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার সৈন্যবাহিনীকে-জ্বীন, মানুষ এবং পক্ষীকূল। তাদেরকে বিন্যস্ত করা হলো বিভিন্ন দলে।

(১৮) এমনকি, যখন তারা পিপীলিকার মাঠে উপস্থিত হয়, তখন একটি পিপীলিকা বলে, তোমরা নিজ নিজ ঘরে ঢুকে পড়, অন্যথায় সোলায়মান ও তার সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে তাদের অজ্ঞাতসারে পিষে মেরে ফেলবে।

(১৯) সোলায়মান তার কথায় মৃদু হেসে বললেন, হে আমার প্রতিপালক! আমার এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে নেয়ামত দান করেছ, তার শোকর গুজারীর সৌভাগ্য দান কর। আর তোমার মর্জি মোতাবেক নেক আমল করার তৌফিক দান কর এবং তোমার অনুগ্রহে আমাকে তোমার নেককার বন্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(২০) আর সোলায়মান পাখীদের খোঁজ-খবর নিতে গিয়ে বললেন, আমি যে হুদহুদকে দেখছিনা, কারণ কি? সে কি অনুপস্থিত?

(২১) আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা জবাই করে ফেলব কিংবা সে কোন প্রকাশ্য প্রমাণ আমার নিকট পেশ করবে।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে আল্লাহ পাক যে বিশেষ নেয়ামত দান করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। আর এ আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর

সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থাপনা এবং আল্লাহ্ পাকের দরবারে তাঁর শোকর গুজারীর বিবরণ স্থান পেয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

وَحُشِرَ لِسُلَيْمٰنَ جُنُوْدُهٗ

"সোলায়মানের সম্মুখে সমবেত করা হলো তার সৈন্যবাহিনীকে-জ্বীন, মানুষ এবং পক্ষীকূল"।

হযরত সোলায়ান (আঃ) তাঁর তিন প্রকার সৈন্যবাহিনীকে শ্রেণীবদ্ধ করে রেখেছিলেন এবং তাদেরকে সুশৃঙ্খল রাখার লক্ষ্যে কতিপয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। মানুষ ব্যতীত দুর্বৃত্ত জ্বীন জাতি এবং পাখিরা ছিল তাঁর সৈন্যবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের মধ্যে যে যত বড় শক্তিশালীই হোক না কেন, তাঁর গৃহীত নিয়ম-শৃংখলাকে অমান্য করার সাহস কারোই হতো না; বরং সকলেই অবনত মস্তকে তাঁর বিধি-নিষেধ মেনে চলত।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যবাহিনী

যেহেতু তাঁর সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ছিল অনেক, তাই নিয়ম-শৃংখলা রক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি তাদেরকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে দিয়েছিলেন। মোহাম্মদ এবনে কা'ব বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সেনানিবাস তিনশ' ফারছখ ব্যাপী ছিল। (এক ফারছখ প্রায় তিন মাইল) অতএব, তিনশ' ফারছখ অর্থাৎ প্রায় ৯০০ মাইল ব্যাপী ছিল। এর চারভাগের এক ভাগ স্থান জ্বীন সম্প্রদায়ের জন্যে, আর এক ভাগ মানব জাতির জন্যে আর এক ভাগ পাখিদের জন্যে, আর এক ভাগ চতুঃষ্পদ জন্তুদের জন্যে নিদৃষ্ট ছিল। এভাবে এক বিরাট সৈন্যবাহিনীর অবস্থানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাঁর কাষ্ঠনির্মিত মহলের মধ্যে এক হাজার কক্ষ ছিল, তাঁর তিনশজন স্ত্রী ছিলেন যাঁরা একশটি গৃহে থাকতেন। তাঁর সাতশ' বাঁদী ছিল, তারা সাতশ' গৃহে থাকতো। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর আদেশক্রমে প্রবল বায়ু তাঁর সিংহাসনকে উপরে উঠিয়ে নিয়ে যেতো এবং তাঁর আদেশক্রমে বাতাস তাঁকে পৃথিবীর যে কোন স্থানে নিয়ে যেতো। একবার তিনি কোথাও গমন করছিলেন, আসমান ও জমীনের মধ্যে ছিল তাঁর সিংহাসন। আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রতি ওহী প্রেরণ করলেনঃ "আমি তোমার ক্ষমতা আরো বাড়িয়ে দিয়েছি, এখন পৃথিবীতে কোন সৃষ্টি যখনই কোন কথা বলবে বাতাস তা তোমার নিকট পৌঁছে দেবে"।

حَتّٰٓى اِذَآ اَتَوْا عَلٰى وَادِ النَّمْلِ

এমনকি তারা যখন পিপীলিকার মাঠে উপস্থিত হয় তখন একটি পিপীলিকা বলে,

قَالَتْ نَمْلَةٌ يّٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ

হে পিপীলিকারা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ কর। ওয়াহাব এবনে মোনাব্যেহ (রঃ) হযরত কা'ব (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন তাঁর সিংহাসনে আরোহণ করতেন, তখন তাঁর পরিবারবর্গ, চাকর-বাকর, গোলাম-বাঁদী, সৈন্য-সামন্ত সহ সকলকে সঙ্গে নিয়ে নিতেন। পানাহারের যাবতীয় আসবাবপত্র সঙ্গে রাখতেন।

বর্ণিত আছে, একবার তিনি ইয়ামন গমন করছিলেন, ঘটনাক্রমে মদীনা শরীফের উপর দিয়ে তাঁর সিংহাসন উড়ে যাচ্ছিল। তখন তিনি বলেছিলেন, এটি হলো শেষ যুগের নবীর হিজরতের স্থান, সুসংবাদ তাদের জন্যে যারা তাঁর প্রতি ঈমান আনে, আর আনন্দ তাদের জন্যে যারা তাঁর অনুসরণ করে। এরপর তিনি মক্কা শরীফের উপর দিয়েও উড়ে যান। তখন তিনি দেখলেন, কা'বার চারি পার্শ্বে মূর্তি রয়েছে সেগুলোর পূজা করা হতো, যখন তিনি কা'বা শরীফ অতিক্রম করে গেলেন, তখন কা'বা ক্রন্দন করতে লাগল, আল্লাহ পাক কা'বা শরীফের নিকট ওহী প্রেরণ করলেন, (আর জিজ্ঞাসা করলেন) তোমার ক্রন্দনের কারণ কি? তখন কা'বা আরজ করল, হে আমার প্রতিপালক! এ কারণে আমার ক্রন্দন এসেছে, ইনি ছিলেন তোমার নবী, আর তাঁর সঙ্গে তোমার প্রিয় বন্দাদের একটি দল ছিল, তাঁরা এ স্থান অতিক্রম করেছে, কিন্তু আমার নিকট এসে নামায আদায় করেনি। অথচ আমার চারি পার্শ্বে মূর্তি রয়েছে, তোমাকে ব্যতীত তাদের পূজা করা হয়ে থাকে। আল্লাহ পাক ওহী প্রেরণ করলেন, তুমি ক্রন্দন করোনা, কিছুদিন পরই সেজদাকারী চেহারা বিশিষ্ট লোকদের দ্বারা তোমাকে পরিপূর্ণ করে দেব, আর তোমারই পার্শ্বে কোরআন নাযিল করব। আর তোমার নিকট থেকেই সর্বশেষ নবী সৃষ্টি করব, আমি আমার নবীগণকে ভালবাসি, আমি তোমার চারি পার্শ্বে এমন লোকদেরকে আবাদ করব যারা আমার এবাদত করবে, আর আমার বন্দাদের উপর হজ্বকে ফরজ (অবশ্য কর্তব্য) করে দেব। (তা আদায় করার উদ্দেশ্যে) এত দ্রুত বেগে তোমার নিকট পৌঁছবে যত দ্রুত শকুনগুলো তার বাসার দিকে যায় এবং তারা তোমার প্রতি এত ব্যাকুল হবে যেমন উষ্ট্রী তার বাচ্চার জন্যে আর কবুতর তার ডিমের জন্যে ব্যাকুল হয়। আমি তোমাকে মূর্তি এবং শয়তানদের পূজারীদের থেকে পবিত্র করব।

এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) তায়েফ এলাকায় গমন করেন। আর সেখানেই ছিল পিপীলিকার মাঠ, এ মত হলো কা'ব (রাঃ)-এর। তফসীরকার মোকাতেল এবং কাতাদা (রঃ) বলেছেন, পিপীলিকার মাঠ ছিল সিরিয়াতে, আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, পিপীলিকার মাঠে জ্বীনেরা বাস করত এবং এ পিপীলিকাগুলোর উপর তারা আরোহণ করত।

হুমায়দী বলেছেন, ঐ মাঠের পিপীলিকাগুলো মাছির মত হতো। আলোচ্য আয়াতে ঐ পিপীলিকার কথাই উল্লেখ করা হয়েছে।

قَالَتْ نَمْلَةٌ

ইমাম শা'বী (রঃ) বলেছেন, এটি ছিল ক্ষুদ্রাকৃতির একটি পিপীলিকা, তার দু'টি ডানা ছিল।

যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, তার নাম ছিল তাহিয়া।

আর মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, তার নাম ছিল হজমী।

يٰٓاَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوْا مَسٰكِنَكُمْ

ঐ পিপীলিকাটি অন্য পিপীলিকাকে সতর্ক করে বলল, হে পিপীলিকারা! তোমরা নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ কর।

لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمٰنُ وَجُنُوْدُهٗ ۙ وَهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

"অন্যথায় সোলায়মান ও তার সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে তাদের অজ্ঞাতসারে পিষে মেরে ফেলবে"।

পিপীলিকার জীবন ধারা

তফসীরকারগণ এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেছেন, এ আধুনিক কাল পর্যন্ত জীবতত্ত্ববিদগণ ক্ষুদ্রাকৃতির প্রাণী পিপীলিকা সম্পর্কে যে গবেষণা করেছেন, তাতে এ সত্য প্রকাশ পেয়েছে যে এ ক্ষুদ্রকায় প্রাণীটির জীবন-ধারা, বসবাস, অনেকটা মানুষের সামাজিক জীবনের ন্যায়, পিপীলিকাদেরও একটা সমাজ রয়েছে, এমনকি রয়েছে তাদের বংশ গোত্রের পরিচয়। পিপীলিকারাও একত্রে বসবাসের জন্যে তাদের ঘর-বাড়ি নির্মাণ করে, তাদের এ সম্মিলিত আবাস-স্থলকে 'কারিয়াতুন নামল' বা পিপীলিকার নগরী বলা হয়। তাদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা রয়েছে, রয়েছে সহানুভূতি, বিশেষতঃ বিপদের আশঙ্কা দেখলে তারা একে অন্যের জন্যে ত্যাগ-তিতিক্ষার পরিচয় দেয়, পরস্পরকে সতর্ক করে। আলোচ্য আয়াতে এমনি একটি ঘটনার উল্লেখ রয়েছে, একটি পিপীলিকা তাদের সমাজকে সতর্ক করে বলছে, তোমরা অতি সত্বর নিজ নিজ ঘরে প্রবেশ করো, নতুবা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যবাহিনী তোমাদেরকে পিষে মেরে ফেলবে, অবশ্য তারা জেনে শুনে তা করবে না; বরং তাদের অজ্ঞাতসারেই হয়তো তোমরা অসাবধানতার কারণে নিষ্পেষিত হয়ে যাবে।

এখানে কয়েকটি বিষয় প্রণিধানযোগ্য এক, পিপীলিকার একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর নবীগণ ও তাঁদের পূণ্যাত্মা সাথীগণ আল্লাহ্ পাকের কোন সৃষ্টিকে কষ্ট দেন না, তাঁরা কখনো নিষ্ঠুর হন না, এ বিশ্বাস ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকারও রয়েছে।

এজন্যে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেনঃ

ارحموا من فى الارض يرحمكم من فى السماء

যারা পৃথিবীতে রয়েছে তাদের প্রতি তোমরা দয়া কর, তাহলে যিনি আসমানে রয়েছেন অর্থাৎ আল্লাহ পাক, তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

ارحم ترحم

(তোমরা দয়া কর, তাহলে তোমাদের প্রতিও দয়া করা হবে) এজন্যে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ছিলেন দয়া-মায়ার প্রতীক, তিনি ছিলেন শান্তি-দূত, তিনি ছিলেন রহমতুল্লিল আলামীন, তিনি তাঁর প্রাণের শত্রুকেও ক্ষমা করেছেন, যুদ্ধ বন্দীদের

প্রতিও দয়া দেখিয়েছেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আরো এরশাদ করেছেনঃ

لا يرحم الله من لا يرحم الناس

"আল্লাহ পাক সে ব্যক্তির প্রতি দয়া করেন না যে মানুষের প্রতি দয়া করে না"।

অন্য একখানি হাদীসে তিনি এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি ছোটদেরকে স্নেহ মায়া করে না এবং বড়দেরকে সম্মান করে না, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম তাঁর দয়া-মায়ার এ আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন তাঁর ১,৩০,০০০ সাহাবায়ে কেরামকে, এ কারণেই তাঁরা সারা বিশ্বে দয়া-মায়া এবং শান্তির বাণী পৌঁছে দিয়েছিলেন। প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম যুদ্ধ করেছেন, তবে তা শুধু শান্তির জন্যে এবং অশান্তি দূরীভূত করার লক্ষ্যে। এভাবে বিশ্বের ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল তাঁরই মহান নেতৃত্বে, কিন্তু এ পর্যায়ে যা বিস্ময়কর তা হলো, এ মহা বিপ্লবের জন্যে যে যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং রক্তক্ষয় হয়েছে তা অতি সামান্য। মদীনা তৈয়্যেবার দশটি বছরে যুদ্ধ হয়েছে আশিটি, তাতে ৪৫৯জন মুসলমান শাহাদাত বরণ করেছেন, আর নিহত কাফেরদের সংখ্যাও ৪৫৯ জন।[১]

এ হলো প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের সুমহান আদর্শের বাস্তবায়ন। পক্ষান্তরে, যেখানে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের আদর্শ থাকে অনুপস্থিত, সেখানের ভয়াবহ দৃশ্য-ও দেখা যেতে পারে। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লবের নাম বিখ্যাত। গণতন্ত্রের নামে সংঘটিত এ বিপ্লবে ৬৬ লক্ষ লোককে প্রাণ হারাতে হয়েছে, ১ম মহাযুদ্ধে (১৯১৪-১৮) ৭৩,৩৮,০০০ লোককে প্রাণ দিতে হয়েছে। এমনিভাবে (সাবেক) সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্যে ১কোটিরও অধিক মানুষকে প্রাণ দিতে হয়েছে। যে উদ্দেশ্যে প্রথম মহাযুদ্ধ হয়েছিল, সেই একই উদ্দেশ্যে হয়েছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ। আর এতে ১ কোটি ৬ লক্ষ ৭০ হাজার মানুষ প্রাণ হারায়।[২]

যাহোক, একটি পিপীলিকাও এ সত্য উপলব্ধি করে যে, কোন নবী ও তাঁর সাথীগণ কোন প্রাণীকে কষ্ট দেবেন না, কিন্তু যদি তাঁদের অজ্ঞাতসারে ক্ষুদ্রতম প্রাণী পিপীলিকার কোন ক্ষতি হয়, এ আশঙ্কাতেই তাদের সতর্কতা অবলম্বনের এ প্রয়াস।

প্রশ্ন হতে পারে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) তো আকাশ ভ্রমণ করতেন, এমন অবস্থায় তাঁর সৈন্যদের দ্বারা পিপীলিকার নিস্পেষিত হবার সম্ভাবনা কোথায়? তফসীরকারগণ এ প্রশ্নের জবাবে বলেছেন, হয়তো তাঁর কিছু পদাতিক বাহিনীও ছিল যাদের দ্বারা পিপীলিকার নিস্পেষিত হবার আশঙ্কা ছিল। অথবা এ ঘটনা বাতাসকে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন করার পূর্বে হয়েছিল।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, একটি পিপীলিকা আরেকটি পিপীলিকাকে সতর্ক করে যা বলেছে তা হলো এই, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজকীয় শান-শওকত

১। রহমতুললিল আলামীন খন্ড-২, পৃষ্ঠা-৩৫১
২। এনসাইক্লোপেডিয়া, খন্ড-২৩ পৃষ্ঠা-৭৭৫ ও ৭৯৩

দেখায় তোমরা এভাবে মশগুল হয়োনা যে আল্লাহ পাকের স্মরণ থেকে গাফেল হয়ে যাও, আর এ গাফলত হবে তোমাদের ধ্বংসের কারণ।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার ঐ কথাটি তিন মাইল দূর থেকে শ্রবণ করেছিলেন। কেননা, পৃথিবীর যে কোন প্রাণী কোন কথা বলত, বাতাস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট তা পৌঁছে দিত।

فَتَبَسَّمَ

হযরত সোলায়মান (আঃ) একথা শুনে মৃদু হাসলেন, আর আনন্দিত হলেন যে পিপীলিকারাও তাঁকে এবং তাঁর দলবলকে ন্যায় বিচারক মনে করে। এতদ্ব্যতীত, পিপীলিকাদের বুদ্ধিমত্তা এবং সতর্কতামূলক ব্যবস্থা দেখে তিনি আশ্চর্যন্বিত হলেন। একটি ক্ষুদ্রকায় পিপীলিকা কিভাবে তার জাতিকে রক্ষা করার জন্যে ব্যাকুল হয়ে পরস্পরকে সতর্ক করছে, তা-ও সবিশেষ লক্ষ্যণীয়।

ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا

হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার কথা শ্রবণ করে প্রথমে মুচকি হেসেছিলেন, পরে উচ্চঃস্বরে হেসেছিলেন।

জুযায (রহঃ) বলেছেন, সাধারণতঃ নবী রসূলগণ শুধু মুচকি হাসেন। উম্মূল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি কখনো হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে পূর্ণ মুখে হাসতে দেখিনি যে, তাঁর মুখের অভ্যন্তর প্রকাশ পায়, তিনি শুধু মুচকি হাসতেন। (বোখারী শরীফ)

হযরত আবদুল্লাহ এবনে হারেস (রাঃ) বর্ণনা করেন, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের চেয়ে বেশী মুচকি হাসতে কাউকে দেখেনি। (তিরমিযী)

وَقَالَ

আর হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম নেয়ামতের শোকর আদায় করে বলেছেন যে, আমাকে তোমার শোকর গুজারীর তৌফিক দান কর, তোমার তৌফিক ও সাহায্য বিনা শোকর আদায় করতে পারিনা।

رَبِّ أَوْزِعْنِيٓ أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيٓ أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ.....

হে আমার প্রতিপালক! আমার এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে নেয়ামত দান করেছ, তার শোকর গুজারীর সৌভাগ্য দান কর, আর তোমার মর্জি মোতাবেক নেক আমল করার তৌফিক দান কর।

লক্ষ্যণীয় বিষয় এই (১) হযরত সোলায়মান (আঃ) পিপীলিকার উক্তিটি শ্রবণ করেন (২) তার অর্থ হৃদয়ঙ্গম করেন (৩) আল্লাহ পাক তাঁকে এ ক্ষুদ্রতম প্রাণীর উপরও প্রভাব বিস্তার করার তৌফিক দিয়েছেন (৪) সামান্য একটি পিপীলিকাও তাঁকে চিনতে পারে,

এটিও তাঁর প্রতি আল্লাহ্ পাকের বিশেষ রহমত ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এ বিষয়টি তাঁর মনে আনন্দের সঞ্চার করে (৫) আর পিপীলিকার কথার মাধ্যমে একথাও তিনি জানতে পারেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং তাঁর সৈন্যরা জ্ঞাতসারে পিপীলিকার কোন ক্ষতি সাধন করবে না, তবে তাদের অজ্ঞাতসারে ক্ষতি হতেও পারে, এজন্যে সতর্কতা অবলম্বনের আহ্বান জানানো হয়েছে।

মূলতঃ এসব কিছুই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর প্রতি আল্লাহ্ পাকের দান, এজন্যে তিনি আল্লাহ্ পাকের শোকর আদায় করে বলেছেন, হে পরওয়ারদেগার! আমার প্রতি এবং আমার পিতা-মাতার প্রতি তুমি যে নেয়ামত দান করেছ, তার জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার যোগ্যতা আমার নেই, তাই তোমার কাছেই চাই শোকর গুজারীর তৌফিক এবং সৌভাগ্য, আর আমাকে এমন নেক আমলের তৌফিক দান কর যা তুমি পছন্দ কর এবং আমার সমগ্র জীবনকে তোমার শোকর গুজারীতে অতিবাহিত করার তৌফিক দান কর, আমার দেহ মন তথা সর্বাঙ্গ যেন সর্বক্ষণ তোমার শোকর গুজারীতে মশগুল থাকে তার তৌফিক দান কর এবং তোমার দয়ায় আমাকে তোমার প্রিয়, পছন্দনীয়, নেককার বন্দাদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত কর।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আলোচ্য আয়াতে عِبَادِكَ الصّٰلِحِيْنَ (নেককার বন্দা) হিসেবে হযরত ইব্রাহীম (আঃ), হযরত ইসমাঈল (আঃ), হযরত ইসহাক (আঃ) এবং হযরত ইয়াকুব (আঃ) সহ পরবর্তী কালের নবী রসূলগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

وَتَفَقَّدَ الطَّيْرَ

"আর সোলায়মান পাখীদের খোঁজ খবর নিলেন"।

হযরত সোলায়মান (আঃ) একদিন তাঁর পক্ষী বাহিনী পরিদর্শন করতে গিয়ে হুদহুদ নামক পাখীটিকে পেলেন না, আলোচ্য আয়াতের وَتَفَقَّدَ শব্দটির অর্থ হলো কোন হারানো জিনিষের অনুসন্ধান করা। হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীদের দ্বারা অনেক কাজ নিতেন, যখন তিনি আকাশে ভ্রমণ করতেন তখন পাখীরা কাতারবন্দী হয়ে তাঁর উপর ছায়া ফেলত, পাখীদের দ্বারা তিনি চিঠি পত্র আদান-প্রদান করতেন। তাদের দ্বারা তিনি পানির সন্ধান করতেন, যখন তিনি কোন মঞ্জিলে অবতরণ করতেন তখন পাখীরা তাঁর ও সমগ্র বাহিনীর উপর ডানা মেলে ছায়া বিস্তার করত। হুদহুদ উপরে উঠে জমীনের অবস্থা লক্ষ্য করত, জমীনের অভ্যন্তরে পানির খোঁজ করত। বর্ণিত আছে যে, পানির অনুসন্ধানে হুদহুদের পারদর্শিতা ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর, পানি মাটির যত নীচেই থাকুক না কেন, হুদহুদ তার সন্ধান পেয়ে যেত কেননা, আয়নার মধ্যে যেমন কোন জিনিষ দেখা যায়, হুদহুদ ঠিক সেভাবেই মাটির নীচের জিনিষ দেখতে পারত।

হুদহুদ যে স্থানটিকে চিহ্নিত করত, জ্বীন বাহিনী গিয়ে মাটি খুঁড়ে সেখান থেকে পানি বের করত। আরো বর্ণিত আছে, মাটির নীচে যে কচ্ছপ অবস্থান করত, তারও সন্ধান দিত হুদহুদ।

এবনে আবি শায়বা, আবদ এবনে হুমায়েদ, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম ও হাকেম এ বর্ণনা পেশ করেছেন।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রঃ) বলেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) যখন একথা বর্ণনা করেন, তখন নাফে এবনে আরজাক বলেছেন, হে বর্ণনাকারী! একটু বুঝে শুনে বল, (কি বলছ) কোন শিশু যখন জাল বিছিয়ে রাখে, তার উপর মাটি ঢেলে রাখে এবং তার উপর দানা ছড়িয়ে দেয়, হুদুহুদ তখন জাল দেখতে পায়না এবং জালে ফেঁসে যায়। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) এর জবাব দিয়েছেন, যখন তকদিরী আদেশ চলে আসে তখন সে কিছুই দেখতে পায়না আর অন্য একটি বর্ণনায় রয়েছে, তিনি বলেছেন, যখন অদৃষ্ট মোতাবেক সময় এসে যায়, তখন সে দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলে এবং সে অন্ধ হয়ে যায়।

যাহোক, হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন একটি মঞ্জিলে অবতরণ করলেন, লোকেরা পানির খোঁজ করল কিন্তু কোথাও পানি পাওয়া পেলনা, হযরত সোলায়মান (আঃ) তখন হুদহুদকে তলব করলেন, কিন্তু তাকেও পাওয়া গেলনা, তখনকার ঘটনাই আলোচ্য আয়াতে বর্ণিত হয়েছে।

فَقَالَ مَا لِيَ لَآ أَرَى الْهُدْهُدَ ۖ أَمْ كَانَ مِنَ الْغَآئِبِيْنَ

"সোলায়মান (আঃ) বললেন, কারণ কি যে আমি হুদহুদকে দেখতে পাইনা সে কি অনুপস্থিত রয়েছে"?

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন, কোন মঞ্জিলে অবতরণের পর হযরত সোলায়মান (আঃ) পাখীদেরকে ছায়া করতে আদেশ দিলেন, কিন্তু সূর্যের কিরণ তাঁর সিংহাসনের উপর পড়ল, তখন তিনি পাখীদের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন এবং হুদহুদকে দেখতে পেলেন না, তাই তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করলেন।[১]

যখন অনুসন্ধানের পরও হুদহুদকে পেলেন না, তখন একথা প্রমাণিত হলো যে, হুদহুদ অনুপস্থিত রয়েছে, তখন তিনি বললেন,

لَأُعَذِّبَنَّهٗ عَذَابًا شَدِيْدًا أَوْ لَا۟ أَذْبَحَنَّهٗٓ أَوْ لَيَأْتِيَنِّيْ بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ

"আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব, অথবা তাকে জবাই করে ফেলব অথবা সে তার অনুপস্থিতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ বর্ণনা করবে এবং তার প্রমাণ উপস্থাপন করবে"।

হযরত সোলায়মান (আঃ) রাগ করে বললেন, আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব, যাতে করে অন্য হুদহুদরা তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে। হযরত সোলায়মান (আঃ) যে কঠিন শাস্তির কথা বলেছেন, তার ব্যাখ্যায় তত্ত্ববিদগণের একাধিক মত রয়েছে। (আমি তাকে কঠিন শাস্তি দেব) এর অর্থ হলো, তার পশমগুলো ছিড়ে ফেলব, তার লেজ কেটে দেব এবং তাকে রোদ্রে ফেলে রাখব, যাতে করে পিপীলিকারা তাকে খেয়ে ফেলে।

১। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৩৫

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এর অর্থ হলো, আমি তাকে পশম ও অন্যান্য অঙ্গ কেটে রোদ্রে ফেলে দেব। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, এর অর্থ হলো আমি তাকে পাখীর খাঁচায় বন্দী করে রাখব।

অথবা এর অর্থ হলো, তার শত্রুর সঙ্গে একত্রিত করে তাকে বন্দী করব। অথবা এর অর্থ হলো, আমি তাকে তার সাথীদের খেদমতগার বানিয়ে দেব।

এখানে এ-ও উল্লেখ্য, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জন্যে হুদহুদকে শাস্তি দেয়া জায়েয ছিল।

أَوْ لَيَأْتِيَنِّي بِسُلْطَانٍ مُّبِينٍ

অথবা সে যদি তার অনুপস্থিতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ এবং প্রকৃষ্ট প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারে তবে তাকে শাস্তি দেয়া হবে না। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, হুদহুদের উপর কোন দায়িত্ব ন্যস্ত ছিল অথবা সৈন্যবাহিনীর শৃংখলা রক্ষার স্বার্থেও এমন ব্যবস্থা হতে পারে। কেননা সেনাবাহিনীতে কোন সৈন্যের অনুপস্থিতিই অপরাধ হিসেবে গণ্য হয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেছেন, যদি সে অনুপস্থিতির কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ ব্যাখ্যা না করে, অথবা কোন দুর্বল কৈফিয়ত বর্ণনা করে তবে এমন অবস্থায়ও সে শাস্তির যোগ্য বলে বিবেচিত হবে।

এ আয়াত দ্বারা হাকীমূল উম্মত হযরত থানবী (রহঃ) প্রমাণ করেছেন যে, প্রশিক্ষণের জন্যে জীব-জন্তুকেও শাস্তি দেয়া বৈধ, আর জীব-জন্তুর ক্ষতি সাধন থেকে আত্মরক্ষা করার লক্ষ্যে তাকে হত্যা করাও বৈধ, কিন্তু এ বৈধতা সেখানে হবে যেখানে প্রশিক্ষণের জন্যে শাস্তি দিলে তা উপকারী হয়।[১]

আল্লামা এবনে কাসীর (রহঃ) লিখেছেন, এ হুদহুদটি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সেনাবাহিনীতে প্রকৌশলীর কাজ করতো, সে বলে দিতো পানি কোথায় আছে? মাটির নীচে পানি থাকলে, সে এভাবে দেখতো যেভাবে মাটির উপরের জিনিষ সে দেখে। হুদহুদ যখন ফিরে আসল তখন অন্য জীব-জন্তুরা তাকে বললো, আজ তোমার বিপদ অবশ্যম্ভাবী কেননা, বাদশাহ অঙ্গীকার করেছেন যে তোমাকে হত্যা করবেন। সে বললো, তোমরা আমাকে বলো তিনি কি বলেছেন? যখন সে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বক্তব্য শুনলো তখন সে অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে বললো, আমি বেঁচে গেলাম। হযরত মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, হুদহুদের রক্ষা পাবার কারণ হলো সে তার মায়ের সাথে অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করতো।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজেদী, পৃষ্ঠা-৭৬৬

[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৬৩-৬৪

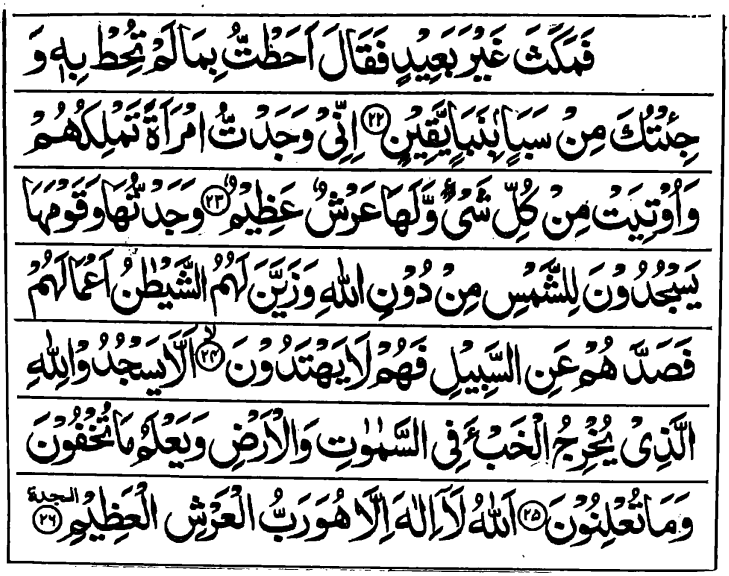
فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ فَقَالَ أَحَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ
جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ ﴿٢٢﴾ إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ
وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ ﴿٢٣﴾ وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا
يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ
فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٢٤﴾ أَلَّا يَسْجُدُوا لِلَّهِ
الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ
وَمَا تُعْلِنُونَ ﴿٢٥﴾ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ﴿٢٦﴾ السجدة

তরজমা

(২২) এরপর অনতিবিলম্বে হুদহুদ এসে পড়লো এবং বললো, আমি আপনার নিকট আপনার অজানা খবর নিয়ে এসেছি, আর সাবা থেকে সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আপনার নিকট হাযির হয়েছি।

(২৩) আমি একজন মহিলাকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখতে পাই এবং তাকে সর্ব প্রকার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে, বিশেষতঃ তার রয়েছে একটি বিরাট সিংহাসন।

(২৪) আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করছে, শয়তান তাদের কীর্তিকলাপ তাদের চোখে সুন্দর করে রেখেছে এবং তাদের সৎ পথ থেকে নিবৃত্ত করে রেখেছে যে কারণে তারা সৎ পথ পায়না।

(২৫) কেন তারা সেজদা করেনা সেই আল্লাহ পাককে যিনি আসমান জমিনের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর এবং যা তোমরা প্রকাশ কর।

(২৬) আল্লাহ পাক, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হুদহুদের অনুপস্থিতির কথা এবং হযরত সোলায়মান (আঃ) তার ব্যাপারে যে শাস্তির কথা ঘোষণা করেছেন তার উল্লেখ রয়েছে। কিছুক্ষণ পরই যখন হুদহুদ হাযির হয় এবং তার অনুপস্থিতির কারণ ব্যাখ্যা করে তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) তাকে ক্ষমা করেন। আলোচ্য আয়াতে এ ঘটনার বিবরণ স্থান পেয়েছে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, হুদহুদ নামক এ পাখীর দ্বারা আল্লাহ্ পাক প্রথমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে, পরে সমগ্র বিশ্ববাসীকে এ সত্য বুঝিয়ে দিলেন যে যিনি যত বড় জ্ঞানীই হোন না কেন, সে জ্ঞান নিয়ে গর্ব করা কোন অবস্থাতেই শোভন নয়। এমনকি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর জ্ঞান সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ্ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

وَلَقَدْ اٰتَيْنَا دَاوٗدَ وَسُلَيْمٰنَ عِلْمًا

"আর নিশ্চয় আমি দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান দান করেছি"।

এতদসত্ত্বেও হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে হুদহুদ এসে বলছে, "নিশ্চয় আমি আপনার নিকট আপনার অজানা খবর নিয়ে এসেছি"। এরশাদ হয়েছেঃ

فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيْدٍ

অর্থাৎ অল্পক্ষণ পরই হুদহুদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে হাযির হলো।

তফসীরকারগণ হুদহুদের অনুপস্থিতির কারণ সম্পর্কে লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) বায়তুল মোকাদ্দাস নির্মাণ সম্পূর্ণ করার পর মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় কা'বা শরীফ প্রাঙ্গণে উপস্থিত হন। আর যতদিন আল্লাহ্ পাকের মর্জি ছিল সে অনুযায়ী সেখানে উপস্থিত ছিলেন। যতদিন মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় তিনি ছিলেন তার প্রতিদিন পাঁচ হাজার উষ্ট্র, পাঁচ হাজার গরু এবং বিশ হাজার খাশি জবেহ করতেন, তিনি তাঁর জাতির নেতাদেরকে বলেন, এটি সেই স্থান যেখানে সর্বশেষ নবীর আবির্ভাব হবে, তাঁর কয়েকটি গুণাবলী হবে এই, তাঁর দুশমনদের উপর তাঁকে বিজয় দান করা হবে। এক মাসের দূরত্ব পর্যন্ত তাঁর প্রভাব বিস্তার হবে, এ পর্যায়ে কাছে এবং দূরে তাঁর নিকট সমান হবে, আল্লাহ্ পাকের ব্যাপারে কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারকে তিনি আমল দেবেন না। যারা তখন উপস্থিত ছিল তারা জিজ্ঞাসা করলো, তাঁর দ্বীন কি হবে? হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, তাঁর দ্বীন হবে তৌহিদ ভিত্তিক- হযরত ইব্রাহীম (আঃ)-এর দ্বীন। সুসংবাদ সে ব্যক্তির জন্যে যে তাঁকে পায় এবং তাঁর প্রতি ঈমান আনে। উপস্থিত লোকেরা জিজ্ঞাসা করলো তাঁর আবির্ভাবের কতদিন অবশিষ্ট রয়েছে? হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, এক হাজার বছর। উপস্থিত লোকদের কর্তব্য হলো যারা এখানে উপস্থিত নেই, তাদেরকে এ খবর পৌঁছে দেয়া যে, তিনি হবেন নবী রসলগণের দলপতি এবং সর্বশেষ নবী।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) মক্কায়ে মোয়াজ্জমায় হজ্জ পর্ব সুসম্পন্ন করে মক্কা শরীফ থেকে বের হলেন। সকালে রওয়ানা হয়ে ইয়ামনের সানআ' শহরে পৌঁছলেন দ্বি প্রহরের পর, অথচ এটি ছিল এক মাসের পথ। সানআ'র জমিন ছিল শষ্য-শ্যামলিমায় পূর্ণ, অতি সুন্দর, অতি মনোরম, তাই তিনি সেখানে অবতরণ করা পছন্দ করলেন, যাতে করে খাবার এবং নামায সুসম্পন্ন করতে পারেন। হুদহুদ মনে করলো হযরত সোলায়মান (আঃ) যখন অবতরণ করেছেন, এ সুযোগে আমি পৃথিবীর দৈর্ঘ প্রস্থ দেখে নেই। অবশেষে সে তাই করলো। মহাশুণ্য থেকে সে বিলকিস রাণীর বাগান

দেখতে পেল যা সবুজে পরিপূর্ণ ছিল, অবশেষে সে বাগানে অবতরণ করলো। সেখানে অন্য একটি হুদহুদের সাথে তার সাক্ষাত হলো।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর হুদহুদের নাম ছিল ইয়াফুর, ইয়ামনের এ হুদহুদের নাম ছিল ওনায়ফের। ওনায়ফের ইয়াফুরকে জিজ্ঞাসা করলো, কোথা থেকে এসেছে আর কোথায় যাবে? ইয়াফুর বললো, আমি আমার মালিক সোলায়মান (আঃ) এবনে দাউদ (আঃ)-এর সাথে সিরিয়া থেকে এসেছি। ওনায়ফের জিজ্ঞাসা করলা, সোলায়মান (আঃ)-কে? ইয়াফুর বলল, তিনি জ্বীন, মানুষ, শয়তান, চতুঃষ্পদ জন্তু, পাখি, বাতাস সব কিছুর বাদশাহ অর্থাৎ এসব কিছু তাঁর কর্তৃত্বাধীন। ইয়াফুর জিজ্ঞাসা করলো, তুমি কোথাকার অধিবাসী? ওনায়ফের বললো, আমি এদেশেরই অধিবাসী, ইয়াফুর জিজ্ঞাসা করলো, এদেশের বাদশাহ কে? ওনায়ফের বললো, এদেশের বাদশাহ একজন মহিলা, যাকে বিলকিস বলা হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই, তোমার মালিকের রাজত্ব অনেক বড় কিন্তু বিলকিসের রাজত্বও ছোট নয়, সে ইয়ামনের রাণী, তার বার হাজার সেনাধক্ষ্য রয়েছে, আর প্রত্যেক সেনাধক্ষের নিয়ন্ত্রণে এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনী রয়েছে। তুমি কি আমার সঙ্গে গমন করে তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনা দেখতে চাও? ইয়াফুর বললো, আমি একটু আশঙ্কা করছি, নামাযের সময় বাদশাহ সোলায়মানের পানির প্রয়োজন হবে এবং আমার খোঁজ করা হবে।

ওনায়ফের বললো, তোমার মালিক এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবে যে, তুমি রাণী বিলকিসের খবর তাঁকে পৌছাবে, তখন ইয়াফুর ওনায়ফেরের সঙ্গে গিয়ে রাণী বিলকিস ও তার রাষ্ট্র পরিচালনা দেখল, আছরের নামাযের পূর্বে আর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌছতে পারলনা। এদিকে হযরত সোলায়মান (আঃ) অবতরণ করার পর সেখানে পানি পাওয়া গেল না অথচ নামাযের সময় হয়ে গেছে। তিনি জ্বীন ও মানুষকে পানি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু কেউ পানির সন্ধান দিতে পারলনা, এরপর তিনি পক্ষীবাহিনীর খবর নিলেন তখন হুদহুদকে অনুপস্থিত পেলেন, পক্ষী বাহিনীর ব্যবস্থাপক ছিল শকুন, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাকে তলব করলেন এবং হুদহুদ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলেন, শকুন বলল, আমি তার সম্পর্কে কিছুই জানিনা সে কোথায় আছে, আমি কোথাও তাকে প্রেরণ করিনি। তখনই হযরত সোলায়মান (আঃ) তার প্রতি রাগ করে বলেছিলেন, আমি তাকে শাস্তি দেব।

এরপর তিনি পক্ষীবাহিনীর সর্দার ঈগলকে তলব করলেন এবং আদেশ দিলেন, হুদহুদ যেখানেই থাকুক, তাকে হাযির কর। সে মহাশূণ্যে গমন করে হুদহুদের খোঁজ করতে লাগল। সেখান থেকে পৃথিবীকে একটি পেয়ালার মত মনে হলো, ঈগল লক্ষ্য করলো হুদহুদ ইয়ামনের দিক থেকে আসছে, ঈগল তার উপর হামলায় উদ্যত হলো, হুদহুদ তাকে এভাবে আসতে দেখে উপলব্ধি করল তার ব্যাপারে ঈগলের ইচ্ছা ভাল নয়, তাই হুদহুদ তাকে আল্লাহর কসম দিয়ে বললো, যিনি তোমাকে শক্তি দিয়েছেন এবং আমার উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তুমি আমার প্রতি দয়া কর এবং আমাকে কষ্ট দেয়ার ইচ্ছা করোনা, তখন ঈগল তার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে বদনসীব!

তোর মৃত্যু হোক, আল্লাহর নবী শপথ করে বলেছেন যে, তোকে শাস্তি দেবেন অথবা জবেহ্ করে ফেলবেন।

এরপর উভয়ে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারের দিকে রওয়ানা হলো, যখন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সৈন্যবাহিনীর নিকট পৌঁছল, তখন শকুন এবং অন্যান্য পাখীরা হুদহুদকে বলল, তুমি আজ সারা দিন কোথায় ছিলে? আল্লাহর নবী তোমার সম্পর্কে একথা বলেছেন। তখন হুদহুদ জিজ্ঞাসা করলো, তিনি কি তাঁর কথায় কোন শর্তারোপ করেছেন? তারা বললো, হ্যাঁ তিনি বলেছেন, যদি সে কোন যুক্তিপূর্ণ কারণ এবং সুস্পষ্ট প্রমাণ পেশ করতে পারে তবে তার শাস্তি হবে না। এরপর ঈগল এবং হুদহুদ উভয়েই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর খেদমতে হাযির হলো, তখন তিনি আরাম কেদারায় উপবিষ্ট ছিলেন, ঈগল বলল আমি তাকে নিয়ে এসেছি, হুদহুদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে দেখে অত্যন্ত বিনয় প্রকাশ করল, তার মাথা এবং ডানা মাটিতে ফেলে টেনে টেনে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট পৌঁছল, তিনি তার ঘাড় ধরে নিজের দিকে টেনে এনে জিজ্ঞাসা করলেন, তুই কোথায় ছিলি? আমি তোকে কঠিন শাস্তি দেব। হুদহুদ বলল, হে আল্লাহর নবী! স্মরণ করুন সে সময়কে যখন আপনি আল্লাহ পাকের মহান দরবারে দণ্ডায়মান হবেন। একথা শ্রবণ করা মাত্র হযরত সোলায়মান (আঃ) থর থর করে কাঁপলেন এবং হুদহুদকে ক্ষমা করলেন আর অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

فَقَالَ اَحَطْتُّ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهٖ

"হুদহুদ বলল, আমি আপনার নিকট আপনার অজানা খবর নিয়ে এসেছি"।

আলোচ্য আয়াতের اَحَطْتُّ শব্দটি احاطه থেকে নিস্পন্ন। এর অর্থ হলো কোন বিষয়ের পরিপূর্ণ এবং সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। আর একথা সন্দেহাতীত রূপে বলা চলে যে, আল্লাহ পাক ব্যতীত কারো এলমই পরিপূর্ণ নয়, তবে বিষয়টির আধিক্য বোঝানোর খাতিরে এমন শব্দ ব্যবহৃত হয়। এর অর্থ হলো, আমি নিশ্চিতভাবে জানতে পেরেছি, যার এলম এ মুহূর্তে আপনার কাছে নেই। একটি পাখীর একজন নবীর সঙ্গে এভাবে কথা বলা একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ যে একটা সামান্য প্রাণী যে কথা জানে, সে কথা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ন্যায় নবীরও জানা নেই। এর দ্বারা আল্লাহ পাক হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে এ সম্পর্কে সতর্ক করেছেন যে, নিজের জ্ঞানের উপর গর্ব করা উচিত নয়; বরং এ সত্য উপলব্ধি করা উচিত যে, আমার জ্ঞান ত্রুটিপূর্ণ, অনেক কিছুরই এলম আমার নেই।

وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَاٍ بِنَبَاٍ يَّقِيْنٍ

"আর সাবা থেকে আমি সুনিশ্চিত সংবাদ নিয়ে আপনার নিকট হাযির হয়েছি"।

সাবা

সাবা ইয়ামনের একটি শহরের নাম। সানআ'র অনতিদূরে অবস্থিত। আল্লামা বগভী (রঃ) লিখেছেনঃ হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সাবা সম্পর্ক

জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি এরশাদ করেছেন, সে এক ব্যক্তি ছিল যার দশ পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ছয়জন একদিকে চলে যায়, আর চার জন অন্যদিকে চলে যায়। ছয় জন ডান দিকে গমন করে যে স্থানে আবাদ হয় তা ইয়ামন হয়ে যায়, আর চার জন বাম দিকে চলে যায় এবং যেখানে তারা আবাদ হয় তা শাম দেশ (সিরিয়া) হয়ে যায়।

হযরত সোলায়মান (আঃ) হুদহুদকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কি নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছ বলো?

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً

আমি একজন মহিলাকে তাদের উপর রাজত্ব করতে দেখতে পাই। সাবার রাণীর নাম ছিল বিলকিস বিনতে শারাহীল। সে ইয়ারাব এবনে কাহতানের বংশধর। তার পিতা ছিল অত্যন্ত বড় বাদশাহ। তার পূর্ব পুরুষদের মধ্যে ৩৯ জন বাদশাহ ছিল। এদিক থেকে সে চল্লিশতম ব্যক্তি ছিল যে ইয়ামনে রাজত্ব করেছিল। চারিপার্শ্বের কোন বাদশাকে সে নিজের সমকক্ষ মনে করতো না। এজন্যে ঐ বাদশাহদের কন্যার পাণি গ্রহণে সে কখনো সম্মত হয়নি। অবশেষে এক পরীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। তার নাম ছিল রেহানা বিনতে সাকান। এ ঘরেই বিলকিসের জন্ম। পিতার মৃত্যুর পর বিলকিস রাজত্ব গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং নিজের ক্ষমতা গ্রহণের কথা ঘোষণা করে, ইয়ামনবাসীদের মধ্যে কিছু লোক তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে আর কিছু লোক তার বিরোধিতা করে। বিরোধীরা আরেক ব্যক্তিকে তাদের বাদশাহ মনোনীত করে। ইয়ামন দু'ভাগে বিভক্ত হয়। যে ব্যক্তিকে বাদশাহ বানানো হয়েছিল সে মানুষের প্রতি জুলুম অত্যাচার করে এমনকি, তার প্রজাদের মেয়েরাও তার অত্যাচার থেকে নিস্তার পায়নি। এজন্যে লোকেরা তাকে হটাতে সচেষ্ট হয়, কিন্তু তার শক্তি ছিল প্রবল, তাদের কোন চেষ্টাই সফল হয়নি।

বিলকিস যখন লক্ষ্য করলো যে, দেশবাসী তার বিরোধী এবং সে নারী জাতির প্রতি জুলুম অত্যাচার করছে, তখন বিলকিস ঐ জালেম বাদশাহর নিকট পত্র লিখল এবং এ প্রস্তাব রাখল যে তুমি আমাকে বিয়ে কর, যাতে করে দু'টি রাষ্ট্র একীভূত হয়ে যায় আর দেশবাসীর মধ্যে যে কলহ রয়েছে, তা-ও দূরীভূত হয়। বাদশাহ এ চিঠির প্রতি-উত্তরে লিখল, আমি তোমার কাছে এ আশা করিনি, তাই কখনো তোমার নিকট বিয়ের পয়গাম পাঠাইনি। বিলকিস লিখল, তোমার সাথে বিয়েতে আমার কোন আপত্তি নেই কেননা, তুমি আমার বংশীয় লোক এবং তুমি ভদ্র, তবে তুমি একটি কাজ কর, জাতির নিকট তুমি আমাকে বিয়ে করার আবেদন পেশ কর। বাদশাহ লোকদেরকে একত্রিত করলো আর সকলকে এ বিয়ের পয়গাম শুনিয়ে দিল। লোকেরা বলল, আমাদের ধারণা বিলকিস রাজী হবে না, বাদশাহ বলল প্রথম প্রস্তাব তার তরফ থেকেই এসেছে, আপনারা ইচ্ছা করলে তার সঙ্গে কথা বলতে পারেন। তাঁর দেশের একদল লোক বিলকিসের নিকট এ বিষয়ে কথা বলল। বিলকিস বলল, কথা সত্য, আমার আকাঙ্ক্ষা হলো যেন আমার সন্তান-সন্ততি হয়। যাহোক, বিলকিসের সঙ্গে ঐ বাদশার বিয়ে হয়ে গেল এবং বিলকিস ঐ বাদশার বাড়ীতে যাওয়ার সময় অনেক সৈন্য নিয়ে যায় এবং বাদশার নিকট পৌঁছে এবং তাকে এত বেশী মদ্যপান করায় যে, সে অজ্ঞান হয়ে যায়। এরপর তার মস্তক দেহ

থেকে বিচ্ছিন্ন করে এবং ঐ রাতেই নিজ রাজ্যে ফিরে আসে। সকালে লোকেরা দেখল, তাদের রাজা নিহত হয়েছে এবং রাজমহলের প্রধান ফটকে রাজার মস্তক ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। তখন সকলেই উপলব্ধি করে যে এ বিয়ে ছিল একটি প্রতারণা। এরপর দেশবাসী সকলে সম্মিলিতভাবে বিলকিসকে রাণী হিসেবে মেনে নেয়।

হযরত আবু বকর (রাঃ) বর্ণনা করেন, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের নিকট যখন এ খবর পৌঁছে যে পারস্যবাসী কিসরার কন্যাকে তাদের রাণী মনোনীত করেছে, তখন তিনি এরশাদ করেনঃ 'সে জাতি কখনো সফল হবেনা যে জাতি একজন স্ত্রীলোকের হাতে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অর্পণ করেছে'।[১] (বোখারী, আহমদ, তিরমিজী, নাসায়ী)

وَ اُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَّ لَهَا عَرْشٌ عَظِيْمٌ

"আর তাকে সর্বপ্রকার সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে, বিশেষতঃ তার রয়েছে একটি বিরাট সিংহাসন"।

আল্লামা এবনে কাসীর (রঃ) লিখেছেন, ইয়ামনে তখন একজন মহিলা রাজত্ব করত, তার নাম ছিল বিলকিস বিনতে শারাহিল। তফসীরকার কাতাদা (রঃ) বলেছেন, তারা মা ছিল এক পরী, নাম ছিল তার ফারেয়াহ। এবনে যোরায়েজ বলেছেন, তার নাম ছিল জী শরখ। আর মায়ের নাম ছিল বলতাআহ। তার লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল। আর তার মন্ত্রীর সংখ্যা ছিল ৩১২ জন। প্রত্যেকের অধীনের বার হাজার সৈন্য ছিল। তার রাজধানীর নাম ছিল মাআরেব যা সানআ' থেকে মাত্র তিন মাইর দূলে অবস্থিত।

দুনিয়ার জীবনের যাবতীয় দ্রব্য-সম্ভার তার নিকট মওজুদ ছিল। তার সিংহাসন ছিল অত্যন্ত জৌলুসপূর্ণ এবং অতি সুন্দর যার উপর সে উপবেশন করত। স্বর্ণ দ্বারা মোড়ানো এবং মূল্যবান পাথর দ্বারা সুসজ্জিত এ সিংহাসনটির উচ্চতা ছিল ৮০ হাত। আর প্রস্থ ছিল ৪০ হাত। ছয়শ' মহিলা সর্বক্ষণ তার সেবায় নিয়োজিত থাকত। তার দিওয়ানে খাছ যাতে এ সিংহাসনটি ছিল তা অত্যন্ত বড় মহল ছিল। উচ্চ, প্রশস্ত, সুদৃঢ়, সুসজ্জিত এ বিলাসবহুল, আকর্ষণীয় ইমারতটির পূর্বভাগে তিনশ' ষাটটি তাক ছিল, আর অনুরূপ সংখ্যক তাক পশ্চিমাংশেও ছিল। এ ইমারতটির নির্মাণ কৌশল এমনি বিস্ময়কর ছিল যে, মনে হতো প্রত্যেক দিন অতি প্রত্যুষে সূর্য পূর্ব দিকের একটি তাক থেকে বের হয়ে আসছে এবং সন্ধ্যায় তারই বিপরীতে পশ্চিম দিকের একটি তাকে অস্তমিত হচ্ছে। দরবারের লোকেরা সকাল সন্ধ্যা তাকে সেজদা করত, রাজা-প্রজা সকলেই সূর্যের পূজারী ছিল। তাদের মধ্যে একজনও আল্লাহ পাকের এবাদত গুজার ছিলনা, শয়তান মন্দ কাজগুলোকে তাদের সম্মুখে অত্যন্ত আকর্ষণীয় এবং লোভনীয় করে রেখেছিল। শুধু এক আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্যে এবং শুধু এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী করার জন্যে কেউ প্রস্তুত ছিলনা।[২]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-(৯), পৃষ্ঠা-৩২-৪০
[২]। তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৬৪-৬৫

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) বিলকিসের সিংহাসন সম্পর্কে লিখেছেন, বিলকিসের সিংহাসনটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত এবং ইয়াকুত, জবরজদ সহ অন্যান্য মূল্যবান পাথর খচিত, এর উপর সাতটি কক্ষ ছিল, আর প্রত্যেক কক্ষের দুয়ার ভিন্ন ছিল।

এবনে আবি হাতেম যোবায়ের এবনে মোহাম্মদের সূত্রে বর্ণনা করেছেন, এ সিংহাসনটি ছিল স্বর্ণ নির্মিত, যার দু' পাশ্বেই ইয়াকুত এবং জবরযদ পাথর খচিত ছিল। এ সিংহাসনটির দৈর্ঘ ছিল ৮০ হাত আর প্রস্থ ছিল ৪০ হাত।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বিলকিসের সিংহাসন দৈর্ঘে ছিল ৩০ হাত, আর প্রস্থে ছিল ৩০ হাত।

আর তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, এ সিংহাসনটির দৈর্ঘ ছিল ৮০ হাত, আর উচ্চতা ছিল ৩০ হাত।[১]

এ-তে হলো বিলকিসের দুনিয়ার শান-শওকতের অবস্থা, আর তার দ্বীনের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে পরবর্তী আয়াতে।

وَجَدْتُّهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُوْنَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

"আমি তাকে ও তার সম্প্রদায়কে দেখতে পেলাম তারা আল্লাহ পাকের পরিবর্তে সূর্যকে সেজদা করে"।

وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطٰنُ اَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُوْنَ

আর শয়তান তাদের কুকীর্তিকেই সুন্দর এবং সুশোভিত করে রেখেছে, পরিণামে তাদের এ অন্যায় অনাচার পরিহার করার কথা তারা চিন্তাও করেনা, আর ইবলিস শয়তানই তাদেরকে সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাকের বন্দেগীর পথ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে। শান্তি, কল্যাণ এবং নাজাতের পথ তাদের জন্যে বন্ধ করে রেখেছে। এজন্যে তারা সঠিক পথে ফিরে আসছে না। হযরত সোলায়মান (আঃ) ছিলেন আল্লাহর নবী, মানুষকে সরল পথ তথা আল্লাহ পাকের পথ প্রদর্শনই তাঁর প্রথম দায়িত্ব, আর এর পাশাপাশি তিনি ছিলেন রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী। তাই জালেমদের বিরুদ্ধে জেহাদ করাও তাঁর কর্তব্য। হুদহুদ রাণী বিলকিস সম্পর্কে যে বক্তব্য রেখেছে, তা দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বিলকিসের বিরুদ্ধে জেহাদ পরিচালনার জন্যে অনুপ্রাণিত করেছে বললে অত্যুক্তি হবেনা।

اَلَّا يَسْجُدُوْا لِلّٰهِ الَّذِىْ يُخْرِجُ

"কেন তারা সেজদা করেনা সেই আল্লাহ পাককে যিনি আসমান জমীনের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন, যিনি জানেন যা তোমরা গোপন কর, আর যা তোমরা প্রকাশ কর"।

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪০

হুদহুদ একথাও বলেছে যে কেন তারা সেই আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আনেনা, তাঁকে সেজদা করেনা, যিনি সর্ব শক্তিমান, যিনি বিশ্ব জগতের সব কিছু সম্পর্কে অবগত, যিনি নভোমন্ডল, ভূ-মন্ডলের গোপন বিষয়কে প্রকাশ করেন। কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, আলোচ্য আয়াতের

الْخَبْءَ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

বাক্যটির অর্থ হলো তিনি আল্লাহ্ পাক, যিনি আসমান জমীনের সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত। আর অন্য তফসীরকারগণ বলেছেন, এর অর্থ হলো তিনি জমীন ও আসমানের সব গোপন বিষয় প্রকাশ করেন, বৃষ্টি বর্ষণ, জমি থেকে খাদ্য দ্রব্য উৎপাদন, যার অস্তিত্ব নেই তাকে অস্তিত্ব প্রদান, যা গোপন তাকে প্রকাশ করা এসবই হয় আল্লাহ্ পাকের ইচ্ছা এবং মর্জিতেই। কেননা, তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী, এসব কিছুর কর্তা তিনিই, অতএব বন্দেগী হতে হবে শুধুমাত্র তাঁর জন্যে, আর সেজদা করতে হবে শুধুমাত্র তাঁকেই। সেজদার যোগ্য একমাত্র তাঁর পবিত্র সত্ত্বাই।

وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَمَا تُعْلِنُوْنَ

তিনি জানেন সে সব কথা যা তোমরা তোমাদের অন্তরে গোপন রাখ এবং যা তোমরা প্রকাশ কর। অতএব, গোপন ও প্রকাশ্য শেরক বর্জন কর এবং জীবনের সর্বাবস্থায় আল্লাহ্ পাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ কর।

اَللّٰهُ لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ *

"তিনিই আল্লাহ্ পাক, তিনি ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি মহান আরশের অধিপতি"।

এতে আল্লাহ্ পাকের তৌহিদ বা একত্ববাদের বর্ণনা রয়েছে। আর যেহেতু এ কথাগুলো হুদহুদের, তাই এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, পশু পক্ষী পর্যন্ত আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদ সম্পর্কে অবগত। এজন্যে হুদহুদ আল্লাহ্ পাকের গুণাবলী বর্ণনা করেছে এবং আল্লাহ্ পাকের পরিপূর্ণ ক্ষমতা এবং পরিপূর্ণ জ্ঞানের কথা প্রমাণ করেছে।[১]

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৬৮

* এ আয়াতটি সেজদার, এর পাঠক-শ্রোতা উভয়ের জন্যে সেজদা দেয়া ওয়াজিব।

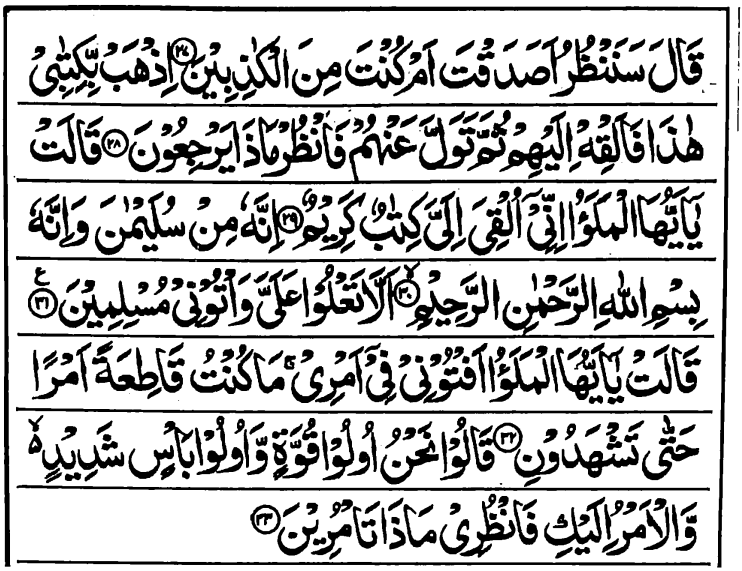
قَالَ سَنَنظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٢٧﴾ اذْهَب بِّكِتَابِي
هَٰذَا فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿٢٨﴾ قَالَتْ
يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا إِنِّي أُلْقِيَ إِلَيَّ كِتَابٌ كَرِيمٌ ﴿٢٩﴾ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ ﴿٣٠﴾ أَلَّا تَعْلُوا عَلَيَّ وَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣١﴾
قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَفْتُونِي فِي أَمْرِي مَا كُنتُ قَاطِعَةً أَمْرًا
حَتَّىٰ تَشْهَدُونِ ﴿٣٢﴾ قَالُوا نَحْنُ أُولُو قُوَّةٍ وَأُولُو بَأْسٍ شَدِيدٍ
وَالْأَمْرُ إِلَيْكِ فَانظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ ﴿٣٣﴾

তরজমা

(২৭) সোলায়মান বললো, তুমি সত্য বলেছো কি মিথ্যা, আমি এখনই তা দেখছি।

(২৮) তুমি আমার এ পত্র নিয়ে যাও এবং তা তাদের নিকট নিক্ষেপ কর, এরপর তাদের নিকট থেকে সরে থাক এবং লক্ষ্য কর তাদের প্রতিক্রিয়া।

(২৯) রাণী বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার নিকট একখানা সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে।

(৩০) নিশ্চয় চিঠিখানি সোলায়মানের তরফ থেকে আর তা এই, "অনন্ত দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ্ পাকের নামে আরম্ভ করছি"।

(৩১) অহংকার করে আমাকে অমান্য করোনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট হাযির হও।

(৩২) রাণী বললো, হে পারিষদবর্গ! আমার কর্তব্য সম্পর্কে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও, তোমাদের উপস্থিতি ব্যতীত যে আমি করণীয় সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত করি না।

(৩৩) তারা বললো, আমরা তো শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনিই ভেবে দেখুন।

তফসীরুল কোরআন

হুদহুদের কথা শ্রবণ করে হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, তোমার কথা সত্য নাকি অসত্য, তা আমি এখনই যাচাই করে দেখছি। এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) হুদহুদের হাতে বিলকিসকে দেয়ার জন্যে একটি চিঠি অর্পণ করলেন,

اِذْهَبْ بِّكِتٰبِىْ هٰذَا فَاَلْقِهْ اِلَيْهِمْ

(হযরত সোলায়মান (আঃ) হুদহুদকে বললেন) আমার এ চিঠিটি নিয়ে যাও, তাদের নিকট চিঠিটি নিক্ষেপ কর এবং তার জবাব নিয়ে আস, আর দেখ চিঠি পাওয়ার পর তারা কি করে। আর চিঠি দিয়ে তাদের মাথার উপর দাঁড়িয়ে থাকবে না কেননা, এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা রাজ দরবারের আদবের খেলাফ; বরং একটু দূরে দাঁড়িয়ে তাদের জবাবের অপেক্ষা করবে।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, আয়াতের মর্মকথা হলো হযরত সোলায়মান (আঃ) হুদহুদকে এ নির্দেশ দিয়েছেন যে, চিঠিটি বিলকিসের নিকট দিয়ে তুমি একটু দূরে আত্মগোপন করে থাক এবং তারা কি করে বা কি বলাবলি করে তা লক্ষ্য কর। বর্ণিত আছে যে, বিলকিস তখন সানআ' থেকে তিন মাইল দূরে অবস্থিত মাআরেব নামক স্থানে ছিল। হুদহুদ তার মহলে প্রবেশ করে, দরজাগুলো ছিল বন্ধ, তার শয়ন কক্ষের জানালা পথ দিয়ে প্রবেশ করে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঐ চিঠিখানি সে বিলকিসের বুকের উপর রেখে দেয়।

আবদ এবনে হোমায়েদ, এবনুল মুনজের, এবনে আবি হাতেম কাতাদা (রঃ)-এর সূত্রে এ বর্ণনাই দিয়েছেন।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ)-এর বর্ণনা এই, হুদহুদ চিঠিখানি তার ঠোটের মধ্যে নিয়ে বিলকিসের শয়নকক্ষে তার শিয়রে গিয়ে দাঁড়ায়, তার প্রহরীরা সেখানে বর্তমান ছিল, হুদহুদের ডানা ঝাপটানোর শব্দে প্রহরীরা একটু হতচকিত হয়, এরই মধ্যে হুদহুদ রাণীর কোলে চিঠিটি ফেলে দেয়।

ওহাব (রঃ) এবং এবনে যায়েদ (রঃ)-এর বর্ণনা হলো, মহলের পূর্ব দিকের বাতায়ন পথ দিয়ে সূর্যের আলো যখন প্রবেশ করত, তখন বিলকিস সূর্যের দিকে দৃষ্টি পড়া মাত্র তাকে সেজদা করত। বাতায়ন পথের এ ফাঁক দিয়ে হুদহুদ বিলকিসের কক্ষে প্রবেশ করে এবং নিজের ডানা দ্বারা বাতায়ন পথের ছিদ্র বন্ধ করে দেয়, যথারীতি সূর্য ওঠে এবং উঁচু হয়, কিন্তু ছিদ্র পথ বন্ধ হওয়ার কারণে বিলকিস তা উপলব্ধি করতে পারেনি, যখন রাণী সূর্যের অবস্থা দেখার জন্যে উঠলো, তখন হুদহুদ চিঠিটি তার প্রতি নিক্ষেপ করে। বিলকিস শিক্ষিতা মহিলা ছিল, চিঠির সীলমোহর দেখেই সে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে কেননা, তাতে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বের কিছু নমুনা অংকিত ছিল, সে এ সত্য উপলব্ধি করলো যে, যিনি এ চিঠি প্রেরণ করেছেন, তিনি তার চেয়ে অনেক বড় ক্ষমতাবান বাদশাহ, এদিকে হুদহুদ চিঠিটি দিয়ে তার সম্মুখ থেকে সরে যায়, বিলকিস পত্র পাঠ করে তার সিংহাসনে বসে এবং সমাজের সর্দারদেরকে একত্রিত করে, তাদের সংখ্যা ছিল বার হাজার এবং প্রত্যেক সর্দারের অধীনে এক লক্ষ সৈন্য ছিল। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, বিলকিসের এক লক্ষ সর্দার ছিল এবং তাদের অধীনে লক্ষ লক্ষ সৈন্য ছিল।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, বিলকিসের পরামর্শদাতা ছিল ৩১৩ জন। প্রত্যেক সদস্যের অধীনে দশ হাজার করে সৈন্য ছিল। সকলে এসে একত্রিত হলো।[১]

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اِنِّيْٓ اُلْقِيَ اِلَيَّ كِتٰبٌ كَرِيْمٌ

রাণী বললো, "হে পারিষদবর্গ! আমার নিকট একখানি সম্মানিত পত্র নিক্ষিপ্ত হয়েছে"।

তফসীরকার আতা (রঃ) এবং যাহ্যাক (রঃ) বলেছেন, চিঠিকে সম্মানিত চিঠি বলার কারণ হল, চিঠিটি সীল মোহর যুক্ত ছিল।

তেবরানী হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন, চিঠিটিকে সম্মানিত আখ্যায়িত করার কারণ হলো তার সীল মোহর। এবনে মরদবিয়াও একথা বলেছেন।

এবনে যোরায়েজ বলেছেন, আয়াতের كريم অর্থ হল উত্তম, অর্থাৎ একটি উত্তম চিঠি পেয়েছি, আর জুযায (রঃ)-ও একথাই পছন্দ করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর আরেকটি কথা বর্ণিত হয়েছে যে, আলোচ্য আয়াতে كريم শব্দ বুযুর্গ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, কেননা এর প্রেরক বুযুর্গ ছিলেন।

আর কোন কোন তফসীরকার বলেছেন, যেহেতু চিঠিটি প্রেরণের পন্থা ছিল অভিনব, তাই তাকে সম্মানিত চিঠি বলা হয়েছে।

আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, যেহেতু এই চিঠির প্রারম্ভে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম' লিখিত রয়েছে, তাই এ চিঠিকে সম্মানিত চিঠি বলা হয়েছে।

اِنَّهٗ مِنْ سُلَيْمٰنَ وَاِنَّهٗ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

"নিশ্চয় চিঠিখানা সোলায়মানের তরফ থেকে আর তা এই, দয়াময় পরম করুণাময় আল্লাহ পাকের নামে আরম্ভ করছি"।

اَلَّا تَعْلُوْا عَلَيَّ وَاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

"অহংকার করে আমাকে অমান্য করোনা এবং আনুগত্য স্বীকার করে আমার নিকট হাযির হও"।

অর্থাৎ আমার আদেশ অমান্য করোনা এবং অহংকার করোনা। চিঠির ভাষা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্বেও তার উদ্দেশ্য ব্যক্ত হয়েছে পূর্ণভাবে, নিঃসন্দেহে চিঠিটি অত্যন্ত তাৎপর্যবহ। এতে সর্ব প্রথম রয়েছে বিসমিল্লাহ, এরপর অহংকারকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে কেননা, অহংকারই হলো সকল মন্দ চরিত্রের মূল উৎস, এরপর আল্লাহ পাকের প্রতি ঈমান এবং আনুগত্যের নির্দেশ দেয়া হয়েছে যা সকল গুণাবলীর মূল উৎস। এরপর

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪২

হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর রেসালতের প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছেন, এরপর হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর প্রতি আনুগত্যের আদেশ দিয়েছেন।

قَالَتْ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَفْتُوْنِيْ فِيْٓ اَمْرِيْ.....

"অতএব, তোমরা আমাকে আমার কর্তব্য সম্পর্কে এ বিষয়ে পরামর্শ দাও, আর এ কথা সর্বজন-বিদিত যে, তোমাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনা"।

অর্থাৎ রাণী তার সভাসদদেরকে বললো তোমরা আমাকে আমার কর্তব্য সম্পর্কে পরামর্শ দাও, তোমাদের পরামর্শ ব্যতীত আমি কখনও কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিনা, একথা তোমরা ভালভাবেই জান। অতএব, তোমাদের কর্তব্য হলো বর্তমান সমস্যার সমাধানের ব্যাপারে আমাকে সঠিক পরামর্শ দেয়া।

قَالُوْا نَحْنُ اُولُوْا قُوَّةٍ وَّ اُولُوْا بَاْسٍ شَدِيْدٍ وَّالْاَمْرُ اِلَيْكِ فَانْظُرِيْ مَاذَا تَاْمُرِيْنَ

তারা বললো, "আমরা তো শক্তিশালী এবং বীর যোদ্ধা, তবে সিদ্ধান্ত আপনারই, কি আদেশ করবেন তা আপনিই ভেবে দেখুন"।

অর্থাৎ চিন্তার কোন কারণ নেই, আমরা শক্তিশালী, সৈন্য সংখ্যা এবং বীরত্ব ও রণ-নৈপূণ্যের দিক থেকে আমরা কারো থেকে কম নই এবং কারো নিকট নতি স্বীকারের প্রশ্নই ওঠেনা, আমরা কারো হুমকিকে আদৌ ভয় করিনা, যুদ্ধ বিগ্রহেও আমরা শঙ্কিত নই, তাই আমরা যুদ্ধের জন্যে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি। আর সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার একমাত্র আপনারই, আপনি যুদ্ধের জন্যে আদেশ দিলে আমরা সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি, অনতিবিলম্বে আমরা যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়বো, আর যদি আপনি মীমাংসার হুকুম দেন তবে আমরা আপনার আদেশ পালনে সম্পূর্ণ প্রস্তুত রয়েছি, আপনি নিজেই ভেবে দেখুন যুদ্ধ অথবা শান্তি এর কোন্‌টি আপনি পছন্দ করেন, আমরা আপনার আদেশ পালনে সর্বান্তকরণে সর্বদা প্রস্তুত রয়েছি।

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ
إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَفْسَدُوهَا وَجَعَلُوا أَعِزَّةَ أَهْلِهَا أَذِلَّةً ۖ وَ
كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ ﴿٣٤﴾ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِم بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةٌ بِمَ
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴿٣٥﴾ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا
آتَانِيَ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم ۖ بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ ﴿٣٦﴾ ارْجِعْ
إِلَيْهِمْ فَلَنَأْتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قِبَلَ لَهُم بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُم مِّنْهَا
أَذِلَّةً وَهُمْ صَاغِرُونَ ﴿٣٧﴾ قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَؤُا أَيُّكُمْ يَأْتِينِي بِعَرْشِهَا
قَبْلَ أَن يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ ﴿٣٨﴾ قَالَ عِفْرِيتٌ مِّنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ
بِهِ قَبْلَ أَن تَقُومَ مِن مَّقَامِكَ ۖ وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ ﴿٣٩﴾

তরজমা

(৩৪) বিলকিস বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন তা তছনছ করে দেয় এবং সেখানের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীদের অপমান করে, আর এরাও এমনই করবে।

(৩৫) আমি তাদের নিকট কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করছি, দেখি দূতেরা কি নিয়ে ফিরে আসে।

(৩৬) এরপর দূত সোলায়মানের নিকট আসে, তিনি বলেন তোমরা কি আমাকে অর্থ সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দান করেছেন, তা তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা থেকে বহুগুণে শ্রেষ্ঠ, তোমাদের উপঢৌকন নিয়ে তোমরাই খুশি থাক।

(৩৭) তুমি তাদের নিকট ফিরে যাও, আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান করবো, যার প্রতিরোধের শক্তি তাদের নেই, আমরা তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে বের করে দেব।

(৩৮) সোলায়মান বললেন, হে আমার পারিষদবর্গ! তারা আত্মসমর্পণ করে আমার নিকট আসার পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে আছ, যে তার সিংহাসন আমার নিকট নিয়ে আসবে?

(৩৯) একজন শক্তিশালী জ্বীন বললো, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা আপনার নিকট এনে দেব, আর নিশ্চয় আমি শক্তিশালী, বিশ্বস্ত।

তফসীরুল কোরআন

রাণী বললো, এ মুহূর্তে লড়াই অনুচিত হবে, কেননা যুদ্ধের পরিণামে জয়-পরাজয় উভয় অবস্থাই ক্ষতিকর, রাজা বাদশাহরা যেখানে যুদ্ধাভিযান করে, সেখানকার অবস্থা সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দেয়, জনজীবনকে বিপর্যস্ত করে তোরে, সম্মানিত ব্যক্তিদের অপমান করে, মানুষের বাড়ী-ঘর লুণ্ঠিত হয়, জনসাধারণকে বন্দী করে, যাতে করে তাদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়, যদি তোমরা সোলায়মানের (আঃ) সাথে যুদ্ধ কর তবে সম্ভবতঃ সে এমনই করবে, এজন্যে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া আমি পছন্দ করছি না, আপাততঃ আমি কিছু উপঢৌকন তাদের নিকট প্রেরণ করছি, দেখি তারা এতে সন্তুষ্ট হয়ে আমাদের বিরোধিতা থেকে বিরত হয় কি-না? তখন দ্বিতীয়বার বিষয়টি চিন্তা করা যাবে, আমার নিকট অগাধ অর্থ-সম্পদ রয়েছে, এখনই তাঁর অনুগত হয়ে পড়ার কোন প্রয়োজন নেই, হাদিয়া প্রেরণের মাধ্যমে আমি সোলায়মানকে পরীক্ষা করি তিনি কি নবী, না বাদশাহ, যদি তিনি বাদশাহ হন তবে আমার হাদিয়া কবুল করবেন এবং যুদ্ধের ইচ্ছা মুলতবী হয়ে যাবে, আর যদি তিনি নবী হন তবে আমার উপঢৌকন গ্রহণ করবেন না, আর যতদিন আমি তাঁর দ্বীন গ্রহণ না করবো, ততদিন তিনি আমাদের প্রতি রাজী হবেন না। এ পরিকল্পনা মোতাবেক রাণী বিলকিস মণি-মুক্তা, স্বর্ণ রৌপ্যের ইট সহ অত্যন্ত মূল্যবান হাদিয়া-তোহফা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট প্রেরণ করে।

পবিত্র কোরআনের ভাষায়,

قَالَتْ اِنَّ الْمُلُوْكَ

"রাণী বিলকিস বললো, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তাকে ধ্বংস করে দেয় এবং সেখানের সম্মানিত লোকদের অপমান করে, আর এরাও তাই করবে"।

রাণী বিলকিস প্রথমে রাজা-বাদশাদের আচরণ ব্যক্ত করেছে, বাক্যের শেষার্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছে যে, এদের থেকেও আমি অনুরূপ আশঙ্কা করছি।

এর আরো একটি অর্থ হতে পারে, এ বাক্যটি বিলকিসের নয়, বরং আল্লাহ পাকের অর্থাৎ আল্লাহ পাক বিলকিসের আগের উক্তিকে সত্যায়িত করেছেন এবং এরশাদ হয়েছেঃ রাজা-বাদশারা সাধারণত যা করে এরাও তাই করবে। এর দ্বারা বোঝা যায় যে রাণী বিলকিস যুদ্ধ নয়, মীমাংসাকে পছন্দ করছিলো।

وَاِنِّيْ مُرْسِلَةٌ اِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ

"আর আমি তাদের নিকট কিছু উপঢৌকন প্রেরণ করবো, দেখি তারা কি নিয়ে ফিরে আসে"।

রাণী বিলকিসের উপঢৌকন

রাণী বিলকিস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর খেদমতে স্বর্ণ-রৌপ্য, হিরা-জহরত ছাড়াও কিছু গোলাম-বাঁদী উপঢৌকন হিসেবে প্রেরণ করে। হযরত আবদুল্লাহ এবনে

আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, গোলাম বাঁদীদের উভয় দলকে একই পোষাক পরিয়ে প্রেরণ করা হয় যাতে করে ছেলে মেয়েদের মধ্যকার পার্থক্য বোঝা না যায়। মুজাহেদ (রহঃ) বলেছেন, ২০০ গোলাম, ২০০ বাঁদী প্রেরিত হয়েছিল। তফসীরকার মুজাহেদ এবং মোকাতেল (রহঃ) বলেছেন, বাঁদীদেরকে গোলামদের পোষাক এবং গোলামদেরকে বাঁদীদের পোষাক পরানো হয়েছিলো।

সাঈদ এবনে যোবায়ের (রহঃ) বলেছেন, বিলকিস স্বর্ণের ইট, রেশমী কাপড় প্রেরণ করেছিল। ওহাব এবনে মোনাব্বেহ (রহঃ) বলেছেন যে, সে পাঁচশ' গোলাম এবং পাঁচশত বাঁদীও পাঠিয়েছিল, তাদের গলায় হার আর হাতে চুড়ি পরানো হয়েছিল। গোলামদেরকে পাঁচশ' ঘোড়ায় এবং বাঁদীদেরকে পাঁচশত খচ্চরে আরোহণ করানো হয়, আর ঘোড়ার লাগামগুলোকে হিরা-জহরত দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিলো।

এতদ্ব্যতীত, বিলকিস স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাঁচশ' ইট এবং মুক্তা ও ইয়াকুত পাথর খচিত একটি মুকুট প্রেরণ করে এবং সে সঙ্গে একটি মূল্যবান নিচ্ছিদ্র মুক্তা প্রেরিত হয়। মুনজের এবনে আমর নামক এক সর্দারকে বিলকিস আরো কিছু লোক সঙ্গে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিলো, তাতে উপঢৌকনের একটি তালিকাও ছিল, সে তাদেরকে একথা বলেছিলো, তোমরা সোলায়মান (আঃ)-কে বলবে, যদি আপনি নবী হন তবে বাঁদীদেরকে গোলামদের থেকে পৃথক করে দিন। আর এ কৌটাটি না খুলে বলুন এটাতে কি আছে? যখন তিনি বলে দেবেন তখন তোমরা বলবে, এ মুক্তাতে ছিদ্র করে দিন, আর কোন মানুষ বা জ্বীনের সাহায্য গ্রহণ করবেন না। আর গোলাম এবং বাঁদীদেরকে সে হুকুম দিয়েছে, গোলামরা যেন মেয়েলী সুরে কথা বলে আর বাঁদীরা যেন পুরুষের ন্যায় কথা বলে। এরপর পত্রবাহকদের বলে দিয়েছে, তোমরা লক্ষ্য রাখবে, তিনি তোমাদের সাথে কি ব্যবহার করেন? যদি ক্রোধের দৃষ্টিতে তোমাদেরকে দেখেন, তাহলে বুঝবে তিনি বাদশাহ। কিন্তু তোমরা কোন অবস্থাতেই ভীত হয়োনা, আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। আর যদি তিনি তোমাদের সাথে হাসি মুখে দয়াদ্র ভাব প্রকাশ করেন, তাহলে বুঝবে তিনি নবী রসূল, তোমরা তাঁর কথা বুঝতে চেষ্টা করবে এবং আদবের সাথে জবাব দেবে।

যাহোক, বিলকিসের দূতেরা এসব উপঢৌকন নিয়ে রওয়ানা হলো। এদিকে হুদহুদ হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে তাদের এভাবে রওয়ানা হবার খবর দিলো। হযরত সোলায়মান (আঃ) জ্বীনদের আদেশ দিলেন, স্বর্ণের ইট তৈরী কর। আদেশ পালন করা হলো। এরপর নির্দেশ দিলেন, এ স্বর্ণ রৌপ্যের ইটগুলো তাঁর রাজ প্রাসাদ থেকে ২৭ মাইল পর্যন্ত বিছিয়ে দেয়া হোক এবং পথের দু' পার্শ্বে স্বর্ণের দেয়াল তৈরী করা হোক। এরপর তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, জলে-স্থলে সবচেয়ে সুন্দর প্রাণী কি? উপস্থিত লোকেরা বললো, সমুদ্রে এত সুন্দর প্রাণী দেখেছি যা দুনিয়ার কোথাও দেখিনি, তখন তিনি জ্বীনদের আদেশ দিলেন সেই প্রাণীগুলোকে হাযির করতে, এরপর স্বর্ণ রৌপ্যের ইটের উপর তাদের বেঁধে রাখা হয় এবং ঐ প্রাণীগুলোর খাবার তাদের সম্মুখে রাখা হয়।

এরপর জ্বীনদের আদেশ দেয়া হয় তাদের সন্তানদের পথের দু'পাশে দাঁড় করিয়ে রাখতে। এসব আদেশ দেয়ার পর হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর সিংহাসনে আরোহণ

করেন, এরপর তাঁর দু' পার্শ্বে চার হাজার করে আসন রাখা হয়। ডানে বামে মাইলের পর মাইল জ্বীনেরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে যায়, যখন দূতেরা কাছে আসলো, হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজ্যের শান-শওকত দেখলো, আর এমন সামুদ্রিক জীব দেখলো যা কখনো দেখেনি এবং স্বর্ণ-রৌপের উপর তাদেরকে মলত্যাগ করতে দেখলো, তখন তারা নিজেদেরকে খুব হেয় মনে করলো, রাণী বিলকিস থেকে যা উপঢৌকন স্বরূপ নিয়ে এসেছিলো তা নিক্ষেপ করলো।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর দরবারে বিলকিসের দূত

কোন কোন বর্ণনায় রয়েছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) স্বর্ণ রৌপ্যের ইট বিছিয়ে দেয়ার নির্দেশ দিয়েছিলেন, তখন বিলকিসের প্রেরিত ইটগুলোর গণনা মোতাবেক স্থান খালি ছেড়ে দেয়া হয়েছিলে। দূতেরা যখন কিছু ইটের স্থান শূণ্য দেখল তখন তাদের আশঙ্কা হলো হয়তো কেউ আমাদের উপর ইট উঠিয়ে নেয়ার অপবাদ দেবে, এজন্যে তারা ঐ শূণ্য স্থানগুলোর উপর ইটগুলো রেখে দেয়। এরপর জ্বীনদেরকে দেখে তারা অত্যন্ত ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। তাদেরকে বলা হয় ভয় করোনা, অগ্রসর হও। দূতেরা জ্বীন মানুষ জীব-জন্তু পক্ষীকূলের ব্যূহ পেরিয়ে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে হাযির হলো। তিনি তাদের দিকে হাসি মুখে দৃষ্টিপাত করেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কি ব্যাপার? তাদের প্রতিনিধি দলের নেতা তাদের উপঢৌকন পেশ করলো এবং বিলকিসের চিঠি দিলো, তিনি যত্ন সহকারে চিঠি পাঠ করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন, কৌটাটি কোথায়? তাদের দলনেতা কৌটাটি তাঁর হাতে দিলে তিনি তা নাড়া দিয়ে দেখলেন, এমন সময় জীব্রাঈল (আঃ) আসলেন এবং কৌটার ভেতর যা ছিলো তার কথা বললেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, এর ভেতর নিচ্ছিদ্র একটি মূল্যবান মুক্তা রয়েছে। দূত বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন, তবে এর মধ্যে ছিদ্র করে দিন। হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশ মোতাবেক যে পোকা কাঠে ছিদ্র করে তাদের একটি মুক্তা ছিদ্র করে দেয়, এরপর গোলাম বাঁদীদের পৃথক করার প্রশ্ন ওঠে, তখন হযরত সোলায়মান (আঃ) তাদেরকে অযু করার নির্দেশ দিলেন, দেখা গেলো যে মেয়েরা পাত্র থেকে পানি ফেলে অযু করলো, আর ছেলেরা পাত্রের মধ্যে হাত দিয়ে ওযু করলো। এভাবে ছেলে মেয়েদের পৃথক করা হলো। এরপর তিনি তাদের পেশকৃত সমস্ত উপঢৌকন ফেরত দিলেন।

فَلَمَّا جَآءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَتُمِدُّوْنَنِ بِمَالٍ

যখন তারা সোলায়মানের নিকট আসলো, তিনি বললেন, তোমরা কি আমাকে অর্থ সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ পাক আমাকে যা দান করেছেন, তা তোমাদেরকে প্রদত্ত দানের চেয়ে বহু গুণে শ্রেষ্ঠ, বরং তোমরাই উপঢৌকন নিয়ে খুশী থাক। অর্থাৎ তোমাদের ধন-সম্পদ, তোমাদের উপহার তোমাদের জন্যেই ধন্য হোক, এসবে আমার কোন প্রয়োজন নেই, দুনিয়ার এ ক্ষণস্থায়ী জীবনের ধন-সম্পদে আমার কোন আসক্তিও নেই, আল্লাহ পাক আমাকে দুনিয়ার সম্পদও অনেক অনেক দিয়েছেন, যা তোমাদের জন্যে কল্পনাতীত। অতএব, তোমাদের ধন-সম্পদ আমার মনকে ভোলাতে পারবে না।

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় লিখেছেন, তোমরা আমাকে ধন-সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? এর কোন প্রয়োজন আমার নেই, এর কোন গুরুত্ব আমার দৃষ্টিতে নেই। আল্লাহ পাক আমাকে দান করেছেন নবুওয়্যত, হেকমত, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা, অতএব আল্লাহ পাকের এসব নেয়ামত তোমাদেরকে প্রদত্ত নেয়ামত থেকে অতি উত্তম। তোমাদের দৃষ্টি এ ক্ষণস্থায়ী জগতের উপর নিবদ্ধ, তোমরা উপঢৌকন নিয়েই সম্পদ বৃদ্ধি করতে চাও, আর উপঢৌকন দিয়েই নিজেদের সমকালীনদের উপর গৌরব করতে চাও, আমার অবস্থাকে নিজেদের অবস্থার মাধ্যমে মূল্যবান করতে চাও, অথচ এ পথ ভুল, বিভ্রান্তিকর।

এরপর তাদের দলনেতা মুনজের এবনে আমরকে লক্ষ্য করে বললেন,

اِرْجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَنَاْتِيَنَّهُمْ بِجُنُوْدٍ لَّا قِبَلَ لَهُمْ بِهَا وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِّنْهَآ اَذِلَّةً وَّ هُمْ صٰغِرُوْنَ

"তুমি তাদের কাছে ফিরে যাও, আমি এমন সৈন্যবাহিনী নিয়ে তাদের উপর অভিযান করবো যাদেরকে প্রতিরোধ করার শক্তি তাদের নেই, আর আমি তাদেরকে সেখান থেকে লাঞ্ছিত অপমানিত করে বের করে দেব"।

তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, এ অপমান হলো ক্ষমতাচ্যুত হওয়া, আর صٰغِرُوْنَ শব্দের তাৎপর্য হলো বন্দী হওয়া। অর্থাৎ যদি তোমরা অনুগত না হও তবে আমি তোমাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেব, আর যারা এখন ক্ষমতাসীন রয়েছে তাদেরকে বন্দী করা হবে।[১]

বর্ণিত আছে, যখন রাণী বিলকিসের প্রতিনিধিদল তার নিকট প্রত্যাবর্তন করে আর যা কিছু ঘটেছে তার বিবরণ দেয় তখন বিলকিস বলে, আল্লাহর শপথ! তিনি বাদশাহ নন, তাঁর মোকাবেলা করার সাধ্য আমাদের নেই। এরপর বিলকিস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট এ পয়গাম প্রেরণ করলো, আমি আমার সম্প্রদায়ের নেতাদেরকে নিয়ে আপনার খেদমতে হাযির হবো, আপনি যে দ্বীনের দিকে আমাদেরকে আহ্বান করছেন সে বিষয়েও ভেবে দেখবো। এরপর বিলকিসের নির্দেশ-ক্রমে তার সিংহাসনকে সাতটি মহলে সংরক্ষণ করা হয়, মহলগুলো তালাবদ্ধ করা হলো এবং সুদক্ষ প্রহরী নিযুক্ত করা হলো, যাতে করে কেউ তার সিংহাসনের ধারে কাছে ঘেঁষতে না পারে। এরপর সারা দেশে তার সফরের কথা ঘোষণা করা হলো এবং সে বার হাজার নেতৃস্থানীয় লোক সঙ্গে নিয়ে রওয়ানা হয়, যাদের প্রত্যেকের অধীনে হাজার হাজার সৈন্য ছিল।

হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) অত্যন্ত ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন। যদি কাউকে তিনি কোন কিছু জিজ্ঞাসা করতেন, তবে কারো সাহস হতো না তার জবাব দেয়ার। তাঁর প্রশ্নের জবাব দেয়ার

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৪
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৬৬-৬৭
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৬-১৭
তফসীরে রুহুল মাআনী, পৃষ্ঠা-১৯৮-২০০

দায়িত্বটি তাঁর উপরই আসতো, তারা শুধু বলতো এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাকের নবীই ভালো জানেন। একবার তিনি মহলের বাইরে তশরীফ আনেন, তিনি দেখলেন, বাইরে ধূলা উড়ছে, জিজ্ঞাসা করলেন, ব্যাপার কি? লোকেরা বললো, এখানে বিলকিস হাযির হয়েছে। ঐ স্থানটি ছিল হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মজলিশ থেকে প্রায় তিন মাইল দূরে। হযরত সোলায়মান (আঃ) একথা শ্রবণ করে দরবারীদেরকে বললেনঃ

قَالَ يٰٓاَيُّهَا الْمَلَؤُا اَيُّكُمْ يَاْتِيْنِيْ بِعَرْشِهَا قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

"হে পারিষদবর্গ! অনুগত অবস্থায় আমার নিকট তাদের আগমনের পূর্বে তোমাদের মধ্যে কে আছে যে আমার নিকট রাণী বিলকিসের সিংহাসন নিয়ে আসে"?

তফসীরকারগণ বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসের সিংহাসন তুলে আনার যে আদেশ দিয়েছিলেন, তার কয়েকটি কারণ ছিলঃ

১. হযরত সোলায়মান (আঃ) বিলকিসকে আল্লাহ্ পাকের কুদরত এবং তাঁকে আল্লাহ্ পাক যে অলৌকিক শক্তি দান করেছেন তা দেখাতে চেয়েছেন।

২. তার বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা করা উদ্দেশ্য ছিল, তার সিংহাসনের স্বরূপ বদলে দেয়ার পর সে চেনে কি-না তা দেখাও উদ্দেশ্য ছিল।

৩. কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, প্রথম সাক্ষাতেই রাণী বিলকিসের উপর হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর প্রভাব বিস্তার করতে চেয়েছিলেন এবং আল্লাহ্ পাক তাঁকে যে অসাধারণ ক্ষমতা প্রদান করেছেন তা প্রকাশ করাও এর লক্ষ্য ছিল।

قَبْلَ اَنْ يَّاْتُوْنِيْ مُسْلِمِيْنَ

অর্থাৎ তাদের অনুগত হয়ে হাযির হবার পূর্বেই যেন বিলকিসের সিংহাসন হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর খেদমতে হাযির করা হয়। এতে একথা প্রমাণিত হয় যে, কোন অমুসলিম শত্রুর ধন-সম্পদ তার ইসলাম গ্রহণের পূর্বে মুসলমানদের জন্যে হালাল। রাণী বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের এ ঘটনাই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

قَالَ عِفْرِيْتٌ مِّنَ الْجِنِّ اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ

"জ্বীনদের মধ্য থেকে ইফরীত নামক একটি দৈত্য বলে, "আপনার এ স্থান থেকে ওঠার পূর্বেই আমি সিংহাসনটি আপনার খেদমতে এনে দেব"।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) প্রতি দিন সকালে দরবারে বসতেন এবং দ্বিপ্রহর পর্যন্ত এ দরবার অব্যাহত থাকতো। কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ঐ দৈত্যটির নাম ছিল লুজি আর কেউ কেউ বলেছেন হাকওয়ান। আর অন্য তত্ত্বজ্ঞানীগণ বলেছেন, সখরে জ্বীন্নী, এ দৈত্যটি পাহাড়ের ন্যায় ছিল। দৃষ্টিশক্তি যেখানে পড়তো তার পদক্ষেপ সেখানে পৌঁছতো।[১]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খণ্ড-৯, পৃষ্ঠা-৪৯
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১১৯

وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيٌّ أَمِينٌ

"আর এ বিষয়ে আমি শক্তিশালী এবং বিশ্বস্ত"।

অর্থাৎ এ অল্প সময়ে বিলকিসের সিংহাসন আনয়নের শক্তি আমার আছে, আমি আমানতদার। অতএব, সিংহাসনে ব্যবহৃত মণি-মুক্তার হেফাজতের নিশ্চয়তা আমি দিচ্ছি। হযরত সোলায়মান (আঃ) বললেন, আমি আরো তাড়াতাড়ি চাই।

قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ
أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ ۚ فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ
هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي ۖ لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ ۖ وَمَنْ
شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ
كَرِيمٌ ﴿٤٠﴾ قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ
مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ﴿٤١﴾ فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَٰكَذَا
عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَ
كُنَّا مُسْلِمِينَ ﴿٤٢﴾

তরজমা

(৪০) যার কিতাবের জ্ঞান ছিল, সে বলে আপনার চোখের পলক ফেলবার পূর্বেই আমি তা আপনার নিকট এনে দেব। এরপর যখন সোলায়মান ঐ সিংহাসনটি নিজের কাছে দেখতে পান তখন তিনি বললেন, এটি আমার প্রতি আমার প্রতিপালকেরই দান, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান যে আমি কৃতজ্ঞ হই অথবা অকৃতজ্ঞ, যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের উপকারার্থেই করে, আর যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আমার প্রতিপালক কারোরই মুখাপেক্ষী নন, তিনি মহানুভব (তাঁর বদান্যতার কোন সীমা নেই)।

(৪১) সোলায়মান বললো, তার সিংহাসনের স্বরূপ পরিবর্তন করে দাও, দেখি সে দিশা পায়, নাকি বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়?

(৪২) এরপর রাণী যখন উপস্থিত হলো, তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো তোমার সিংহাসনটি কি এরূপই? রাণী বলে, এটি যেন সে রকমই মনে হয়, আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে, আর আমরা আত্ম সমর্পণ করেছি।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে রয়েছে, ইফরীত হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বলেছিলো, আপনার এ মজলিশ মূলতবী হবার পূর্বেই আমি বিলকিস রাণীর সিংহাসনটি আপনার

খেদমতে হাযির করবো, কিন্তু হযরত সোলায়মান (আঃ) বলেছিলেন, আমি তারও আগে চাই। আলোচ্য আয়াতে এরশাদ হয়েছে যে, ঐ মুহূর্তে একজন আল্লাহ ওয়ালা ব্যক্তি বললেন, আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা এনে দেব।

যেমন কথা, তেমন কাজ। চোখের পলকে সিংহাসন তুলে আনা হলো। হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বলা হলো আপনি সম্মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করুন। যখন তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে আনলেন, তখনই সিংহাসনটি তাঁর সম্মুখে দেখতে পেলেন। হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, এ ব্যক্তির নাম ছিল আসেফ, তাঁর পিতার নাম বরখীয়াহ। তিনি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সাথী এবং উজির ছিলেন। তিনি আসমানী কিতাব সমূহের আলেম ছিলেন, আল্লাহ পাকের নাম সমূহের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও তিনি ছিলেন ওয়াকেফহাল।

এবনে আবি হাতেম লিখেছেন, ইনি ছিলেন হযরত খিজির (আঃ)। আর কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, ইনি ছিলেন হযরত জীব্রাঈল (আঃ) যিনি মানব রূপ ধারণ করে এসেছিলেন। আর কেউ কেউ বলেছেন, তিনি অন্য একজন ফেরেশতা ছিলেন। অধিকাংশ তফসীরকারগণ বলেছেন, তিনি ছিলেন মূলতঃ আসেফ এবনে বরখীয়াহ, যিনি সিদ্দিকের মর্যাদা সম্পন্ন ছিলেন। আল্লাহ পাকের এসমে আজম তাঁর জানা ছিল, ঐ এসমে আজম পাঠ করেই তিনি দোয়া করতেন এবং আল্লাহ পাক তাঁর দোয়া কবুল করতেন।

এবনে জরীর এবং মোকাতেল (রঃ) যাহ্যাক (রঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেছেন, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আসেফ নামাযের পর হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে বলেছেন, যতদূর আপনার দৃষ্টি যায়, আপনি চোখ তুলে দেখুন। হযরত সোলায়মান (আঃ) ইয়ামনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আর তখন আসেফ দোয়া করলেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে প্রেরণ করলেন, ফেরেশতাগণ ঐ বিরাট সিংহাসনটি তুলে এনে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে রাখলেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, আসেফ সেজদারত হয়ে আল্লাহ পাকের এসমে আজম পাঠ করে দোয়া করলেন, সঙ্গে সঙ্গে বিলকিসের সিংহাসন মাটির নীচ দিয়ে এসে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসনের সম্মুখে আত্ম প্রকাশ করলো। সিরিয়া থেকে ইয়ামন পর্যন্ত দূরত্ব দু' মাসের সফরের সমান।

আসেফ কি দোয়া করেছিলেন, সে ব্যাপারে একাধিক মত পাওয়া যায়। মুজাহেদ (রঃ) বলেছেন, 'ইয়া জাল জালালে ওয়াল একরাম' বলে দোয়া করেছেন, কেননা এটি এসমে আজম।

আর কালবী (রঃ) বলেছেন, আসেফ দোয়া করেছেন 'ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম'। কেননা, এটিও এসমে আজম।[১]

উম্মুল মোমিনীন হযরত আয়েশা (রাঃ) এ কথাই বলেছেন।

---

[১]। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন ১ম খন্ড, পৃষ্ঠা-১৯৩
এবং আরও বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন এই লেখকের রচিত গ্রন্থ এনায়েতুল কোরআন, পৃষ্ঠা ৩৮-৪৫

জহুরী (রঃ) বলেছেন, যাঁর নিকট কিতাবের এলম ছিল তিনি এভাবে দোয়া করেছেনঃ

يَا اِلٰهَنَا وَاِلٰهَ كُلِّ شَيْءٍ اِلٰهًا وَّاحِدًا لَآ اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اِيْتِنِيْ بِعَرْشِهَا

হে আমাদের মা'বুদ এবং সব কিছুর একমাত্র মা'বুদ! তুমি ব্যতীত কোন মা'বুদ নেই, তার সিংহাসনটি এনে দাও। এরপর আল্লাহ পাক সিংহাসনটি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্মুখে এনে দেন।

এলমের শ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম

মোহাম্মদ এবনে মোনকাদের (রঃ) বলেছেন, (যাঁর নিকট কিতাবের এলম রয়েছে) বলে হযরত সোলায়মান (আঃ)-কেই উদ্দেশ্য করা হয়েছে, আল্লাহ পাক তাঁকেই সে এলম দান করেছেন। আর এ বাক্যটি দ্বারা এলমের শ্রেষ্ঠত্ব এবং মাহাত্ম প্রমাণিত হয়।

দ্বিতীয়ত, এতে একথাও প্রমাণিত হয় যে, হযরত সোলায়মান (আঃ)-কে যে উচ্চ মর্যাদা এবং সম্মান প্রদান করা হয়, তা-ও এই এলমের কারণেই।

اَنَا اٰتِيْكَ بِهٖ قَبْلَ اَنْ يَّرْتَدَّ اِلَيْكَ طَرْفُكَ.

"আমি এনে দেব তা আপনার পলক ফেলবার পূর্বে"।

ইফরীত সিংহাসন এনে দেয়ার যে অঙ্গীকার করেছিলো, হযরত সোলায়মান (আঃ) তার সময়কে সুদীর্ঘ বর্ণনা করেন, তাই তিনি এ মোজেযা প্রকাশ করলেন, আর এমন কাজ করলেন যা করতে বড় বড় দৈত্যরাও অক্ষম ছিলো। এটি হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মোজেযা ছিল এবং তাঁর সাহাবী আসেফ এবনে বরখীয়ার কারামত ছিল, এটি কোন অসম্ভব কাজও ছিলোনা। যদিও বিলকিসের সিংহাসনটি বিরাট আকারের ছিল, কিন্তু লক্ষ্যনীয় বিষয় এই যে, আল্লাহ পাক তাঁর কুদরতে সূর্যকে ক্ষণিকের মধ্যে পূর্বাকাশ থেকে তার নির্দিষ্ট কক্ষপথে পরিভ্রমণ করান, তাঁর পক্ষে একটি সিংহাসনকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়া আদৌ কঠিন কিছু নয়।[১]

فَلَمَّا رَاٰهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهٗ قَالَ هٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّيْ

"এরপর যখন সোলায়মান ঐ সিংহাসনটি নিজের কাছে দেখতে পান, তখন তিনি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে বললেন, এটি আমার প্রতি আমার প্রতিপালকেরই দান, তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে চান, আমি তাঁর কৃতজ্ঞ হই কি অকৃতজ্ঞ"।

এতদূর থেকে এমন একটি বিরাট আকারের সিংহাসন চোখের পলকে চলে আসা নিঃসন্দেহে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর মোজেযা এবং তাঁর সাহাবীর কারামত। সাহাবী এ মর্যাদা লাভ করেছেন নবীর অনুসরণের কারণে। সিংহাসন নিয়ে আসার কাজটি

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১-৭২
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫০-৫১
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৬৯

হযরত সোলায়মান (আঃ) নিজেও করতে পারতেন, কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর খাদেমের দ্বারা এ কাজটি সুসম্পন্ন করান যাতে করে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সম্মান ও মর্যাদা আরো বৃদ্ধি পায় এ মর্মে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) আল্লাহ পাকের দরবারে এত প্রিয় এবং মকবুল যে তাঁর খাদেমগণের দ্বারা এমনি বিস্ময়কর কারামত প্রকাশিত হয়। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এভাবে সিংহাসনটি এক মুহূর্তের মধ্যে নিয়ে আসা আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত ব্যতীত আর কিছুই নয়, আর এ কারণেই হযরত সোলায়মান (আঃ) নেয়ামত দাতার প্রতি মনোনিবেশ করলেন এবং তাঁর অনন্ত অসীম নেয়ামতের জন্যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন এবং একথা আরজ করলেন, আল্লাহ পাকই মহান দাতা, শোকর গুজারী বা কৃতজ্ঞতা প্রকাশের তাঁর কোন প্রয়োজন নেই, তিনি কারো মুখাপেক্ষী নন, আমরা নিজেদের প্রয়োজনেই তাঁর শোকর গুজার হই, আর যে নেয়ামত তিনি আমাদেরকে দান করেন, তা তাঁর দয়া ব্যতীত আর কিছুই নয়।[১]

وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ

কৃতজ্ঞতা প্রকাশের গুরুত্ব

যে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে সে তার নিজের উপকারার্থেই করে। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় তার জেনে রাখা উচিত যে, আমার প্রতিপালক কারো মুখাপেক্ষী নন, তিনি মহানুভব।

হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের শোকর আদায় করে সে সবর অবলম্বনকারী রোযাদারের ন্যায়।

এবনে মাজা এই হাদীসকে হযরত সেনান (রাঃ)-এর সূত্রে এভাবে বর্ণনা করেছেন, আহারকারী যখন আহারের জন্যে শোকর আদায় করে তখন সে এতখানি সওয়াব পায়, যা সবর অবলম্বনকারী রোযাদার পায়।[২]

قَالَ نَكِّرُوا لَهَا عَرْشَهَا نَنْظُرْ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ

"সোলায়মান বললো, তার সিংহাসনের স্বরূপ পরিবর্তন করে দাও, দেখি সে কি দিশা পায়? নাকি বিভ্রান্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়"?

হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসের সিংহাসনের স্বরূপ পরিবর্তনের আদেশ দিয়ে এ বিষয়ে ইঙ্গিত করেছেন যে, তোমার রাজত্বের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, কুফর ও নাফরমানীর রাজত্ব খতম হয়েছে।

বর্ণিত আছে, ঐ সিংহাসনের মধ্যে লাল বর্ণের পাথরগুলোর স্থলে সবুজ বর্ণের পাথর বসিয়ে দেয়া হয়, আর সবুজ বর্ণের পাথর লাল বর্ণের পাথরের স্থলে বসে। হযরত সোলায়মান (আঃ) এমনটি কেন করলেন, তার জবাব দিয়েছেন হযরত কা'ব (রাঃ)।

জ্বীনেরা এ আশঙ্কা করছিল যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) হয়তো বিলকিসকে বিয়ে করবেন। যদি তা করেন তবে জ্বীনদের সমস্ত রহস্য তার মাধ্যমে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট উদ্‌ঘাটিত হবে, কেননা বিলকিসের মাতা ছিল একজন পরী, আর সে

---

[১]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-২৭১-৭২
[২]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২

জ্বীনদের সমস্ত গোপন বিষয় সম্পর্কে অবগত ছিল। আর যদি তার ঘরে কোন সন্তান হয়ে যায়, তবে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর পর তারই কর্তৃত্বাধীন থাকতে হবে। আর সোলায়মান (আঃ)-এর বংশের গোলামী থেকে কখনো রেহাই পাওয়া যাবেনা। তাই হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নিকট বিলকিসের সমালোচনা করে তারা বলেছে যে, তার বুদ্ধিমত্তার অভাব রয়েছে। এজন্যে হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর সিংহাসনের স্বরূপ পরিবর্তনের আদেশ দিয়েছেন, যাতে করে বিলকিসের বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পাওয়া যায়।

فَلَمَّا جَآءَتْ قِيْلَ اَهٰكَذَا عَرْشُكِ ، قَالَتْ كَاَنَّهٗ هُوَ

"এরপর রাণী বিলকিস যখন উপস্থিত হলো তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো, তোমার সিংহাসনটি কি এরূপই? রাণী বলে, এটি যেন সে রকমই মনে হয়"।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, বিলকিস তার সিংহাসনটি চিনে ফেলেছিলো, কিন্তু যেহেতু তাকে এভাবেই জিজ্ঞাসা করা হয়েছে যে এটিই কি তোমার সিংহাসন? সে অনুরূপভাবেই জবাব দিয়েছে। সে স্বীকার অস্বীকার কোনটিই করেনি। বিলকিসের উত্তরের মাধ্যমে হযরত সোলায়মান (আঃ) তার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেয়ে গেলেন, এরপর তাঁকে বলা হলো, এটিই তোমার সিংহাসন, কিন্তু তুমি দেখলে যে তার সংরক্ষণের যাবতীয় অবস্থা থাকা সত্ত্বেও তা সংরক্ষিত রইল না, তখন সে বলল,

وَاُوْتِيْنَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ

আমাদেরকে ইতিপূর্বেই প্রকৃত জ্ঞান দান করা হয়েছে, অর্থাৎ আল্লাহ পাকের কুদরত এবং সোলায়মান (আঃ)-এর নবুওয়্যতের সত্যতার জ্ঞান আমরা অর্জন করেছি এবং আপনার নবুওয়্যতের নিদর্শন আমরা দেখতে পেয়েছি। আমাদের সঠিক ও সুদৃঢ় নিরাপত্তা ব্যূহ ভেঙে হুদহুদ মারফত আপনার চিঠি পৌছানো, আমাদের উপঢৌকন গ্রহণ না করা প্রভৃতিতে আপনার নবুওয়্যতের প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা লক্ষ্য করেছি।

وَكُنَّا مُسْلِمِيْنَ

"আর তাই আমরা আপনার প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছি"।

কোন কোন তফসীরকার আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাও করেছেন যে, মোজেযা বা অলৌকিক নিদর্শনের কোন প্রয়োজনই ছিলনা, কেননা আপনি যে শুধু নিছক একজন বাদশাহই নন, বরং আল্লাহ পাকের প্রিয় বন্দা, তাঁর পয়গম্বর- এ সত্য আমরা পূর্বাহ্নেই উপলব্ধি করেছি, আর এজন্যেই তো আপনার নিকট আত্মসমর্পণ করেছি।[১]

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২০৩-০৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫২-৫৩
তফসীরে কবীর খন্ড-২৪, পৃষ্ঠা-১৯৭-৯৮

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ؕ
اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كٰفِرِيْنَ ﴿٤٣﴾ قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ
فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا ؕ قَالَ اِنَّهٗ
صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ ؕ قَالَتْ رَبِّ اِنِّيْ ظَلَمْتُ نَفْسِيْ وَ
اَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمٰنَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ﴿٤٤﴾ وَلَقَدْ اَرْسَلْنَاۤ اِلٰى
ثَمُوْدَ اَخَاهُمْ صٰلِحًا اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَرِيْقٰنِ
يَخْتَصِمُوْنَ ﴿٤٥﴾ قَالَ يٰقَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُوْنَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ
الْحَسَنَةِ ۚ لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ ﴿٤٦﴾

তরজমা

(৪৩) আর আল্লাহ পাকের পরিবর্তে সে যার পূজা করতো তা তাকে সত্য থেকে বিরত রেখেছিল, সে ছিল কাফের সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

(৪৪) তাকে বলা হয় এ প্রাসাদে প্রবেশ কর, সে যখন তা দেখতে পায় তখন সে তাকে গভীর জলাশয় মনে করে এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করে বসে। সোলায়মান বলেন, এ-তো কাঁচ জড়ানো প্রাসাদ মাত্র, সে তখন বলে, হে আমার প্রতিপালক! নিশ্চয় আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি এবং আমি সোলায়মানের সঙ্গে সেই আল্লাহ পাকের অনুগত হলাম যিনি সমগ্র বিশ্বের প্রতিপালক।

(৪৫) আর নিশ্চয় আমি সামুদ জাতির নিকটও তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম, এ আদেশ সহ যে তোমরা এক আল্লাহ পাকের বন্দেগী কর, কিন্তু তারা দু'দলে বিভক্ত হয়ে বিতর্কে লিপ্ত হলো।

(৪৬) তিনি বলেন, হে আমার জাতি! তোমরা কেন কল্যাণের পূর্বেই অকল্যাণ তাড়াতাড়ি কামনা করছো? কেন তোমরা আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর-না? হয়তো তিনি তোমাদেরকে দয়া করতে পারেন।

তফসীরুল কোরআন

পূর্ববর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছে, রাণী বিলকিসের সিংহাসন ক্ষণিকের মধ্যে আনয়নের দ্বারা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর যে মোজেযা প্রকাশিত হয়েছে তা দেখে সে বলেছে, এ মোজেযার পূর্বেই আপনার নবুওয়্যতের প্রতি আমি বিশ্বাসী হয়েছিলাম এবং আল্লাহ পাকের অসীম কুদরত ও একত্ববাদের প্রতিও আমার একীন হয়েছিল, আর আমি মনে মনে পূর্বাহ্নেই মুসলমান হয়েছিলাম, এটি মূলতঃ রাণী বিলকিসের বুদ্ধিমত্তার পরিচায়ক যে, সে আল্লাহর নবীর মোজেযা দেখার পূর্বেই এ সত্য উপলব্ধি করেছে যে, তিনি আল্লাহ পাকের মনোনীত নবী এবং তাঁর দরবারে হাযির হবার পূর্বেই মনে মনে তাঁর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে। আর এ আয়াতে কর্ণিত হয়েছে কি কারণে সে এত দিন প্রকাশ্যে ঈমান আনেনি। এরশাদ হয়েছেঃ

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَّعْبُدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ আল্লাহ পাক ব্যতীত অন্য কিছুর এবাদত তথা মিথ্যা উপাস্যদের পূজা এবং তার জাতির অন্য লোকদের অন্ধ অনুকরণই তাকে আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়নে বিরত রেখেছে।

বিলকিস এবং তার জাতি সূর্যের পূজা করতো। সমগ্র জাতি কুফর ও শেরকে লিপ্ত ছিল, সে-ও তাদের একজন ছিল। কিন্তু যখনই তাকে সাবধান করা হয়েছে তখনই অনতিবিলম্বে সে সঠিক পথ গ্রহণ করেছে।[১]

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) এ আয়াতের আরেকটি ব্যাখ্যা করেছেন।

وَصَدَّهَا

অর্থাৎ হযরত সোলায়মান (আঃ) বিলকিসকে মিথ্যা উপাস্যদের এবাদত থেকে বিরত করেছেন, আল্লাহ ব্যতীত যাদের সে পূজা করতো, নিঃসন্দেহে সে কাফের জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল। হযরত সোলায়মান (আঃ) নিজেই তাকে সূর্যের পূজা থেকে বিরত করেছেন, যেহেতু সে কাফের সম্প্রদায়ের লোক, আর তারা সকলে সূর্যের পূজা করতো। তাদের মাঝেই সে প্রতিপালিত হয়েছে, আর এছাড়া অন্য কিছু সে জানতও না।

বিলকিস হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর এই শান দেখেছিলো, তাঁর মোজেযাও তার সম্মুখে প্রকাশিত হয়েছে, তাঁর সংস্পর্শে আসার কারণে হেদায়েত লাভের যে প্রতিবন্ধকতা ছিল তা-ও দূরীভূত হয়েছে। এখন সে তৌহিদের পথে জীবন পরিচালনা করা শুরু করেছে। এমন অবস্থায় হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজত্বের যে শান ছিল তা দেখানোর পালা এসেছে, যাতে করে সে উপলব্ধি করতে পারে যে তার রাজত্ব হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর রাজকীয় শানের নিকট কিছুই নয়। হযরত সোলায়মান (আঃ) জ্বীনদেরকে একটি শীষমহল নির্মাণ করার নির্দেশ দিলেন, যথাসময়ে শীষমহল তৈরী হলো, ঐ মহলের সম্মুখে অতি সূক্ষ্ম মসৃণ কাঁচের ফরাশ ছিলো। অত্যধিক স্বচ্ছতার কারণে দৃশ্যতঃ তা পানি বলে মনে হতো, অথবা পানির হাউজের উপরেই স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের আস্তরণ স্থাপিত ছিলো। দর্শকমাত্রই তাকে প্রথমে শুধু পানিই মনে করতো, পবিত্র কোরআনের ভাষায়ঃ

قِيْلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ ۚ فَلَمَّا رَاَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَّكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

"তাকে বলা হয় এ প্রাসাদে প্রবেশ কর, সে যখন তা দেখতে পায় তখন সে তাকে গভীর জলাশয় মনে করে এবং সে তার উভয় পায়ের গোছা অনাবৃত করে বসে"।

এবনে আবি শায়বা, এবনুল মুনজের, আবদ এবনে হোমায়েদ এবং এবনে আবি হাতেম হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন যে, বিলকিস হাযির হওয়ার পূর্বে হযরত সোলায়মান (আঃ) একটি মহল তৈরী করান যার আঙিনার মধ্যে একটি পানির হাউজ তৈরী করা হয় এবং তাতে রকমারী মাছ ছেড়ে দেয়া হয়, তার উপর স্বচ্ছ মসৃণ কাঁচের আস্তরণ রাখা হয়, তার পার্শ্বে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর সিংহাসন স্থাপিত হয়, হযরত সোলায়মান (আঃ) সিংহাসনে আরোহন করেন, যখন বিলকিস আসলো, তখন সে পানি দেখে তার পায়ের গোছার বস্ত্র উত্তোলন করলো,

قَالَ اِنَّهٗ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِّنْ قَوَارِيْرَ

সোলায়মান বলেন, এ-তো কাঁচ জড়ানো প্রাসাদ মাত্র (পানি নয়), এখানে বস্ত্র উত্তোলনের প্রয়োজন নেই। ঐ মুহূর্তে রাণী বিলকিস তার নির্বুদ্ধিতার জন্যে লজ্জিত হয়।

১। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭৩

হযরত সোলায়মানের (আঃ) বুদ্ধি, ধী-শক্তি, মাহাত্ম এবং শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করতে সে বাধ্য হয়, তার সচেতন বিবেক তাকে সাবধান করে বলে, ঠিক এভাবেই এতদিন তুমি যে ধর্ম অবলম্বন করেছিলে তা ছিল সম্পূর্ণ ভুল, তুমি ছিলে প্রতারিত, পথভ্রষ্ট, গোমরাহীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন, এ সত্য উপলব্ধি কর যে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ধর্মই সত্য এবং যা তোমার কাছে নেই এমন দুর্লভ সম্পদও তাঁর নিকটই রয়েছে। তুমি কাঁচকে পানি মনে করে যেমন ভুল করেছ ঠিক তেমনি সূর্য ও অন্য কিছুর পূজা করেও তুমি ভুল করেছ। আর হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর হেদায়েতে যেমন তোমার বাহ্যিক ভুল ভেঙেছে, ঠিক তেমনি তাঁর সান্নিধ্যই তোমার অভ্যন্তরীণ এবং আধ্যাত্মিক ভুলও ভেঙে দেবে।[১]

قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

বিলকিস মুসলমান হলো

তাই রাণী অতীতের দিনগুলোর জন্যে আল্লাহ পাকের মহান দরবারে ক্ষমাপ্রার্থী হয়ে বললো, হে আমার প্রতিপালক! আমি আমার নিজের প্রতি জুলুম করেছি, সূর্যের পূজা থেকে আমি তওবা করছি, শেরক ও নাফরমানী বর্জন করছি, আমি সোলায়মান (আঃ)-এর সঙ্গে বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহ পাকের প্রতি পূর্ণ আত্ম সমর্পণ করছি, আল্লাহ পাকের একত্ববাদে আমি বিশ্বাস স্থাপন করছি, যিনি সমগ্র বিশ্বজগতের প্রতিপালক, আমি তাঁরই অনুগত হয়েছি।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী এ আয়াত সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁর শীষমহলের আঙিনায় স্বচ্ছ কাঁচ ব্যবহার করে একথা বুঝিয়ে দিয়েছেন যে, সূর্যের আভা দেখে তার পূজা করা এমনই ভুল যেমন মানুষ স্বচ্ছ কাঁচ দেখে পানি মনে করে ভুল করে, অথচ এটি পানি ছিলনা, ছিল মসৃণ স্বচ্ছ কাঁচ। ঠিক এভাবে চন্দ্র-সূর্য আল্লাহ পাকের সৃষ্টি এবং তাঁর প্রদত্ত নূর প্রকাশের মাধ্যম মাত্র, এর অতিরিক্ত আর কিছু নয়। তাই রাণী বিলকিস তওবা করে এক আল্লাহ পাকের অনুগত হলো এবং ইসলামের নেয়ামত লাভে ধন্য হলো।

ইসলাম গ্রহণের পর বিলকিসের অবস্থা

পবিত্র কোরআনে হযরত সোলায়মান (আঃ) এবং রাণী বিলকিসের ঘটনা এ পর্যন্তই বর্ণিত হয়েছে যে, বিলকিস ইসলাম কবুল করেছে। এরপর তাঁর অবস্থা সম্পর্কে তফসীরকার এবং ঐতিহাসিকগণ একাধিক মত প্রকাশ করেছেন।

আওন এবনে আবদুল্লাহ বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি আবদুল্লাহ এবনে উয়াইনার নিকট জিজ্ঞাসা করেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) কি বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন? তখন এবনে উয়াইনা বললেন, বিলকিসের ঘটনা

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

অর্থাৎ তার ইসলাম গ্রহণ পর্যন্তই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ করা হয়েছে, এর চেয়ে বাড়তি কিছু আমি জানিনা।

কোন কোন তত্ত্বজ্ঞানী বলেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। এবনে আসাকের একরাম (রঃ)-এর একথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। একথাও বর্ণিত আছে, হযরত সোলায়মান (আঃ) তাঁকে বিয়ে করার পর ইমানের ক্ষমতায় তাঁকে বহাল রাখেন, তথা তাঁর রাজত্ব তাঁকে ফিরিয়ে দেন। হযরত সোলায়মান (আঃ) প্রতি মাসে একবার

---

[১]। ফাওয়ায়েদে ওসমানী, পৃষ্ঠা-৪৯৩

ইয়ামন তশরিফ নিয়ে যেতেন এবং তিনদিন সেখানে অবস্থান করতেন। সকালে সিরিয়া থেকে ইয়ামন রওয়ানা হতেন, তিনদিন পর পুনরায় সকালে তিনি সেখান থেকে রওয়ানা হতেন। বিলকিসের ঘরে হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর একটি পুত্র সন্তানও জন্ম গ্রহণ করেন।

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর নির্দেশ-ক্রমে জ্বীনেরা ইয়ামনে তিনটি সুউচ্চ দুর্গ নির্মাণ করে, এমন উচ্চ এবং সুন্দর দুর্গ ইতিপূর্বে কেউ দেখেনি। এ তিনটি দুর্গের নাম ছিল সালহুন, সামুন এবং আমদান।

বর্ণিত আছে যে, ১৩ বছর বয়সে হযরত সোলায়মান (আঃ) ক্ষমতা পেয়েছিলেন এবং ৫৩ বছর বয়সে তাঁর ইন্তেকাল হয়।

لا ملك سليمان ولا بلقيس۔لا ادم فى الكون ولا ابليس
والكل فصورة وانت المعنى۔يامن هو للقلوب مقناطيس

হযরত সোলায়মানের (আঃ) রাজত্ব রয়নি, বিলকিসও বিদায় নিয়েছে, আদমও চলে গেছেন, ইবলীসও রয়েছে বিদায়ের পথে, হে সেই পবিত্র সত্ত্বা! যিনি অন্তর সমূহকে নিজের দিকে চুম্বক হয়ে টানে, তুমিই পবিত্র সত্ত্বা, তুমিই প্রকৃত সত্য, আর সবই আকৃতি মাত্র।[১]

আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ) রাণী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন, কেননা তিনি অবিবাহিতা ছিলেন।[২]

আল্লামা আলুসী (রঃ) লিখেছেনঃ একথা খ্যাতি লাভ করেছে যে, হযরত সোলায়মান (আঃ) ইয়ামনের রাণী বিলকিসকে বিয়ে করেছিলেন।[৩]

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَآ.....

আর নিশ্চয় আমি সামুদ জাতির নিকটও তাদের ভাই সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম, এ আদেশ দিয়ে যে তোমরা শুধু এক আল্লাহর বন্দেগী কর। কিন্তু তারা এক আল্লাহর বন্দেগী করতে রাজি হলোনা, হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান আনলো না; বরং দু' দলে বিভক্ত হয়ে গেল এবং কলহ-দ্বন্দ্বে লিপ্ত হলো। তারা হযরত সালেহ (আঃ)-কে বললো, হে সালেহ! যদি তোমার কথা সত্য হয় যে আমাদের অন্যায়ের কারণে আযাব আসবে তবে আর বিলম্ব কেন, সময় নষ্ট না করে এখনই আযাব নিয়ে আস।

قَالَ يٰقَوْمِ.....

হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা কল্যাণকর কাজ অর্থাৎ তওবা এবং ঈমান আনয়নের পূর্বে কেন তাড়াহুড়া করে আযাব কামনা করছো?

لَوْلَا تَسْتَغْفِرُوْنَ اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ

যদি তোমরা কুফর ও নাফরমানী থেকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে তবে হয়তো তোমাদের প্রতি দয়া করা হতো, কেন তোমরা আল্লাহ পাকের দরবারে ক্ষমা প্রার্থী হওনা, অথচ এখনও সময় আছে যদি তোমরা ক্ষমা ভিক্ষা কর তবে আল্লাহ পাক হয়তো তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন, তোমাদের তওবা কবুল করবেন। কিন্তু যখন চোখের সামনে আযাব আসবে তখন আর তোমাদের তওবা কবুল হবে না।[৪]

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৫-৫৬
[২]। তফসীরে মাআরেফুল কোরআন কৃত-আল্লামা ইদ্রিস কান্দলভী (রঃ) খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-৩৭৩
[৩]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-১৮৯
তফসীরে আদ দুররুল মানসুর খন্ড-৫, পৃষ্ঠা-১২১-২২
[৪]। সামুদ জাতির ইতিকথা বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন তফসীরে নূরুল কোরআন খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৩০৩-১০

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ ۚ قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ
اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ ﴿٤٧﴾ وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُّفْسِدُوْنَ
فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ﴿٤٨﴾ قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَ
اَهْلَهٗ ثُمَّ لَنَقُوْلَنَّ لِوَلِيِّهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهٖ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ﴿٤٩﴾
وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ ﴿٥٠﴾ فَانْظُرْ كَيْفَ
كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ ۙ اَنَّا دَمَّرْنٰهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ﴿٥١﴾ فَتِلْكَ
بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ۗ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ ﴿٥٢﴾
وَاَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ﴿٥٣﴾

তরজমা

(৪৭) তারা বলে, আমরা তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে বড়ই অমঙ্গলের কারণ মনে করছি। সালেহ্ বললেন, তোমাদের অমঙ্গলের মূল কারণ আল্লাহ্ পাকই জানেন, প্রকৃতপক্ষে তোমরা সেই জাতি যারা আযাবে পতিত হবে।

(৪৮) উক্ত নগরে নয়টি লোক ছিল, যারা দেশে উৎপাত-উপদ্রব করে বেড়ায়, আর তারা কোন ভাল কাজ করতো না।

(৪৯) তারা বলে, তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর নামে শপথ কর যে আমরা রাত্রিতেই তাকে সপরিবারে আক্রমণ করব, এরপর তার ওয়ারিশদেরকে বলবো, কখন তাঁর সংসার ধ্বংস হলো আমরা তা দেখিনি। আর নিশ্চয় আমরা সত্যবাদী।

(৫০) তারা চক্রান্ত করেছিল, আমিও একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা বুঝতেই পারলো না।

(৫১) এরপর লক্ষ্য করে দেখ যে, তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছে এবং কেমন করে আমি তাদের জাতি সহ সকলকে নিপাত করে দিলাম।

(৫২) এই তো তাদের বাড়ী-ঘর, তাদের জুলুম-অত্যাচারের কারণে তা জনশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে। এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে অবশ্যই রয়েছে নিদর্শন।

(৫৩) এবং যারা মোমেন ছিল এবং পরহেযগারী অবলম্বন করেছিল, তাদেরকে আমি রক্ষা করলাম।

তফসীরুল কোরআন

হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর ঘটনার পর এ আয়াত সমূহে হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঘটনার উল্লেখ করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত রয়েছে একটি বিষয়ের প্রতি যে, বিলকিস একজন স্ত্রীলোক হওয়া সত্ত্বেও হুদহুদ নামক একটি পাখীর মাধ্যমে তাঁর হেদায়েত

হয়েছে, অন্যদিকে সামুদ জাতির হেদায়েতের জন্যে আল্লাহ্ পাক হযরত সালেহ (আঃ)-কে প্রেরণ করেন এবং তাঁর মোজেযা স্বরূপ পাহাড়ের পাথরের ভেতর থেকে একটি জীবিত উষ্ট্রী বেরিয়ে আসে, কিন্তু এ বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেও হতভাগা সামুদ জাতি হেদায়েত লাভ করলো না, হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে বললেন, তোমরা শেরক পরিহার কর এবং এক আল্লাহ্ পাকের প্রতি ঈমান আন, শুধু তাঁরই বন্দেগী কর, কিন্তু সামুদ জাতি তাঁর আহ্বানে সাড়া দিলোনা, এমনকি তারা তাঁর সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্য করলো, আলোচ্য আয়াতে সে মন্তব্যেরই বিবরণ রয়েছে।

قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَّعَكَ

হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঘটনা

তারা বললো, আমরা তোমাকে ও তোমার সাথীদেরকে বড়ই অমঙ্গলের কারণ মনে করছি, যখন থেকে তুমি এসেছ তখন থেকে কখনো দুর্ভিক্ষ, কখনো মহামারী একটা না একটা অঘটন দেখতে পাচ্ছি। আমাদের উপর বৃষ্টি বন্ধ হয়ে গেছে, আমরা বিভিন্ন প্রকার কষ্টে আছি, সবার উপরে আমাদের জাতীয় সংহতিতে ফাটল ধরেছে, এসব কিছু তোমার এবং তোমার সাথীদের কারণেই হচ্ছে।

قَالَ طٰٓئِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ

সালেহ বললেন, তোমাদের অমঙ্গলের কারণ আল্লাহ্ পাকের এলমে রয়েছে অর্থাৎ তোমাদের বিপদাপদ বলতে যা কিছু রয়েছে, এসব আল্লাহ্ পাকের হুকুম ব্যতীত আর কিছুই নয়। অথবা এর অর্থ হলো, তোমাদের অন্যায়-অনাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি স্বরূপই তোমাদের উপর বিপদাপদ আপতিত হচ্ছে। তোমাদের অন্যায়-অনাচার, তোমাদের কুফর ও নাফরমানীই এসব বিপদ ডেকে এনেছে। অতএব, আমাদের কারণে তোমাদের অমঙ্গল হয়নি, তোমাদের কুকীর্তিই তোমাদের কপাল মন্দ হবার কারণ।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য আয়াতের এ ব্যাখ্যাই করেছেন।

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُوْنَ

প্রকৃতপক্ষে তোমরা সেই জাতি যারা তাদের কুফর ও নাফরমানীর পরিণতি স্বরূপ আযাবে পতিত হবে। অতএব, তোমাদের উপর যে আযাব এসেছে বা আসবে তা তোমাদের কুফর ও নাফরমানীর কারণেই আসবে।

হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ) আলোচ্য বাক্যের تفتنون শব্দটির ব্যাখ্যা করেছেন, 'তোমাদেরকে পরীক্ষা হবে'। অর্থাৎ সুখ-দুঃখ দিয়ে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে, তোমরা আল্লাহ্ পাকের একত্ববাদে বিশ্বাস কর কি-না তা পরীক্ষা করা হবে।

وَكَانَ فِي الْمَدِيْنَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ

হযরত সালেহ (আঃ)-এর জাতির মধ্যে নয়টি লোক তাদের নিজ নিজ দলের নেতা ছিল। দেশে চুরি-ডাকাতি, রাহাজানি, ছিনতাই, উৎপাত-অশান্তি সৃষ্টি করাই ছিল তাদের পেশা। সামুদ জাতি হযরত সালেহ (আঃ)-এর নিকট তাঁর মোজেযা স্বরূপ পাথরের ভেতর থেকে উষ্ট্রী বের করার যে দাবী করেছিলো, হযরত সালেহ (আঃ) আল্লাহ্ পাকের দরবারে দোয়া করায় আল্লাহ্ পাকের বিশেষ কুদরতে পাথরের ভেতর থেকে উষ্ট্রী বের হবার মাধ্যমে তাদের সে দাবী পূরণ করা হয়েছিলো। আল্লাহ্ পাকের কুদরতী সে উষ্ট্রীটিকে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিলো এ নয়টি কঠোর অন্তর বিশিষ্ট লোক। সামুদ জাতির মধ্যে এ নয়টি লোকই ছিলো সব চেয়ে মন্দ। আর এদের মধ্যে সবচেয়ে জঘন্যতম ছিল কাজার বিন সোলেফ।[১]

[১]। তফসীরে মাজাহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৮

আর এ জঘন্য লোকেরাই হযরত সালেহ (আঃ)-কে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলো। পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

قَالُوْا تَقَاسَمُوْا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهٗ وَاَهْلَهٗ

তারা বলে, "তোমরা নিজেদের মধ্যে আল্লাহর নামে শপথ কর যে, আমরা রাত্রিতেই তাকে সপরিবারে আক্রমণ করব, এরপর তাঁর ওয়ারিশদেরকে বলবো, কখন তাঁর সংসার ধ্বংস হলো আমরা তো দেখিনি"। অর্থাৎ ঐ দুস্কৃতকারীরা পরামর্শ-ক্রমে সিদ্ধান্ত নিল যে, তারা সকলে আল্লাহর নামে শপথ করবে যে রাত্রির অন্ধকারে অতর্কিতে হযরত সালেহ (আঃ) ও তাঁর পরিবারবর্গকে হত্যা করবে এবং তাঁর উত্তরাধিকারীদেরকে বলে দেবে যে, এ সম্পর্কে আমরা কিছুই জানি না। তারা সকল অভিযোগ অস্বীকার করে বলবে, কিভাবে যে এমন গর্হিত কাজ হলো তা ঘূর্ণাক্ষরেও আমরা জানতে পারিনি, আমরা এসব মন্দ কাজ করা তো দূরের কথা, স্বপ্নেও আমরা কখনো এসব ভাবিনি। সকলে সম্মিলিত ভাবে এসব কথা বললে আর আমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ থাকবেনা।

وَمَكَرُوْا مَكْرًا وَّمَكَرْنَا مَكْرًا وَّهُمْ لَا يَشْعُرُوْنَ

"তারা একটি চক্রান্ত করেছিল, আমিও একটি কৌশল অবলম্বন করলাম, অথচ তারা বুঝতেই পারলনা"।

সামুদ জাতি ধ্বংস হলো

আল্লামা সানাউল্লাহ পানিপত্তি (রঃ) লিখেছেন যে, হযরত আবদুল্লাহ এবনে আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে হযরত সালেহ (আঃ)-এর বাড়ীর হেফাজতের জন্যে প্রেরণ করেন। যখন তরবারী হাতে নিয়ে ঐ নয় দুরাত্মা হযরত সালেহ (আঃ)-এর বাড়ী আক্রমণ করে, ফেরেশতাগণ তাদের প্রতি প্রস্তর বর্ষণ করে, তারা পাথর দেখত, কিন্তু নিক্ষেপকারীকে দেখতো না, আর সেখানেই তারা শেষ হয়ে যায়।

মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, একটি পাহাড়ের পাদদেশে তারা সবাই একত্রিত হয়েছিলো, সেখান থেকে তারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর বাড়ী আক্রমণ করতে যাবে, কিন্তু আল্লাহ পাক সেই পাহাড়টি তাদের উপর ফেলে দেন। আর তারা সেখানেই নিস্পেষিত হয়। আর তাদের জাতিকেও এ সময় ধ্বংস করা হয়, একজন ফেরেশতা বিকট আওয়াজ দেন, যার কারণে সকলেই ধ্বংস হয়ে যায়। তাই আল্লাহ পাক পরবর্তী আয়াতে এরশাদ করেছেনঃ

فَتِلْكَ بُيُوْتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا

"এই তো তাদের বাড়ী-ঘর, তাদের জুলুম অত্যাচারের কারণে তা জনশূণ্য অবস্থায় পড়ে আছে"।

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً لِّقَوْمٍ يَّعْلَمُوْنَ

"নিশ্চয় এতে জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্যে রয়েছে নিদর্শন"। যারা জ্ঞানী, যারা পরিণামদর্শী তারা এ ঘটনায় আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরত এবং তাঁর নবী রসূলগণের সত্যতার প্রকৃষ্ট প্রমাণ দেখতে পায়।

এখানে উল্লেখ্য, ঐ নয় দুর্বৃত্ত যখন একত্রিত হয়ে আল্লাহ পাকের কুদরতী উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে, তখন হযরত সালেহ (আঃ) তাদেরকে সাবধান করে বলেছিলেন, তিন দিনের মধ্যেই তোমাদের উপর আল্লাহ পাকের আযাব আপতিত হবে। তোমরা তোমাদের কুকীর্তির ভয়াবহ পরিণাম ভোগ করার জন্যে প্রস্তুত থাক। তখনই ঐ দুর্বৃত্তরা সিদ্ধান্ত নেয়

যে, যখন আমরা শেষ হয়েই যাব তখন তার আগে সালেহকেও (আঃ) শেষ করে যাই, আর এজন্যেই তারা তাঁকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে। আল্লাহ পাক তাদেরকে ধ্বংস করে দিলেন, শুধু রক্ষা পেল তারা, যারা হযরত সালেহ (আঃ)-এর প্রতি ঈমান এনেছিলেন। তাই পরবর্তী আয়াতে এরশাদ হয়েছেঃ

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

"আর আমি রক্ষা করলাম তাদেরকে যারা ঈমান এনেছিলো এবং পরহেযগারী অবলম্বন করেছিলো"।

অর্থাৎ হযরত সালেহ (আঃ) এবং তাঁর সাথীগণ রক্ষা পেয়েছিলেন, বর্ণিত আছে যে, তাদের সংখ্যা ছিল চার হাজার।

এখানে আরো উল্লেখ্য, মক্কা শরীফ থেকে সিরিয়া যাতায়াতের পথে সামুদ জাতির ঘর-বাড়ীর ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায়। এজন্যে এরশাদ হয়েছেঃ

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ

অর্থাৎ লক্ষ্য করে দেখ তাদের চক্রান্তের পরিণাম কি হয়েছিলো।

সামুদ জাতির ধ্বংসাবশেষ দেখতে পাওয়া যায় ওয়াদিউল কোরা নামক স্থানে। এ স্থানটি মদীনা শরীফ এবং সিরিয়ার মধ্যে অবস্থিত। প্রিয়নবী হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম নবম হিজরীতে অনুষ্ঠিত তাবুকের যুদ্ধে যাওয়ার সময় এ স্থানটি অতিক্রম করেন, তখন তিনি এরশাদ করেছিলেনঃ

لاتدخلوا على هولاء المعذبين الا ان تكونوا باكين

"ক্রন্দণরত অবস্থায় ব্যতীত তোমরা কেউ এ কোপগ্রস্ত লোকদের এলাকায় যেওনা"।[১]

وَلُوطًا إِذْ قَالَ
لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ ﴿٥٤﴾ أَئِنَّكُمْ
لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ
تَجْهَلُونَ ﴿٥٥﴾ فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَن قَالُوا أَخْرِجُوا آلَ
لُوطٍ مِّن قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ ﴿٥٦﴾ فَأَنجَيْنَاهُ وَ
أَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَابِرِينَ ﴿٥٧﴾ وَأَمْطَرْنَا
عَلَيْهِم مَّطَرًا ۖ فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ﴿٥٨﴾ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ
عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ آللَّهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٥٩﴾

[১]। তফসীরে রুহুল মা'আনী খন্ড-১৯, পৃষ্ঠা-২১৫
তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৫৯
তফসীরে এবনে কাসীর (উর্দু) পারা-১৯, পৃষ্ঠা-৭৪-৭৫

তরজমা

(৫৪) আর স্মরণ কর লুতের কথা, সে তার জাতিকে বলেছিলো, তোমরা জেনে শুনে কেন অশ্লীল কাজ করছো?

(৫৫) তোমরা কি নারীদের স্থলে কামনার বশে পুরুষের পেছনে ছুটে চলো? বরং তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।

(৫৬) উত্তরে তার জাতি শুধু বললো, লুত পরিবারকে তোমাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করে দাও, তারা পবিত্র সাজতে চায়।

(৫৭) এরপর আমি তাকে ও তার পরিবারবর্গকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত।

(৫৮) তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, তাদের জন্যে এ বৃষ্টি কতই না মারাত্মক ছিল।

(৫৯) (হে রসূল!) আপনি বলুন, সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকেরই এবং শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর মনোনীত প্রিয় বন্দাদের প্রতি, উত্তম কি আল্লাহ, না তারা যাদেরকে তাঁর শরীক করে?

তফসীরুল কোরআন

হযরত সালেহ (আঃ)-এর ঘটনার পর এ আয়াত সমূহে হযরত লুত (আঃ)-এর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। লুত (আঃ)-এর জাতি চরম অশ্লীল কাজে লিপ্ত ছিল। তিনি তাদেরকে এমন ঘৃণ্য, নিন্দনীয় কুকর্ম থেকে বিরত রাখার জন্যে সর্বাত্মক প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু তারা সৎ পথে আসার স্থলে তাঁর বিরোধিতা করেছে এমনকি, হযরত লুত (আঃ)-কে তাদের জনপদ থেকে বহিষ্কার করার ষড়যন্ত্র করেছে। তিনি তাদেরকে বলেছেন, তোমরা স্ত্রী জাতির স্থলে পুরুষের পেছনে কেন ধাওয়া কর? কেন তোমরা নোংরা এবং কদর্য আচরণ কর?

بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ

প্রকৃতপক্ষে তোমরা একটি মূর্খ সম্প্রদায়, আর এজন্যে তোমরা এ অমানবিক, অশ্লীল আচরণ কর।

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهٖٓ اِلَّآ اَنْ قَالُوْٓا اَخْرِجُوْٓا

হযরত লুত (আঃ)-এর এ অসভ্য সম্প্রদায় তাঁর যুক্তিপূর্ণ বক্তব্যের কোন সদুত্তর খুঁজে পেলোনা, তাই তারা বললো যে, লুত এবং তার সঙ্গীদের সাধুতা এবং পবিত্রতা অসহনীয় হয়ে উঠেছে, তাদেরকে জনপদ থেকে বের করে দাও।

فَاَنْجَيْنٰهُ وَاَهْلَهٗٓ اِلَّا امْرَاَتَهٗ قَدَّرْنٰهَا مِنَ الْغٰبِرِيْنَ

"এরপর আমি তাকে ও তার পরিবাবর্গকে উদ্ধার করলাম তার স্ত্রী ব্যতীত, তাকে করেছিলাম শাস্তি প্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত"।

হযরত লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের দুর্বৃত্তরা তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গী মোমেনগণকে জনপদ থেকে বের করে দিতে চেয়েছিল এবং তাদের ও মোমেনগণের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলো, যেন তাদের অন্যায় অশ্লীল কাজে কেউ বাধা দিতে না পারে। আল্লাহ পাক এ জঘন্য পথভ্রষ্ট সম্প্রদায়কে আসমান থেকে প্রস্তর বর্ষণের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন এবং হযরত লুত (আঃ) ও তাঁর সঙ্গী মোমেনগণকে আগেই সরে যাওয়ার

তৌফিক দিলেন, যেহেতু হযরত লুত (আঃ)-এর স্ত্রী দুষ্কৃতকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করত, সেজন্যে সে-ও ধ্বংস হলো। তাই এরশাদ হয়েছেঃ

وَ اَمۡطَرۡنَا عَلَيۡهِمۡ مَّطَرًا ۚ فَسَآءَ مَطَرُ الۡمُنۡذَرِيۡنَ

"তাদের উপর ভয়ংকর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম, যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিলো, তাদের জন্যে এ বৃষ্টি কতই না মারাত্মক ছিল"।

আল্লাহ পাকের আযাবে নিপাত গেল হযরত লুত (আঃ)-এর পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়, তারা মোমেনদের থেকে চিরতরে দূরে সরে গেলো। মোমেনগণের পবিত্রতা অক্ষুন্ন রইলো, এ পাপীষ্ঠ সম্প্রদায়ের জনপদকে সম্পূর্ণ উল্টে দেয়া হলো।

বস্তুতঃ যারা এ পৃথিবীতে অন্যায়-অনাচারে লিপ্ত হয়, তাদের শাস্তি অবধারিত।

পূর্ববর্তী আয়াত সমূহে আম্বিয়ায়ে কেরাম এবং তাঁদের উম্মতের অবস্থা বর্ণিত হয়েছে, মহান আল্লাহ পাকের অনন্ত অসীম কুদরতের প্রকাশ ঘটেছে, নবী রসূলগণকে আল্লাহ পাক যে মোজেযা প্রদান করেছেন তারও বিবরণ স্থান পেয়েছে, এরপর প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ পাকের প্রশংসা করার ও তাঁর শোকর আদায় করার হুকুম দেয়া হয়েছে। এরশাদ হয়েছেঃ

قُلِ الۡحَمۡدُ لِلّٰهِ وَسَلٰمٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيۡنَ اصۡطَفٰى

"(হে রসূল!) আপনি বলুন সমস্ত প্রশংসা এক আল্লাহ পাকের জন্যে, আর শান্তি বর্ষিত হোক তাঁর সেই বন্দাদের প্রতি যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন"।

প্রিয়নবী (সাঃ)-কে সান্ত্বনা

এখানে লক্ষণীয় বিষয় এই, পূর্বকালের নবীগণের বিরোধিতা যারা করেছে, তাদেরকে আল্লাহ পাক ধ্বংস করে দিয়েছেন। আদ জাতি, সামুদ জাতি, ফেরাউন গয়রহ যারা যুগে যুগে আল্লাহ পাকের নবী রসূলগণকে কষ্ট দিয়েছে, এভাবে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, (হে রসূল!) আজ যারা আপনাকে কষ্ট দিচ্ছে, অনুরূপভাবে তাদেরও পরিণাম হবে ভয়াবহ, অতএব এ পর্যায়ে আপনি আল্লাহ পাকের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন, তাঁর শানে হাম্‌দ পেশ করুন, যিনি সত্যকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং অসত্যকে বাতিল করেছেন।

কোন কোন তফসীরকার এ পর্যায়ে লিখেছেন, হযরত সোলায়মান (আঃ), হযরত সালেহ (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ)-এর উল্লিখিত ঘটনাবলীর সঙ্গে আমাদের প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের জীবন-বৃত্তান্তের কিছুটা সাদৃশ্য রয়েছে।

যেভাবে রাণী বিলকিসের সৈন্যরা হযরত সোলায়মান (আঃ)-এর বিরাট সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে পারবেনা বলে হযরত সোলায়মান (আঃ) ঘোষণা করেছেন এবং রাণী বিলকিসও এ সত্য উপলব্ধি করেছিল, ঠিক এভাবে অষ্টম হিজরীতে অনুষ্ঠিত মক্কা বিজয়ের দিন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম দশ হাজার সাহাবী নিয়ে মক্কা অভিযান করেছিলেন, সেদিন মক্কাবাসী উপলব্ধি করেছিল যে, তারা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবায়ে কেরামের মোকাবেলা করতে পারবে না। ঠিক এমনিভাবে হযরত সালেহ (আঃ)-এর যুগের দুস্কৃতকারীরা যেভাবে রাতের অন্ধকারে তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলো, মক্কার দুষ্কৃতকারীরাও ঠিক এমনিভাবে হিজরতের রাতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামের বাড়ী ঘেরাও করেছিলো এবং তাঁকে হত্যা করার অপচেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছিলো। অনুরূপভাবে হযরত লুত (আঃ)-এর জাতির দুর্বৃত্তরা তাঁকে তাদের জনপদ থেকে বিতাড়িত ও নির্বাসিত করার

ব্যর্থ চেষ্টা করে অবশেষে আল্লাহ্ পাকের আযাবে ধ্বংস হয়েছিলো, আল্লাহ্ পাক তাঁকে রক্ষা করেছিলেন। তদ্রুপ মক্কার কাফেররা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে মক্কা থেকে হিজরত করতে বাধ্য করেছিলো, কিন্তু অবশেষে আল্লাহ্ পাকের হুকুমে তারা বদরের যুদ্ধে চিরতরে ধ্বংস হয়েছিলো।

এ ঘটনা সমূহের মাধ্যমে আল্লাহ্ পাকের কুদরতে কামেলার যে বহিঃপ্রকাশ হয়েছে এবং যুগে যুগে আল্লাহ্ পাক যেভাবে তাঁর নেককার বন্দাদের প্রতি রহমত নাযিল করেছেন তা বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয়। তাই আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ বা প্রশংসা করা এবং তাঁর মহান দরবারে শোকর আদায় করা প্রতিটি কল্যাণকামী মানুষের কর্তব্য। এজন্যে আলোচ্য আয়াতে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে আল্লাহ্ পাকের হাম্‌দ পেশ করার আদেশ দেয়া হয়েছে।

তফসীরকার মোকাতেল (রঃ) বলেছেন, اَلَّذِيْنَ اصْطَفٰى বাক্যাংশ দ্বারা নবী রসূলগণকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

ইমাম মালেক (রঃ) হযরত আবদুল্লাহ্ এবনে আব্বাস (রাঃ)-এর কথার উদ্ধৃতি দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, এর দ্বারা সাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।

সুফীয়ান সওরী (রঃ) এ মতই পোষণ করেছেন।

কালবী (রঃ) বলেছেন, এর দ্বারা সমগ্র উম্মতে মোহাম্মদীয়াকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে।[১]

آٰللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُوْنَ

আল্লাহ্ পাকই উত্তম? অথবা তারা, যাদেরকে তারা শরীক করতে চায়?

তৌহিদের বাণী

উপরোল্লিখিত আয়াত সমূহে যে সব ঘটনা বর্ণিত হয়েছে এবং আল্লাহ্ পাকের মহিমা ও গুণাবলীর যে বিবরণ স্থান পেয়েছে, তার প্রেক্ষিতে তোমরাই বল সর্বশক্তিমান, সর্বত্র বিরাজমান আল্লাহ্ পাকই উত্তম? নাকি তোমাদের অসহায় উপাস্য উত্তম, এর সিদ্ধান্ত অতি সহজ, যিনি সৃষ্টি করেছেন সমগ্র সৃষ্টি জগত, তিনি পরাক্রমশালী, সর্বশক্তিমান আল্লাহ্ পাক, তিনিই মহান দাতা, তিনিই অনন্ত অসীম করুণাময়, তাঁর সমীপেই আমাদের সকলের আশা, তাঁর প্রতিই করি আমরা ভরসা, তিনিই আমাদের জীবন-মৃত্যুর মালিক, অতএব তিনিই আমাদের একমাত্র উপাস্য, সমগ্র বিশ্ব সৃষ্টি তাঁরই তসবীহ্ পাঠে রত রয়েছে।

আলহামদুলিল্লাহ! আজ ১৬ই জিলক্বদ ১৪১৪ হিজরী সন মোতাবেক ২৮শে এপ্রিল, ১৯৯৪ ইং রোজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫-৩০ মিনিটে তফসীরে নূরুল কোরআনের উনিশতম খন্ডের (১৯ পারা) তফসীর সমাপ্ত হলো। হে আল্লাহ! এই সাধনা কবুল কর এবং এই তফসীর গ্রন্থ সম্পূর্ণ করার তৌফিক দান কর, আমীন।

---

[১]। তফসীরে মাজহারী খন্ড-৯, পৃষ্ঠা-৬২